পুনর্দর্শনায় চ

গ্রন্থপ্রকাশ
৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ
১৩৬৭

প্রকাশক
ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
৫–১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীশ্যামসুন্দর বসু
একমি প্রিন্টার্স
৭ডি হেরম্ব দাস লেন
কলিকাতা ৯

॥ ১ ॥

শীতের সময় যখন সবে আলমারি খুলে পাটভাঙা তুঁষের শালখানা বার করে গায়ে জড়াচ্ছি ঠিক সেই সময়েই গ্রীষ্মের নিমন্ত্রণ এল। গ্রীষ্মকালে চেকোস্লোভেকিয়া যাবার নিমন্ত্রণ। ও দেশের বিজ্ঞান আকাদেমি জানাচ্ছেন আগামী গ্রীষ্মে ও দেশে গিয়ে ওদের আকাদেমিতে কিছু কাজ করে দেবার জন্যে। এক বছরের নিমন্ত্রণ। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সবাইকে নিয়ে আসতে লিখেছেন। এ নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেওয়ার কোন কথাই ওঠে না। শুধু আমার বর্তমান নিয়োগকর্তাদের চেকোস্লোভাক বিজ্ঞান আকাদেমির নাম করে জানিয়ে তাঁদের অনুমতি নিয়ে জাহাজে উঠে পড়া। কলকাতার কনকনানি শীতের হাওয়াতেও আমার মনে চেকোস্লোভেকিয়ার ফুলে ভরা গ্রীষ্মের উদয় হল। মনে হল যেন চলে গেছি ইতিমধ্যেই। 'ক্লোভার' আর 'ডানডেলাইনের' সুবাস ভরা ফুরফুরে বাতাস এসে লাগছে আমার চুলে। 'তাতরা' পর্বতশ্রেণীর রুক্ষ চূড়োর উপর থেকে দৃষ্টিপাত করছি নীচেকার ছায়ানিবিড় জলে ভরা হ্রদ আর সুশ্যামল বনভূমির উপর। আমার ঐ দোষ—এসেছে বিজ্ঞান আকাদেমির কাজের নিমন্ত্রণ—কি ধরনের কাজ এখনও ঠিকমত না জানলেও কল্পনা করা শক্ত নয় যে, তা পাইন বনের নীচে ঘাসে ভরা মাঠে গোচারণ নয় এবং রুকস্যাক কাঁধে গিরি-কন্দরের মধ্যে দিয়ে সর্পিল পথে আলোয় ভরা গিরিচূড়া উত্তরণও নয়। যাচ্ছি কাজে। তথ্য, পরিসংখ্যান, পাঠ, গবেষণা—এইসব নিয়ে থাকব বেশীক্ষণ। তবুও কেন জানি না বিদেশে যাওয়ার কথা ভাবলেই কাজ বাদ দিয়ে ছুটির কথাটাই প্রথমে

মনে আসে। বিদেশে যাওয়া মানেই ছুটি—অবকাশ—বিচিত্র অভিনব অভিজ্ঞতা গ্রহণের সুবিধা। দৈনন্দিন নিয়মানুগ জীবনের বাইরে কাজের শৃঙ্খলা এবং শৃঙ্খলের বাইরে যা আছে তাদের গ্রহণ করবার দুর্লভ সুযোগ। কাজের মানুষের কাছে জীবনের মূল্য যাচাই হয় নিশ্চয় কতখানি কাজ করলুম এবং কত ভারি কাজ করলুম তারই ভিত্তিতে। আমি চিরকেলে অকেজো, কাজ কতখানি করলুম ওটা আমার গণনার মধ্যেই আসে না। কাজের বাইরে যে বেকাজ অকাজগুলো ভিড় করে দাঁড়ায় সেগুলিই শেষ পর্যন্ত থেকে যায় মনের ছাঁকনির ফুটোর উপরতলায়—সেগুলি নিয়েই নাড়াচাড়া করি আমি। অন্যের কাছে হয়তো সেটা রদ্দি মাল, অসার। আমার কাছে পরম সম্পদ।

জাহাজে জায়গা পেয়ে যেতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু বেঁকে বসলেন আমার মালিক। খাতা খুলে এখানকার কাজের যা ফিরিস্তি দেখালেন তাতে করে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে আমার যাওয়া হয় না। যেতে গেলে সেই বর্ষা কাটিয়ে অর্থাৎ ওদের দেশের গ্রীষ্মের বিদায়ের সময়। শেষে এই ব্যবস্থাই হল যে, স্ত্রী-কন্যা-পুত্র আগেই চলে যাবেন জাহাজে করে আর আমি মাস তিনেক পরে উড়োজাহাজে করে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হব।

চেকোস্লোভেকিয়ায় এর আগেও গিয়েছি। একবার পায়ে হেঁটে মাস দুই ঘুরে বেড়িয়েছিলুম ওদের পূর্বাংশের পাহাড়গুলোয়। সে সময় ওদের গ্রামাঞ্চলেই যাতায়াত করতে হত বেশী আর গ্রামে গেলেই দেশের আসল লোকগুলোকে ঠিক চেনা যায় এ তো সবাই জানে। সে সময় ওদের মানুষগুলোর ধরন-ধারণে আচরণে চিন্তাধারায় কোথায় যেন আমাদের ভারতের সঙ্গে একটা মিল আছে বলে মনে হত। ওদের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে দেখেছিলুম একটা মস্ত মিল রয়েছে। আমাদেরই মতো চেকরাও বিদেশীর আক্রমণে যে স্বাধীনতা হারিয়েছিল, আমাদেরই মতো তিন শ বছরের মধ্যে আর

সে স্বাধীনতার মুখ দেখেনি। তারপর সে কী অত্যাচার, সে কী নিষ্পেষণ! চেক দেশের পুরোনো সংস্কৃতিকে মুছে, ভেঙে, ঘুচিয়ে দিয়ে বিদেশী শিক্ষা, বিদেশী ভাষা, বিদেশী চিন্তা, ভাব, সংস্কৃতি জোর করে অনুপ্রবিষ্ট করাবার চেষ্টা। ইতিমধ্যে ওদের রাজা রাজন্য জমিদারবর্গ অর্থাৎ সমাজের উপরতলার শ্রেণী ধ্বংস হয়ে গেল। মাঝের তলার যে শ্রেণী সমাজের পৃষ্ঠদেশে বিচরণ করতেন তাঁদের কাছে চেক ভাষা, চেক সংগীত, চেক মনোভাব ছিল অপাংক্তেয়। এসব দিক দিয়েও আমাদের দেশের অধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে মিল আছে। আবার এরই মধ্যে দিয়ে থেকে-থেকে ফুটে বেরিয়েছে দেশাত্মবোধ, দেশপ্রীতি, স্বাধীনতার তীব্র কামনা। নিজেদের কুড়োনো পয়সায় গড়েছে এরা প্রাহার জাতীয় রঙ্গমঞ্চ, যা নিয়ে আজও এদের গর্বের অন্ত নেই। এই অন্ধকার যুগেই জন্মেছে 'মাখা'র মত জাতীয় কবি, যাঁর মূর্তির কাছে প্রতি বছর বসন্তের প্রথম দিনে চেক তরুণ-তরুণীরা তাদের প্রণতি জানায়। এ দিকেও অনেক মিল পাই। শেষে ১৯১৮ সালে যখন দেশ স্বাধীন হল তখন দেশ চালাবার ভার পড়েছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর। সেই সময়েই বেশ পরিষ্কার করে বোঝা গেল যে, বিদেশী শাসন এবং অধীনতার সুদীর্ঘ পর্ব ওদের নিজস্ব সংস্কৃতি সাহিত্য শিল্পকে নষ্ট করতে পারেনি। আমাদেরই মতো বৈদেশিক অত্যাচারের মুখেও বাঁচিয়ে রেখেছিল তাদের। এইসব ঐতিহাসিক মিল একটা মস্ত কারণ কিনা জানি না; কিন্তু গ্রামে গিয়ে যখন চেকদের দেখতুম তখন আর তাদের সাহেব বলে মনে হত না। মনে হত আমাদেরই মত। বাইরের দিকে ভীতু-ভীতু অথচ ভিতরের দিকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল; নতুন স্বাধীনতালাভের ফলে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অসীম আশাপূর্ণ। মানুষগুলো কথা কইতে কইতে চোখ নামিয়ে ফেলত; আবার নতুন কিছু করবার কথা শুনলে, অজানা দেশের অজানা জীবন-যাত্রার কথা শুনতে শুনতে উৎসাহে আবেগে অস্থির হয়ে পড়ত। গ্রামের এইসব

লোকদের মধ্যে বিচরণ করতে করতে, তাদের হাসির ধরনে, তাদের কথা কওয়ার ভঙ্গিতে তাদের চাহনিতে মনে হত আমাদেরই নিজেদের লোকের মধ্যে এসে পড়েছি।

দেখতে দেখতে কেটে গেল শীতের কটা মাস। তারপর কলকাতার আকাশ যখন ফুটন্ত কেটলির মত হয়ে উঠেছে উত্তপ্ত, ধুলো জমে সাদা হয়ে গেছে গাছের সবুজ পাতাগুলি তখন আমি একদিন ছেলেমেয়ে আর গৃহিণীকে তুলে দিয়ে এলুম ট্রেনে বোম্বাইয়ের পথে। বোম্বাই থেকে জাহাজে করে ইয়োরোপ। আমার অগ্রদূত হয়ে এগিয়ে গেলেন তাঁরা।

রক্তাক্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়ে গেছে আজ ষোলো বছর কিন্তু ঠাণ্ডা যুদ্ধ লেগেই রয়েছে অনবরত দুই মহাশক্তির মধ্যে। ঠাণ্ডা যুদ্ধকে একেবারে ঠাণ্ডা হতে না দেওয়ায় নিশ্চয় কিছু লাভ আছে কোনো না কোনো পক্ষের। কী যে লাভ তা আমাদের মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি মনুষ্যের পক্ষে বোঝা মুস্কিল। কিন্তু এটা বুঝি যে, লাভ না থাকলে ঠাণ্ডা যুদ্ধটাকে এমনভাবে জিইয়ে রেখে বিশ্বের শান্তিকামী ছাপোষা মানুষগুলোকে সব সময় আসন্ন সর্বধ্বংসী যুদ্ধের ভয়ে কাবু করে রাখা হত না। এবারেও তাই আবার শোনা গেল, পূর্ব এবং পশ্চিম বার্লিনের মধ্যে ঝগড়া এমন একটা জায়গায় এসে ঠেকেছে যে, বড় বড় সামরিক শক্তিরা দারুণভাবে তাল ঠুকছে আর অস্ত্র ঝন্‌ঝন্ করতে আরম্ভ করেছে। সেই অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানিতে আমাদের মত নিরীহ লোকদের আত্মারাম তো খাঁচাছাড়া! আমি মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসলুম—এ এক আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল তো! দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে পাঠিয়ে দিলুম ঘরের মানুষগুলোকে বিদেশে আর ঠিক তখনই শুরু হয়ে গেল মহাযুদ্ধের ভয়! যাই হোক, ঠাণ্ডা যুদ্ধ থেকে-থেকে গরম হয়ে যাবার ভয় দেখালেও মোটামুটি ঠাণ্ডা পথেই চলল। আমিও আমার উড়োজাহাজের টিকিট কাটার ব্যবস্থা করে ফেললুম। কলকাতায় তখন বর্ষার বর্ষণ শেষ হচ্ছে।

জার্মান কোম্পানী 'লুফ্‌ট্‌হানসা' সে সময় সবে মাত্র ভারতবর্ষে কারবার শুরু করেছে। আমার এজেণ্ট বললেন—এতেই যান, বেশ সুবিধে। হামেশাই তো আর উড়োজাহাজে করে দুনিয়া টহল দিচ্ছি না যে, বুঝব কোন লাইনের কি সদগুণ, কি বদগুণ। কি করে আর জানব যে, কার সার্ভিস মধুর, কার সার্ভিস অম্ল, কাদের মাংসের রান্না সবচেয়ে সুস্বাদু, কাদের স্যুপটা অমৃততুল্য, কাদের স্যালাড অনির্বচনীয়, কাদের পুডিং জঘন্য, কাদের কফি নর্দমার জলের মত, কারা টাটকা ফল বেশী দেয়, কারা আলুভাজা দেয়, কারা মাছ-ভাত খাওয়ায়। এসব আমার কাছে অজানা তো বটেই, তা ছাড়া যেহেতু আমি সর্বভুক, নতুন ধরনের যে-কোন খাবারই দিক না, রোজকার ডাল ভাত চচ্চড়ির থেকে পৃথক হলেই আমি তা প্রাণ ভরে উপভোগ করতে পারি। কাজেই আমার কাছে সব লাইনই সমান। শুনেছিলুম কোনো লাইনে ভি আই পি-দের এমনই ভয়ঙ্কর খাতির করে যে, সাধারণ যাত্রীদের দিকে নজরই দেওয়া হয় না। তাতেই বা আমার কি এসে যায়? ভি আই পি হলেও বা ভাবনার কথা ছিল--এত নজর দেয় কেন রে বাবা? কোনো মতলব আছে নাকি? তা যখন নই, যেহেতু আমি তুচ্ছ নগণ্য সেই হেতু আমার কাছে এয়ার ইণ্ডিয়া, কে এল এম, বি ও এ সি, লুফ্‌ট্‌হানসা সবই এক।

সামান্যতম স্যুটকেসের মধ্যে অল্প কিছু মাল গুছিয়ে উড়োজাহাজের মালসঙ্কোচ কানুন যত দূর সম্ভব রক্ষা করে যেদিন বাড়ি থেকে বেরবার কথা সেদিন আপিসের হারানবাবু হাতে এক পোঁটলা নিয়ে এসে উপস্থিত।

—আপনি প্রাহায় যাচ্ছেন খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি এলুম দেখা করতে। আমার ভাইপো যে ওখানে পড়ে।

—বলেন কি? তা বেশ তো ঠিকানা দিন। খবর নেবো, খন।

—শুধু তো খবর নিলে হবে না। খবর দিতে হবে। জানেন

তো, খবরের অপর নাম সন্দেশ। বাড়ির মেয়েরা কিছু মিষ্টি করে দিয়েছেন, এগুলো ভাইপোকে পৌঁছে দেবেন, এই অনুরোধ।

বলে পোঁটলার মধ্যে থেকে পাঁচ-সেরী একটা হাঁড়ি বার করলেন হারানবাবু। আমি মনে মনে প্রমাদ গনলুম। বললুম—হারানবাবু আপনার ভাইপো • কি ইয়োরোপে গিয়েছিলেন জাহাজে? না উড়োজাহাজে?

—কেন বলুন তো? জাহাজেই গিয়েছিল।

—তাই হবে। জাহাজে প্রায় যত খুশি মাল নিয়ে যাওয়া যায়। আর উড়োজাহাজে কুল্লে আধ মণ। কী ঝকমারী করেছি যে এই উড়োজাহাজে যাবো বলে। মাল আধ মণের এক চুল বেশী হলেই প্রচণ্ড খরচ।

হারানবাবু তাঁর সন্দেশের হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে একটা ঢোঁক গিললেন।

আমি বলে চললুম—ঐ দেখুন, তক্তার উপর এক বছর বাইরে থাকব বলে আমার চাকর রমেশ আমার বিদেশ বাসের জন্যে কতরকম জিনিস সংগ্রহ করে এনেছিল। সব ফেলে যাচ্ছি।

তক্তার উপর স্তূপ করা আতপ চালের পুঁটলি, ভাজা মুগের ডাল, আমসত্ত্ব, বেলের মোরব্বা, গরম মসলা, হলুদ, এক জোড়া বুট জুতো, কম্বল, আলোয়ান, তোয়ালে, আরো অনেক কিছু।

হারানবাবুর মুখ শুকিয়ে গেল। বাড়ির মেয়েরা ঘরের ছেলের জন্যে মিষ্টি করেছেন কত কষ্ট করে, কত যত্ন করে! আমি বললুম—শুনুন হারানবাবু, বুঝতেই তো পারছেন ঐ সমস্ত সন্দেশ নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। ওজনের কথা ছেড়ে দিলুম, সুটকেসেই বা ধরবে কি করে? তা ছাড়া পথে আমি জার্মানিতে দু-তিন দিন থাকছি। আপনাদের সন্দেশ খারাপ হয়ে যাবে না তো?

হারানবাবু বললেন—আজ্ঞে সন্দেশ বলে কি আর সন্দেশ পাঠাচ্ছি? স্রেফ নারকেলের নাড়ু—শুকনো জিনিস—এক মাসেও

খারাপ হবে না। ভাইপো চেখে চেখে খাবে আর পাঁচজনকে খাওয়াবে, তবে না?

আমি একটা টিন বার করে বললুম—নিন এর মধ্যে ভরে ফেলুন যে কটা ধরে—বেশ ঠেসে ভরুন। ওটা সুটকেসের মধ্যে চেপেচুপে নেব। আপনার ভাইপো নিশ্চয় বাড়ির নাড়ু পেয়ে খুশী হবে। অত দূর থেকে যখন আসছে—ওর বিশটাও যা দুশোটাও তা।

নাড়ু ভরা হতেই হারানবাবু পোঁটলা থেকে বার করলেন একটি পুঁথির ব্যাগ। বললেন—এটাও নেবেন নাকি? মেয়েরা বুনেছে।

বললুম—দিন।

ভরে ফেললুম সেটাকেও।

—আর একখানা ছোট্ট পকেট গীতাঞ্জলি ছিল।

—দিন ওটাও।

রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর সেরা বই। ওজন কিছুই নয়। বিদেশে পড়তে কত ভালো লাগবে ভাইপোর। ভরে ফেললুম সেটাকেও।

এইবার আমার গাড়িতে চড়বার সময় হল। দিন শেষ হয়ে আসার মোলায়েম আমেজ। বেলঘরিয়ার আপিস কারখানার ছুটি হচ্ছে। বর্ষা ফুরিয়ে এল—শরৎ-সন্ধ্যার প্রথম সঙ্কেত আকাশে। গাড়ি ছুটেছে ফাঁকা রাস্তায় দমদমার পথে। একখানি মাঝারি আকারের সুটকেস, ভারী একখানা ওভারকোট আর ছোট্ট একখানা অ্যাটাচি সম্বল করে আমার পাড়ি দেওয়া শুরু হল দূর-দূরান্তরের দেশে। দমদমায় পৌঁছে সুটকেসটাকে ওজন করলুম। কপালের কি জোর—কাঁটায় কাঁটায় কুড়ি কিলোগ্রাম—একটুও বেশী নয়, একটুও কম নয়। অ্যাটাচিটা যত দূর সম্ভব হালকা রাখবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু রমেশের আগ্রহাতিশয্যে প্রচুর ভারী ভারী জিনিস ভরে নিতে হয়েছিল বেরবার ঠিক আগে। তার ফলে তার ওজন অন্তত সাত আট সের তো হয়েইছিল। সেটাকে আমার ওভারকোটের তলায় চট করে লুকিয়ে ফেলে হাসি-হাসি বোকা-বোকা মুখ করে লুফ্‌টহানসার

ওজন মহিলার দিকে তাকালুম। তিনি বোধ করি আমার বিব্রত মুখের চেহারা দেখেই আমার মাল পাস করে দিলেন। অ্যাটাচির দিকে দেখেও দেখলেন না। নতুন ব্যবসায় নেমেছে এমন কোম্পানীর খদ্দের হয়ে লাভ আছে—আমার এজেন্ট আমায় ঠিক উপদেশই দিয়েছিলেন। কত খাতির আমাদের! পুরোনো চালু কোম্পানী হলে কি আর এত খাতির করত? ভি আই পি-দের নিয়েই ব্যস্ত থাকত হয়ত। লুফ্‌ট্‌হানসার কর্মচারী এগিয়ে এসে বললেন—মিস্টার গাঙ্গুলী, একবার যদি আমাদের কাউন্টারের পাশে দাঁড়ান তাহলে একটা ছবি তুলে নিই। আমি প্রচুর আত্মতুষ্ট হয়ে পোজ দিয়ে দাঁড়ালুম। নিজেকে একটা কেউকেটা বলে মনে হতে থাকল। ফ্ল্যাশ লাইট এবং ক্লিক্ শব্দে আমার ছবি উঠে গেল।

আমাকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন যেসব আত্মীয়েরা তাঁদের সঙ্গে কথা কইছি, সেই সময় লুফ্‌ট্‌হানসার মহিলা এগিয়ে এসে আমার হাতে একটি টিকিট দিয়ে বললেন—আপনার ডিনারের টিকিট, মিস্টার গাঙ্গুলী। আমরা মাইকে ডিনারের সময় জানালে দয়া করে রেস্তরাঁয় খেয়ে আসবেন।

আমি বললুম—সে কি? এত তাড়াতাড়ি রাত্রের খাবার খাব কি? এরোপ্লেনে খাবার দেবে না?

—খাবার দেবে। কিন্তু এরোপ্লেন আজ দু ঘণ্টা লেট। পৌঁছবার ঘণ্টা খানেক পরে ছাড়বে। আকাশে উঠে তবে ডিনার। অত দেরি করে ডিনার খেতে যদি আপনাদের অসুবিধা হয় তাই এই ব্যবস্থা।

বাড়ি থেকে বেরবার আগে রমেশ বলেছিল—বাবু, ভাল করে পেট ভরে খেয়ে যান, অত দূরে যাচ্ছেন, কখন কোথায় খাবার জোটে কি না-জোটে তা ঠিক কি?

আমি বলেছিলুম—পাগল? জার্মান এরোপ্লেনে যাচ্ছি, এরোপ্লেনে উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে জার্মান ডিনার। খিদে বাঁচাতে হবে—এখন শুধু এক কাপ চা দাও।

এই বলে শুধু এক পেয়ালা চা খেয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম। সেই জার্মান ডিনারের এখন এই অবস্থা ?

যাই হোক, মহিলার হাত থেকে ডিনারের টিকিট নিয়ে সময়মতো দমদম বিমানঘাঁটির রেস্তোরাঁয় ঢুকে শেষ ভারতীয় খাবার খেয়ে নিলুম। কতদিন এমন লঙ্কাপোড়া দেওয়া মাংসের কারি জুটবে না কে জানে ? খাওয়া দাওয়া শেষ করে কপাল থেকে লঙ্কার ঘাম মুছতে মুছতে যেই বেরিয়ে এলুম অমনি শুনলুম—যান এইবার। ফ্রাঙ্কফুর্টগামী উড়োজাহাজ এখনই আসবে।

উড়োজাহাজের মাঠ তখন অন্ধকার। এখানে ওখানে বড় বড় ডানা মেলে ক'টা উড়োজাহাজ নিঃঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের সারি সারি জানলাগুলি শুধু আলোর চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। দর্শকের দল, তার মধ্যে আমার আত্মীয়বন্ধুরাও, বেড়ার ওপাশে নিঃশব্দে এবং উৎসুক নেত্রে অপেক্ষা করছেন। এমন সময় একটা বড় জেট প্লেনের শব্দ পাওয়া গেল—

গোঁ গোঁ গোঁ বিষম আওয়াজ
আসছে রে ঐ উড়োজাহাজ—

মনে পড়ে গেল কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কবিতা। কলকাতায় যখন প্রথম কে এল এম কোম্পানীর ছোট্ট একখানি মনোপ্লেন এসে নামে তখন লিখেছিলেন। তখনকার দিনের সেই খেলনার মত প্লেনের পাশে আজকের বিরাটবপু ব্যোয়িং ৭০৭-এর কি তুলনা হয় ? অথচ তখনকার দিনের কবিতার মধ্যে দিয়ে ছোট্ট এরোপ্লেনের যে গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনেছিলুম, আজকের দিনের এই দানবের গর্জনও ঐ একই কবিতার মধ্যে ধরা পড়ে রয়েছে। কিরণধন বেঁচে থাকলে তাঁকে বলতুম—ও যুগের সেই এরোপ্লেনগুলো পুরোনো হয়ে গেল, অচল হয়ে গেল, লোকে ভুলে গেল, অথচ আপনার সেই কতকালের সেই এরোপ্লেনের উপর লেখা কবিতা আজও দেখুন টাটকা হয়ে বেঁচে রয়েছে।

আমাদের নেবার জন্যে একখানা গাড়ি এসে দাঁড়াল। যে কজন যাত্রী ছিলুম, একের পর এক গাড়িতে গিয়ে উঠলুম। আমাদের নিয়ে গাড়িখানা হাজির হল আমাদের প্লেনের সিঁড়ির তলায়। তারপর সারি বেঁধে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে প্রবেশ করলুম আমরা এরোপ্লেনের গহ্বরে। ভিতরটা ঠাণ্ডা হবে ভেবেছিলুম, দেখলুম গরম। যাত্রীরা বেশীর ভাগই শার্ট পরে বসে আছেন। কারুরই গায়ে আমার মত গরম কোট নেই। টোকিও থেকে আগত জাপানী যাত্রীতে প্লেন ভর্তি। দু দিকে দুজন জাপানী যাত্রী নিয়ে আমি ধপ করে একখানা মাঝের সীট-এ বসে পড়লুম। গরম হওয়া সত্ত্বেও গা থেকে গরম কোট খুলতে পারলুম না। এর বিশেষ একটা কারণ ছিল: কিছুদিন আগে মিতুর একটা চিঠি পেয়েছিলুম। মিতু লিখেছিল —বাবা, তুমি যদি জাহাজে আসো তা হলে এটা এনো, সেটা এনো, অমুক এনো, তমুক এনো। আর যদি উড়োজাহাজে আসো তাহলে তো বিশেষ কিছু আনতে পারবে না আমার জন্যে। শুধু কিছু দেশী ফল এনো যা তোমার বাক্সে ধরে। মিতুর জন্যে তাই ফল কিনেছিলুম। বেশী নয়, চারখানা মাঝারি সাইজের পেয়ারা—গাছে চড়ে পেড়ে খাবার আনন্দ না পাক, এরোপ্লেনে করে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া ফল খাবার আনন্দ তো পাবে, এই ভেবে। পেয়ারা কিনে ভয় হল শুল্ক পরীক্ষকের। কে জানে কি নিয়ম এদের? কে যেন বলল, জীবাণু ছড়ানোর ভয়ে মনসার চারা বা ফুলের তোড়া নিতে দেয় না এরোপ্লেনে। সুস্বাদু পেয়ারাকেও জীবাণুবাহক শ্রেণীর মধ্যে ফেলে কি না জানা ছিল না। এইসব ভেবে বাক্সর মধ্যে ফলগুলোকে ভরিনি। ভরে নিয়েছিলুম দু-পকেটে দুটো দুটো করে।

পেয়ারা ভরা কোট পরে দুই দশাসই জাপানী যাত্রীর মাঝে ধপ্ করে বসে পড়েছিলুম। পড়েই বুঝলুম, গেল এইবার। শুল্কবাবুর, স্বাস্থ্যবাবুর চোখে ধূলো দিয়ে পাকা পেয়ারাগুলোকে এরোপ্লেন পর্যন্ত এনে তুলেছি কোন রকমে; এইবার দু দিকের চাপে

পড়ে গেল বুঝি ফেঁসে। একবার ভাবলুম, কোটটা খুলেই ফেলি। খুলে উপরের তাকে তুলে রাখি। সাবধানে রাখব, যাতে পেয়ারাগুলো গড়িয়ে না পড়ে। উঠে কোট খুলতে যাবো এমন সময় দেখি, সামনে আলোর লেখা বেরিয়েছে।

'সীট-এর বেল্ট কোমরে বেঁধে ফেলুন'।

দু পাশের যাত্রীরা দু হাতে নিজেদের সীট-এর বেল্ট হাতড়াতে শুরু করে দিয়েছেন। কাজেই আর ওঠা হোল না। কোন প্রকারে দু পাশের দুটো বেল্টের মুখ খুঁজে বার করে এটাকে ওটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গ্যাঁট হয়ে নিজের সীট-এ বসে রইলুম। সঙ্গে সঙ্গে আবার আলোর রেখা বেরল—

'সিগারেট নিভিয়ে ফেলুন'।

উড়োজাহাজ এইবার ছাড়বে। হঠাৎ একটা গোঁ গোঁ শব্দ শোনা গেল। থরথর করে কেঁপে উঠল আমাদের বিরাট যন্ত্রটা। তারপরেই টের পেলুম এগিয়ে চলেছি। শব্দ এবং গতি ক্রমেই বেড়ে উঠছে। বাইরে তখন বোধ করি একটা শব্দের প্রলয় বয়ে চলেছে। ডবল কাঁচের জানলার মধ্যে আমরা থাকার ফলে অল্পই আমাদের কানে আসছিল সে শব্দ। হঠাৎ টের পেলুম কাঁপুনি আর নেই, হাওয়ায় ভেসে চলেছে আমাদের আকাশযান। জানলা দিয়ে ফুটকি ফুটকি আলোর মালা দেখে বুঝলুম নীচে কলকাতা শহর, কিন্তু সে-ও কয়েক মুহূর্ত মাত্র। জানলা, আকাশ, বাইরের সমস্ত জগৎ দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে গেল। নানা দেশের কয়েকটি যাত্রীকে নিয়ে আমাদের ছোট্ট জগৎটি বাইরের পৃথিবীর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

বেল্ট খুলে ফেলার নির্দেশ আসতেই আমি কোমরবন্ধখানা খুলে সাবধানে দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলুম। দেখলুম কাগজে মোড়া পেয়ারা চারটে ঠিকই আছে—একটুও চেপটে যায়নি। কাজেই আমি আর কোট খুললুম না। আমাদের কাছ দিয়ে যে জার্মান ঝি

যাচ্ছিলেন তাঁকে ডেকে বললুম, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দিতে। ঝাল মুরগির ঝোল খাওয়ার ফলে আমি তখন তেষ্টায় আইঢাই করছি। আমার দেখাদেখি বাঁ পাশের জাপানী ভদ্রলোকও জল চাইলেন।

ঝি বললেন—জল দেব, না কমলালেবুর শরবত ?

আমরা সমস্বরে·বললুম—জল, ঠাণ্ডা জল।

ছোট দুটি কাঁচের গ্লাস আধভরা অবস্থায় আমাদের হাতে এনে দিলেন জার্মান ঝি।

ঐটুকু জল দেখেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। গেলাসটা নিয়েই বললুম—আরো এক গ্লাস দয়া করে।

ঝি একটু অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। শীতের দেশে চলেছি! শীতের দেশে একবারে যতটা ঠাণ্ডা জল খাওয়া সমীচীন ঠিক ততটাই তিনি দিয়েছেন। বুঝলেন কলকাতার যাত্রী-গুলো এইরকম জল পাগল। অগত্যা আর এক গ্লাস জল দিয়ে গেলেন।

ছত্রিশ হাজার ফিট উঁচু দিয়ে উড়ে চলেছে আমাদের জাহাজ। এভারেস্টের উপর দিয়ে উড়ে গেলে দেখতে পেতুম পায়ের তলায় আট হাজার ফিট নীচে তার চূড়ো! এভারেস্টের চূড়োতেও বরফের ঝড় হয়, কুয়াসা হয়, শুনেছি। কিন্তু এখানে মেঘ নেই, ঝড় নেই, দুলুনি নেই, কিচ্ছু নেই। মনেই হয় না, উড়ে চলেছি। বোঝাই যায় না কত জোরে চলেছে ব্যোমযান। অথচ যে প্রচণ্ড গতিতে নিজের দেশ ছেড়ে পরের দেশে এগিয়ে চলেছি, তাতে করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গরম দেশের মৃদুচ্ছন্দ স্বপ্নময় পরিবেশ থেকে মন্ত্রবলে এসে পড়ব হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা দেশের ফিটফাট চঞ্চল অস্থির চলমান পরিবেশের মধ্যে। এই তো কিছুক্ষণ আগে দেখে এলুম বেলঘরিয়ার মাঠে শ্রাবণের শেষ বর্ষণ। আবার চোখ খুলতে না খুলতে হয়তো দেখব, শেষ-গ্রীষ্মের সোনালী রোদে রোমের আকাশ ছাওয়া। বেলঘরিয়ায় এইমাত্র দেখে এলুম ওখানকার অপরিচ্ছন্ন বস্তি-

গুলিকে ঘিরে জীর্ণবস্ত্র বাসিন্দারা গুঞ্জন করছে। আর ভোর হতে না-হতে দেখব দেশ বেড়ানোর মরসুমে রোম নগরীর হোটেল-বাড়ি ধনী সুবস্ত্র টুরিস্টের ভিড়ে এমন ভরপুর যে, ধরিত্রীর কোলে কোথাও কোন মলিনতা আছে বলে মনেই হবে না।

ঘুমের ছোঁয়া লাগতেই পাশের জাপানী যাত্রী কথা কইতে শুরু করলেন। সারা দিনের ধকলের পর একটু আরামের পরশ সবে পেয়েছি, ঠিক সেই সময় বকবকানি—কাল রাত্রে জানেন, হংকং-এর এক হোটেলে নিয়ে গিয়ে আমাদের তুলেছিল। মস্ত জমকালো হোটেল—কিন্তু কী গোলমাল! একটুও ঘুমতে পারিনি মশায়। তার ফলে যা মাথা ধরে রয়েছে, মনে হচ্ছে আজ রাতেও ঘুম হবে না। আমি মনে মনে বললুম—ও, তাই বুঝি আমার ঘুমটি নষ্ট করতে হবে! আমার চোখে তখন রাজ্যের ঘুম এসে নেমেছে। ভদ্রলোকের দেখি গল্প করবার বেশ ইচ্ছে। আর বেশী এগোতে দেওয়া নয়, ভেবে উঠে পড়ে বললুম—একটু জল খেয়ে আসি। বলে স্নানের ঘরের দিকে চললুম জল গড়িয়ে আনতে। একখানা ছোট কাগজের গ্লাস টেনে নিয়ে কলে ধরে এক গ্লাস জল খেলুম আর এক গ্লাস জলে ভর্তি করে ফিরে এলুম নিজের সীট-এ।

তাতেই কাজ হল। আমার হাতে জলের গ্লাস দেখেই ভদ্রলোকেরও জল-তেষ্টা পেয়ে গেল। উঠে পড়লেন জল আনতে। সেই সুযোগে আমি ঢক ঢক করে জলটুকু শেষ করে মাথার হেলানটাকে যত দূর যায় নামিয়ে দিয়ে চোখ বুজে ফেললুম। খানিক পরে ভদ্রলোক এসে ধপ করে বসে পড়লেন আমার পাশে। চুকচুক করে জল খাচ্ছেন শব্দ পেলুম আর বেশ বুঝলুম আমার দিকে জুলজুল করে তাকাচ্ছেন। কিন্তু আমি নির্মমভাবে চোখ বুজে নিঃসাড়ে বসে রইলুম আধশোয়া অবস্থায়। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না হঠাৎ শুনি, মাইকে বলছে—

'এবার আমরা করাচীতে নামছি। আপনাদের সীট-এর বেল্ট বেঁধে ফেলুন।'

বাস, ঘুমের দফা হয়ে গেল। চোখ মেলতেই জাপানীবাবু বললেন—আপনি তো বেশ খানিকটা ঘুমিয়ে নিলেন।

নিজেকে, কেন জানি না, অপরাধী বলে মনে হল। তাই বললুম, আর বোধ হয় ঘুমতে পারব না। কারণ, দু-তিন ঘণ্টা অন্তর এরা একটা করে দেশে নামবে আর একবার করে জাগাবে।

করাচীতে এসে উড়োজাহাজ নামল। বেশ কয়েকজন পাকিস্তানী যাত্রী উঠলেন। যে ক'টা সীট খালি ছিল, সব ভরে গেল। ডাহারানে নামলুম, তখন বোধহয় রাত দু'টা হবে। কায়রোতে পৌঁছলুম, ওদের ঘড়িতে রাত সাড়ে চারটে, আমাদের ঘড়িতে সাড়ে ছ'টা। এই হচ্ছে শেষ প্রাচ্য বিমানঘাঁটি। এর পরেই পশ্চিম দেশ। আমাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে কার্ড গুঁজে দিয়ে বললে—দয়া করে নেমে গিয়ে এখানকার রেস্তরাঁ থেকে এই কার্ডের বদলে কিছু চা কফি শরবত খেয়ে আসুন। আমরা ততক্ষণে এরোপ্লেনটা একটু গুছিয়ে নিই। এই বলে আমাদের বার করে দিয়ে এরোপ্লেনের দরজা বন্ধ করে গোছগাছ করতে আর ধোঁয়া ছড়িয়ে জীবাণু মারতে লেগে গেল। বাপ্‌রে, এদের কী জীবাণু মারবার শখ!

রেস্তরাঁয় মিশরের কফি পান করে প্লেনে ফিরে এসে দেখি জাপানী যাত্রীরা প্রায় সবাই কায়রোয় নেমে গেছেন। কাজেই আমি একটা জানলার ধারের সীট পেয়ে গেলুম। আমার পাশে এসে বসলেন একজন পাকিস্তানী যাত্রী। কোটে দিব্যি রসুনের গন্ধ। সেই গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে রোমের পথে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লুম।

উড়োজাহাজের ডানায় প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়ে আমার ঘুম ভাঙালো। পৃথিবীর মাটি থেকে সূর্যোদয় দেখেছি। এমন

ভাসমান অবস্থায় স্বর্গের অর্ধপথে সূর্যের এমন অপূর্ব উদয় দেখা কখনো তো কপালে ঘটেনি, তাই অবাক হয়ে গেলুম। মেঘ-স্তরের অনেক উপর দিয়ে উড়ে চলেছি, চারিদিকে শুধু ধূধূ শূন্য আকাশ—একটু আগে ছিল অন্ধকারে কালো ; দেখতে দেখতে ফিকে হতে হতে আলোয় আলো হয়ে গেল চারিদিক। ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেল চেয়ারে। খাওয়া শেষ হতে না-হতেই শুনলুম আমাদের প্লেন রোমে এসে নামবে এবার। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম ইটালির রাস্তা, ইটালির গম, ইটালির ক্ষেত, ইটালির বন, হ্রদ আর জমির একপাশে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।

রোমের এয়ারোড্রোমের এপার ওপার দেখা যায় না। কাঁচ ঢাকা বারান্দায় পায়চারি করতে করতে দেখলুম ওদের ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা বেজেছে। সময়ের ঠিকঠাক হিসেব রাখা মুশকিল। এই দেখছি তিনটে। ছু-তিন ঘণ্টা কেটে যাবার পর দেখছি সাড়ে তিনটে। সাড়ে চারটের সময় 'মর্নিং টী' খেলুম, তার কতক্ষণ পরে বেশ এক প্লেট ব্রেকফাস্ট হজম করে ঘড়ি মেলাতে যাই, দেখি সবে পাঁচটা বেজেছে। কতবার যে ঘড়ির কাঁটাকে উল্টো দিকে ঘুরিয়েছি তার ঠিক নেই।

রোমের পর আর এক লাফে ফ্রাঙ্কফুর্ট। এইখানেই আমাদের যাত্রা আপাতত শেষ। এরোপ্লেনের ঝি লজেঞ্চুসের ঝুড়ি এগিয়ে দিলেন। প্রতিবার প্লেন ছাড়বার আগে লজেঞ্চুস। প্রতিবার প্লেন নামবার আগে লজেঞ্চুস। আর মাঝে মাঝে পাড়িটা একটু লম্বা মনে হতে আরম্ভ হলেই আরো একবার। কোম্পানী যে যাত্রীকে গাড়িতে ভরেই সঙ্গে সঙ্গে তার কথা ভুলে বসে নেই, এইটে বার বার মনে করিয়ে দিতেই যেন এই লজেঞ্চুসের অবতারণা। প্রত্যেকবার ছু-তিনটে করে লজেঞ্চুস তুলে নিচ্ছিলুম বটে কিন্তু মুখে দিচ্ছিলুম না। কারণ মিষ্টি খেলেই জলতেষ্টা পাবে আর বারবার জল চাইতে গেলে ঝি-গিন্নীদের মিষ্টিমুখ ভার হয়ে যাবে। এর ফলে দেখলুম একে

তো পেয়ারার ভার, তার উপর লজেঞ্চুসের ভারে কোটের পকেট দুটো ফুলে উঠেছে।

মাইকযন্ত্রে জানানো হল—আমাদের প্লেন গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁচেছে এবং লুফ্‌টহানসা আমাদের পেয়ে ধন্য হয়েছে। পুঁটলি-পোঁটলা হাতে নিয়ে আমরা সিঁড়ি বেয়ে নীচে এসে নামলুম। সবে বৃষ্টি হয়ে গেছে। শীত-শীত করছে। হঠাৎ বিদেশে এসে পড়ার এই এক অসুবিধে। বোধগম্য হচ্ছে না এটা কোন ঋতু। গ্রীষ্ম, না বর্ষা, না শীত, কিছুই বোঝবার উপায় নেই। ওভারকোট গায়ে দেব কি দেব না ভেবে উঠতে পারি না। ঋতুর বোধ যেমন হারিয়ে গেছে তেমনি অভ্যস্ত চিন্তাগুলিও কেমন যেন জট পাকিয়ে গেছে। তার উপর ঘুম না হওয়ার অস্বস্তি সারা গায়ে। বুঝতেই পারছিনা কোথায় এলুম, কি করতে হবে। হঠাৎ দেখি দাঁড়িয়ে আছি শুল্ক আপিসের গায়ে যেখানে চলন্ত একটা ফিতের উপর দিয়ে সারি সারি একটার পর একটা স্যুটকেস এগিয়ে আসছে অনেক দূর থেকে আমাদের দিকে। কাছাকাছি এসে পড়তেই কতকগুলো লুক্কায়িত লোহার হাত কোথা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে মারছে তাদের সজোরে চাঁটি আর স্যুটকেসগুলো একটা ঢালু জায়গা দিয়ে গড়াতে গড়াতে এসে পড়ছে আমাদের পায়ের কাছে। কি হচ্ছে কিছুই মাথায় ঢুকছে না। হঠাৎ চোখে পড়ল আমার চেনা স্যুটকেসটা লগ্‌বগ্ করতে করতে টলতে টলতে ফিতের উপর দিয়ে আসছে। আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম সেখানে পৌঁছবার আগেই সেটা খেল একটা নিষ্করুণ চাঁটি আর গড়িয়ে এসে পড়ল এক ভদ্রলোকের হাঁটুর কাছে। তিনি সেটা নিজের কিনা পরীক্ষা করবার জন্যে ঝুঁকে পড়তে যাবেন, আমি আর তাঁকে সে সুযোগ না দিয়ে পিছন থেকে এসে ছোঁ মেরে সেটাকে তুলে নিয়ে একেবারে হাজির হলুম শুল্ক আপিসে। সেখান থেকে মাল খালাস করে বেরিয়ে শহরগামী বাস-এ গিয়ে উঠলুম। বাস ছেড়ে দিল।

এতক্ষণে আস্তে আস্তে সম্বিৎ ফিরে আসতে লাগল। বুঝলুম বহুদিন পরে আবার সেই ভুলে যাওয়া ইয়োরোপের মাটিতে এসে উঠেছি। বাইরে দমকা হাওয়া দিচ্ছে। বাসের সমস্ত কাঁচের শার্সি এঁটে বন্ধ করা। ভিতরটা উত্তপ্ত। আমাদের দেশের বাসের মত খোলাখুলি ভাব নেই। পথে বন। জানলা দিয়ে পাইন বৃক্ষ চোখে পড়তে লাগল। এবার সত্যিই বিদেশে এলুম।

বাস থেকে লুফ্‌টহানসার আপিসে নেমে পাশেই দেখি রেল স্টেশান। জার্মানির রেল স্টেশানগুলোতে হোটেল খোঁজার ভালো দপ্তর থাকে জানতুম। গেলুম স্টেশানে। নীল আলো দিয়ে লেখা রয়েছে এক জায়গায়—'হোটেল পান্‌সিয়ঁ!' গিয়ে দেখলুম এক বুড়ি মহিলা সেই সকালেই তাঁর পাঁউরুটিতে মোটা করে চীজ লাগিয়ে কামড় দিচ্ছেন।

আমি গলা বাড়িয়ে বললুম—আপনার ভালো খিদে হোক। আমায় একটা থাকবার জায়গার সন্ধান দিতে পারেন?

—ধন্যবাদ। নিশ্চয়ই। স্টেশানের ধারেই। এগার মার্ক। চলবে?

—চলবে!

—তবে দিন এক মার্ক আমার ফী। এই নিন ঠিকানা। বলেই টেলিফোন তুলে হোটেলে আমার আগমন-বার্তা দিতে থাকলেন। আমি তাঁর হাত থেকে স্লিপটা নিয়ে হোটেলের দিকে এগোলুম।

সেই পুরোনো ফ্রাঙ্কফুর্ট স্টেশান। আগেরই মত আছে। যুদ্ধের শেষে এদিকটা বোমা পড়ে ধ্বংস হয়নি বলে মনে হচ্ছে। পঁচিশ বছর আগে এখানে যখন এসেছিলুম, স্টেশানের ধারে একটা খুব সস্তা হোটেলে ছিলুম। দেখলুম সেটা ঠিক আগেরই জায়গায় আছে। শুধু আগের মত আর সস্তা নেই। আর যে তফাতটা চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে এদের দোকান সাজানো। আগেকার দিনে ফ্রাঙ্কফুর্টের দোকানদাররা এমন করে তো দোকান সাজাতো না।

এরা আজকাল যেন বিদেশী টুরিস্টদের আকৃষ্ট করবার জন্যে একেবারে উঠে-পড়ে লেগেছে। ইয়োরোপের অনেক বিখ্যাত শহরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বিদেশী টুরিস্ট সমাগম। তার ফলে সেসব শহরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য, সুষমা, নিজেদের নিয়ে বেঁচে থাকার আনন্দ সব চাপা পড়ে গিয়ে যে রূপটা বেরিয়ে আসে সেটা হচ্ছে খুব ঝকমকে করে সাজানো একটা মেলার রূপ—সেখানে থাকে শুধু দোকান-পসরা, চা-খানা, কফি-খানা, খাবার ঘর, মদের ঘর, আমোদের ঘর, প্রমোদের ঘর। সব শহরেই এই রকম, এক চেহারা, এক বর্ণ, এক গন্ধ। পুরোনো ঐতিহাসিক ফ্রাঙ্কফুর্ট দেখলুম ঐ পথে অনেক দূর এগিয়েছে।

হোটেলে পৌঁছে স্নান-খাওয়া সেরে প্রথমে বেশ খানিকটা ঘুমিয়ে নিলুম। ঘুম থেকে উঠে শরীরটা ঝরঝরে হতেই দেখলুম আমার মধ্যে একটা বদল এসে গেছে। হোটেল, ঘর, বিছানা, টেবিল, ধূলোহীন রাস্তা, সাজানো দোকান, বিদেশী মানুষ—সবই যা এতক্ষণ অপরিচিত অনভ্যস্ত প্রতিকূল ছিল তা যেন হঠাৎ বহুদিনের অভ্যস্ত বলে ঠেকতে লাগল। নিজের দেশটা এক ঘুমের পরেই কোন কত দূরে বহু সহস্র মাইলের ওপারে মলিন স্মৃতির মত ঝাপসা হয়ে এল।

হোটেলের দরোয়ান উত্তেজিত হয়ে এসে বললে—আপনার যদি কিছু কেনাকাটা করবার থাকে, সকালেই করে নেবেন। দুপুর থেকে বোধহয় সমস্ত দোকান বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

দুই বার্লিনের মধ্যেকার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, তারই বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল বেরচ্ছে। ভেবেছিলুম মিছিল না-জানি কেমন হবে। বার্লিনের গোলযোগ নিয়ে বিশ্বযুদ্ধই বেধে যাওয়ার মত অবস্থা। কি-হয় কি-হয় ভাব চারিদিকে। কিন্তু দোকান-টোকান কিছুই বন্ধ হল না। মিছিলের সামনে জন ত্রিশ নেতা ঝাণ্ডা হাতে গম্ভীর-ভাবে পা ফেলে ধীরপদে মার্চ করছেন। আর তাঁদের পিছনে

হাসিমুখে স্কুলের ছেলেমেয়ের দল লাফাতে লাফাতে চলেছে। হাতে বইখাতা, পায়ে হালকা স্যাণ্ডেল জুতো, নিরুদ্বেগ চেহারা সব। চায়ের দোকানে বসে চা খেতে খেতে এই দৃশ্য দেখলুম। দোকানদারনীকে জিজ্ঞেস করলুম—ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা অমন লাফালাফি করছে কেন?

তিনি বললেন—বার্লিনের অবস্থা বড়ই 'শ্লেখ্‌ট্'—কাহিল! তবে ওরা যতই লাফাক, পুব আর পশ্চিম বার্লিনের মাঝের দরজা আর খুলবে না। বন্ধই থাকবে।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লুম হাঁটতে। ফ্রাঙ্কফুর্টের রাস্তাগুলো, কত কাল হল এসেছি, আর মনে নেই। হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে পৌঁছলুম ঠিক শহরের মধ্যিখানে। মধ্যযুগের এইসব শহরগুলির প্রত্যেকটির একটা করে মধ্যিখান আছে। সেখানে আছে একটা খোলা জায়গা, যাকে বলা হয় শহরের চত্বর। আর এই চত্বরের চারিপাশে পৌরসংস্থা প্রভৃতি নানা আপিস। ফ্রাঙ্কফুর্টের এই জায়গাটার নাম 'টাউন হলের' নাম অনুসারে 'রাট হাউস'। ফ্রাঙ্কফুর্টের রাট হাউস বিশ্ববিখ্যাত। এটি একটি সুন্দর মধ্যযুগের স্থাপত্য। ফ্রাঙ্কফুর্টে এলে এখানকার রাট হাউস দেখে যাবো না এ আগেকার দিনে কল্পনাই করতে পারতুম না। অথচ এবার একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম ওর কথা। ওদিকে এগোতে গিয়ে কানে এল একটানা কিসের একটা গম্ভীর শব্দ। আর সেই সঙ্গে লক্ষ্য করলুম, কাতারে কাতারে লোক ফিরছে রাট হাউসের তরফ থেকে। তবে কি কোনো মিটিং ভাঙল? হয়েছে—এ তবে ওদের সেই বিক্ষোভ মিছিলের জমায়েতের জায়গা। বক্তৃতা-টক্তৃতা শেষ করে এখন সব ফিরছে। দলে দলে ইস্কুলের ছেলেমেয়ে। তাদেরই জিজ্ঞেস করলুম। তারা বললে—হ্যাঁ, তাই। এগোলুম তখন সেই রাট হাউসের দিকে। ঘণ্টার শব্দ ক্রমে বেড়ে উঠছে। যত এগোই ততই কানে-তালা-লাগানো শব্দ আসে ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং। রাট

হাউসের আশেপাশে বোধহয় তিনটে বড় বড় গির্জে, তার প্রত্যেকটা থেকে সজোরে ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে। থামছে না এক মুহূর্ত। উঃ সে কী আওয়াজ! মানুষের গলা পর্যন্ত শোনা যায় না। গির্জের ঘণ্টা এমনভাবে বাজতে কখনো শুনিনি। জার্মানী-বিভাগের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ যেন সারা আকাশ-বাতাসকে কাঁপিয়ে দিয়ে জানানো হচ্ছে। আবার মনে হয় যেন কিসের হুঙ্কার। হুঁ হুঁ করে কে যেন গর্জাচ্ছে হিংসায় দ্বেষে। কাঁপতে কাঁপতে সেই শব্দ নেমে আসছে গির্জের চূড়ো থেকে বাতাসে ভর করে। আমাদের বুকও সেই সঙ্গে কেঁপে ওঠে।

রাট হাউসের কাছে এসে প্রতিবার বড় আনন্দ পেতুম। বেশ ভালো লাগত। এবার আর লাগল না। ওখানকার সুন্দর করে সাজানো কফিখানার চেয়ারগুলো সব খালি। হুঙ্কারে তিষ্ঠোনো যায় না, লোকে বসবে কি করে? কাজেই আমিও ফিরে গেলুম ট্রাম ধরে স্টেশানের দিকে আমার হোটেলের কাছে।

পরের দিন সকালে উঠেছি। সকাল-সকাল ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিয়ে রাস্তায় বেরোলুম। আমার প্লেন ছাড়বে বারটার সময়। বাস-এ চড়তে হবে এগারটায়, কাজেই হাতে প্রচুর সময় ছিল। কালকের ডেমনস্ট্রেশান আর কানে-তালা-লাগানো গির্জের ঘণ্টার শব্দে রাট হাউস অঞ্চলের বিস্রস্ত ভাবটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারছিলুম না। তাই আর একবার চললুম সেই দিকে।

ট্রামে করে দশ মিনিটের পথ। যখন পৌঁছলুম তখন দোকান-পাটের দরজা সবে খুলতে আরম্ভ করেছে। দোকানের মেয়েরা ভিজে ঝাড়ন ঘষে শার্সিগুলোকে চকচকে করে তুলছে। নতুন সূর্যের আলো এসে পড়েছে চত্বরের পশ্চিম দিকের দেয়ালগুলিতে। শার্সির মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে সেই নবারুণ দোকানের টেবিলগুলিকে ভরে দিয়েছে কমলা রঙের আলোয়। শান্ত পরিবেশ। কালকের গোলমালের কোন চিহ্ন নেই। এই কথাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে

করে যে, যারা গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করে তারা শেষ অবধি হয়ত সক্ষম হয় না। সূর্যের আলোয় যেমন সব ধুয়ে যাচ্ছে তেমনি শুভবুদ্ধির আলোকে সব ধুয়ে যায়। শুভবুদ্ধিরই জয় হয়। কাছেই নদী। মাইন্‌স্ নদী। কোন অনাদি কাল থেকে এইভাবে বয়ে চলেছে কে জানে! আর এই শহরই কতদিনের পুরোনো। ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে এই নদীর ধারে। শান্ত নদীর রূপ। মনে হয় —নাঃ, গোলমাল, মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধ—এসব শেষ অবধি টেকে না। এই নদী যেমন একটানা স্রোতে বয়ে চলেছে তেমনিই অবাধ গতিতে বয়ে চলবে সমাজ সংসার দুনিয়া আর আমাদের সবাইকার জীবন।

ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে আম্‌স্টারডাম হয়ে প্রাহা। আমার আসবার খবর গৃহিণীকে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছিলুম। ওঁদের তখন মোরেভিয়ার পাহাড় অঞ্চলে থাকবার কথা। প্রাহায় সময়মতো ফিরতে পারবেন কিনা জানা ছিল না। তার উপর আমার প্লেন সাড়ে চার ঘণ্টা দেরি করে পৌঁছচ্ছে রাত দশটার সময়। আশা করি নি এয়ারোড্রোমে কেউ থাকবেন। কিন্তু প্লেন থেকে নেমেই দেখতে পেলুম গৃহিণী এবং দুষান জ্‌বাভিটেল দূর থেকে হাত নেড়ে আমায় অভিবাদন জানাচ্ছেন। দুষান ভারতে এসেছেন দুবার। ভাল বাংলা জানেন। রবীন্দ্রনাথের বহু গ্রন্থ তর্জমা করেছেন চেক ভাষায়। তিনি যখন একবার আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়ে ছিলেন, সে সময় ক'দিনের মধ্যে সমস্ত 'গোরা' উপন্যাসটি অনুবাদ করে ফেলেছিলেন। আমরা তাঁর ক্ষমতা দেখে চমৎকৃত হয়েছিলুম। দুষানের অনূদিত বই চেক বাজারে পড়তে পায় না—দেখতে দেখতে নিঃশেষিত হয়ে যায়। দুষান তাঁর গাড়ি নিয়ে এসেছেন আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

পাসপোর্ট পরীক্ষাগারে গিয়ে ঢুকলুম। একজন কর্মচারী আমার পাসপোর্ট দেখে প্রশ্ন করলেন—কোথায় উঠবেন? আপনার ঠিকানা কি লিখব?

এ প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না। তা ছাড়া কী জবাব দেব? জানিই না তো কোথায় উঠব! সত্যি কথাই বললুম—কোথায় উঠব তা তো জানি না।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমায় ছেড়ে দিলেন। বাইরে বেরিয়ে এসে তুষানের গাড়িতে চেপে চললুম প্রাহার পথে।

॥ ২ ॥

ইণ্টারন্যাশনাল হোটেল। শুনলুম ঐখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রাহার উপকণ্ঠে বিরাট সৌধ। বেঢপ। বাইরে থেকে যেমনই দেখাক ভিতরের ব্যবস্থা কিন্তু এলাহি। তেমনি আরামেরও। চারতলায় উঠে আমাদের ঘরের দরজার সামনে এসে পৌঁছলুম। ছেলে মেয়ে ঘুমোচ্ছিল। আমরা ঢুকতেই উঠে পড়ল এবং লেপের মধ্যে থেকে মুখ বার করে শুরু করল অনর্গল কথা। টেবিলে দেখি প্রকাণ্ড কেক সাজানো। তার চারপাশে ফল, মিষ্টি, অন্যান্য জিনিস। আরে, ভুলেই গিয়েছিলুম ইংরেজী তারিখ অনুযায়ী আজকে আমার জন্মদিন। তাড়াতাড়ি ঘড়ি দেখলুম। দেখি তখনও মধ্যরাত্রি হতে চল্লিশ মিনিট বাকি। ভাগ্যিস রাত বারোটা পার হয়ে যায় নি—গেলে অল্পের জন্যে আমার জন্মদিন ফস্কে যেত। বসে গেলুম উপাদেয় চেক্ ডর্ট খেতে। এর তুলনা হয় না। মিতুকে পেয়ারাগুলো বার করে দিলুম। তারপর গল্প শুরু হয়ে গেল কবে কি ঘটেছে এই নিয়ে। সবাইকে সবাইয়ের অনেক কিছু বলবার ছিল। কিন্তু রাত বেড়ে যায় দেখে সে লোভ সংবরণ করে শুয়ে পড়লুম।

ভেবেছিলুম একটানা বেশ খানিকটা ঘুমিয়ে নেব। কিন্তু রাত সাড়ে চারটে থেকে খট্‌খটে দিনের আলো। ঘুমবো কোথা থেকে? এখনও দেশের অভ্যেস যায় নি. আলো দেখলেই উঠে পড়তে ইচ্ছে

করে। ঘুম আর হল না। বাকি সবার দেখলুম সকালের আলোয় ঘুমিয়ে থাকা এরই মধ্যে অভ্যেস হয়ে গেছে। নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে সব। আমি উঠলে পাছে ওদেরও ঘুম ভেঙে যায় এই ভয়ে শুয়ে রইলুম অনেকক্ষণ। তারপর আবার কখন লেপের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। হঠাৎ টেলিফোনের শব্দে জেগে উঠলুম। আমাদের বিশেষ বন্ধু কার্লা টেলিফোন করছে। কাছেই থাকে—দেখা করতে আসতে চায়। উঠে পড়লুম সবাই। তৈরি হওয়ার জন্যে হুড়োহুড়ি লেগে গেল। প্রকাণ্ড জানলা দিয়ে অনেকখানি রোদ এসে পড়ল আমাদের ঘরে। কার্লা এসে দরজায় ধাক্কা দিল। দেখলুম সঙ্গে এনেছে বুখ্‌টা কেক আর জ্যাম। চেক্ বন্ধুরা যখন অনেক দিন পরে দেখা করতে আসে, খালি হাতে আসে না। সঙ্গে করে কিছু মিষ্টি নিয়ে আসে। আর কার্লা তো জানতই ওর বাড়ি গিয়ে এর আগে আমরা কত বুখ্‌টা খেয়ে কত আনন্দ করেছি ; তাই খবর পেয়ে এনেছে। আমি আমার প্যাঁটরা খুলে দেখলুম কিছু অম্বরী ধূপ আর শাঁখের আংটি রয়েছে—জিনিসগুলো হাল্কা বলে আনার সুবিধে। তাই দিতে কার্লা সে কী খুশী। তামাম চেকোস্লোভেকিয়া খুঁজলেও ও জিনিস পাবে না—হলই না হয় নগণ্য।

প্রাহার জীবন শুরু হয়ে গেল। হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামলুম। মিতু বললে—বাবা, তোমায় একটা নতুন জিনিস দেখাবো—এরকম দেখনি। বলে হাত ধরে আমায় টেনে নিয়ে হাজির করল একটা দোকানে। বললে—ঢোকো ভিতরে। একে বলে সামোঅব্‌স্লুহা। এ চেক্ কথাটা আমার কাছে নতুন। বললুম—মানে কি রে? মিতু বললে—চল না ভিতরে। বুঝতে পারবে।

প্রবেশদ্বারে স্তূপাকার তারের ঝুড়ি। তার থেকে দুজনে দুটো তুলে নিলুম। এইবার বুঝলুম। ও হরি, এ হচ্ছে সেই আত্ম-সেব দোকান—যে দোকানে দোকানী বা তার কোন সহকারী নেই।

আছে শুধু একজন সরকার মশায়। খদ্দেরই পণ্য বাছাই করে—তাক থেকে তুলে নিয়ে ভরে নিজের ঝুড়িতে। তারপর দরজা দিয়ে বেরোবার সময় সরকার মশায়কে দাম চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যায়। এ ধরনের আত্ম-সেব দোকান ইয়োরোপে নতুন নয়, কিন্তু মিতুর কাছে নতুন। শুধু নতুন, নয়, এই দোকানগুলিই মিতুর সবচেয়ে ভালো লাগে। অবাক লাগে যে মানুষ কত সৎ হতে পারে। ইচ্ছে করলেই তো তাক থেকে দু'পাঁচটা সাবান, পেন্সিল-কাটা ছুরি বা নখ-কাটা কাঁচি তারের ঝুড়িতে না রেখে নিজের পকেটেই রাখতে পারা যায়। কিন্তু তা তো করে না কেউ। এর মধ্যে একটা আশ্চর্য মহিমা আছে যেটা মিতু এই বয়সেই আবিষ্কার করে ফেলেছে। মানুষ আসলে যে সৎ, সৎ হওয়াই তার ধর্ম, এই সত্যটা আরও একবার উপলব্ধি করে আমারও বেশ ভাল লাগল। লোকে লোককে ঠকায় না, ওটা তার স্বভাবই নয়, সমাজের অঙ্গ হয়ে থাকতে গেলে, সমাজকে নিজের অঙ্গ বলে গ্রহণ করলে, সমাজকে প্রবঞ্চনা করা মানুষ আপনা থেকে ছেড়ে দেয়। কোনো কোনো সমাজের মানুষগুলো পরস্পর পরস্পরকে ঠকায়—সেটা সমাজ-ব্যবস্থারই দোষ; মানুষগুলোকে ধরে ধরে দোষ দেওয়া বৃথা। এই ধরনের সামো-অব্স্লুহার প্রয়োজন এখন চেকোস্লোভেকিয়ার সর্বত্র, সেটা ওখানে থাকতে থাকতে পরে জেনেছিলুম। তার কারণ অবশ্য এ নয় যে, সোশালিস্ট দেশের মানুষগুলো কেমন সৎ তাই সিদ্ধ করা বা তার নজির দেওয়া। আসল কারণ গভীরতর। আসল কারণ হচ্ছে ওদেশে মানুষের মধ্যে কাজ বণ্টন করে দেবার মত এত কাজ আছে যে লোকে কুলোয় না। আমাদের পক্ষে জিনিসটা হৃদয়ঙ্গম করা শক্ত। আমরা আমাদের চারপাশে বেকারত্ব দেখতে অভ্যস্ত—নিজের চাকরিটাই বা কখন খুইয়ে বসি এই ভাবনাতেই সব সময় তটস্থ থাকি। সুতরাং কাজের অভাব নেই, বরং লোকের অভাব হচ্ছে এটা যখন দেখি তখন ব্যাপারটার তাৎপর্য বঝে উঠতে পারি না।

চেকোস্লোভেকিয়ায় এটা হয়েছে। এদের সমাজ এত প্রয়োজনীয় কাজের সৃষ্টি করেছে যে মানুষে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। তাই ভাবতে হয় কোথায় কত কম মানুষ দিয়ে কাজ সারা যায়। এই তাগিদেই সামো-অব্স্লুহা। রাস্তা থেকে রাস্তায়, শহর থেকে শহরে সামো-অব্স্লুহা ছড়িয়ে পড়েছে। স্বয়ং-সেব দোকানের মধ্যে মুদির দোকান, ওষুধের দোকান, কাগজ-কলমের দোকান দেখেছি, রেস্তরাঁ দেখেছি। আমরা থাকতে থাকতে প্রাহায় ট্রাম পর্যন্ত স্বয়ং-সেব হয়ে গেল। ট্রামে শুধ্ একজন ড্রাইভার। ওঠবার জায়গায় একটা পয়সা ফেলবার বাক্স—টিকিট কাটা, টিকিট চেক্ কিছু নেই। প্রথম দিন ভাড়া হাতে নিয়ে বসে আছি, কনডাকটারই আসে না। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, ট্রাম থেকে নামবার সময় প্রায় হয়ে এসেছে, ব্যস্ত হয়ে উঠেছি টিকিট কেনবার জন্যে, এদিক-ওদিক খুঁজতে শুরু করলুম কনডাকটারকে—কোথাও তার টিকিটি দেখতে পেলুম না। আমার নিঃসহায় অবস্থা দেখে এক ভদ্রলোক আমার হাত ধরে বাক্সটার কাছে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দেন তবে বুঝি।

এমনি এদের সামো-অব্স্লুহা। যেমন দোকানে তেমনি রেস্তরাঁয়, তেমনি ট্রামে এবং বাসে। সুষ্ঠুভাবে লেন-দেন হয়ে যায়—কোন গোল নেই, কোন ঝঞ্ঝাট নেই।

মিতু তাক থেকে একখানা মুখ-মোছা তোয়ালে তুলে নিয়ে ঝুড়িতে রেখে বলল—তুমি কিছু কিনবে নাকি বাবা? আমি বললুম—আমার তো সব কিছুই কিনতে ইচ্ছে করছে—কী চমৎকার সাজিয়েছে! কিন্তু অত পয়সা পাবো কোথা? তার চেয়ে থাক। দোকান তো রইল, যখন যা দরকার পড়বে কিনে নিয়ে যাবো। মিতু বললে—কিন্তু সামো-অব্স্লুহা ছাড়া অন্য কোনো দোকান থেকে কিনো না বাবা। আমি বললুম—কখখনো নয়।

আবার বেরিয়ে এলুম প্রাহার রাস্তায়। এর আগের বারে যখন প্রাহায় এসেছিলুম, তার সঙ্গে এবারে অনেক তফাত। দোকান-

গুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। কেনবার জিনিস অনেক বেড়েছে—আগে তো প্রায় কিছুই ছিল না। বাচ্চাগুলোর চেহারা দূর থেকে চোখে পড়ে—মোটা-সোটা, লাল গাল। আগের চেয়ে খেতে পায় নিশ্চয় অনেক ভালো। যুদ্ধের ফলে যা হাল হয়েছিল দেশের—বাচ্চাগুলো সব টিংটিংয়ে হয়ে গিয়েছিল। যে কোনো দেশের যে কোনো সমাজের যে কোন গোষ্ঠীর অবস্থা কেমন তা চট্ করে বোঝবার সব চেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে তাদের বাচ্চাগুলোর দিকে তাকানো। এক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যায় অবস্থাটা। এদের দ্রুত উন্নতিটা দেখবার মতো। শিল্প-প্রধান দেশের ঐ এক সুবিধে। চট করে উন্নতি এনে ফেলতে পারে। চট করে জীবন-যাত্রার মান উঁচু করে ফেলতে পারে। তার উপর, শুধু তো এরা শিল্প-প্রধান দেশ নয়, সোশালিস্ট দেশ—পশ্চিম ইয়োরোপের চেয়েও এক কাঠি দড়—যুদ্ধ টুদ্ধ যদি না হয়, এদের দ্রুত অগ্রগতি রোখে কে?

দোকান থেকে বেরিয়ে এগোলুম রাস্তা ধরে। কিছু দূর এগিয়েই একটা প্রকাণ্ড চত্বর—পাঁচ সাতটা বড় বড় রাস্তা এসে মিলেছে। আগে এর কি একটা নাম ছিল, এখন দেখলুম নাম দিয়েছে 'অক্টোবার বিপ্লব চত্বর'। এর মানে এ নয় যে এখানে অক্টোবার বিপ্লব ঘটেছিল। অক্টোবার বিপ্লবকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে এই ব্যবস্থা। ব্রিটিশ আমলে আমরা যেমন ব্রিটিশ শাসনকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে ব্রিটিশ শাসকদের নামে নামে রাজধানীর রাস্তা করতুম; আবার স্বাধীনতা পাবার পর সেই রাস্তাগুলির নাম মুছে আমাদের জাতীয় আন্দোলনকে স্মরণীয় করে রেখেছি জাতীয় নেতাদের নামে রাস্তা করে—ক্লাইভ স্ট্রিট কেটে করেছি নেতাজী সুভাষ রোড, হ্যারিসন রোড মুছে করেছি মহাত্মা গান্ধী রোড, এরাও সেই পথে গিয়েছে। বিপ্লবকে ভুলতে দিতে চাইছে না। চৌরাস্তার নামগুলো যে বিপ্লবে ভরা এটা যতই প্রাহায় থাকতে লাগলুম ততই চোখে পড়তে লাগল। 'রেভলুট্নী ট্রাডা' অর্থাৎ বিপ্লব স্ট্রিট একটা

বেশ বড় রাস্তা যেখানে চেকোস্লোভাক এয়ার লাইনের মস্ত আপিস। ৯ই মে যুদ্ধের শেষে প্রাহার উদ্ধার হয়েছিল—কাজেই ৯ই মে স্ট্রিট। এ ছাড়া জাতীয় বীরদের রাস্তা, 'ডুকলার' বীরদের রাস্তা—এই সবের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ক্রমে। শেষে এরা একটা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করল বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের জন্যে—তার নাম দিয়ে দিল ১৭ই নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়। ১৭ই নভেম্বর কোন সালে যেন প্রাহায় ছাত্রদের উপর গুলি চালিয়ে জার্মান কর্তৃপক্ষ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সব বন্ধ করে দিয়েছিল—সেই দিনটিকে স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়াস।

শহরে নতুন এসে আমার অভ্যেস প্রথমেই দোকান বাজার দেখা। দোকানগুলো দেখতে দেখতে শহরের একটা রূপ গেঁথে যায় মনের মধ্যে—হতে পারে সেটা বাইরেকার রূপ—কিন্তু অনেক দিন পরে সেইটাই শেষ অবধি থেকে যায় স্মৃতিতে। নানা দেশের নানা শহর তো দেখে বেড়িয়েছি জীবনে। কোথাও অল্প দিন থেকেছি, কোথাও বেশী দিন। যখনই একটা কোনো বিশেষ শহরের কথা ভাবি, প্রথমেই চোখের সামনে ভেসে আসে যে ছবিটা সেটা হচ্ছে তার দোকান পল্লী। সারি সারি দোকান—এক এক শহরে এক এক রকমে সাজানো। তারপর মনে জাগে তার ট্রাম বাস মাটির নীচের ট্রেন, যানবাহন। তারপর হয়তো বাড়ি ঘরের চেহারাটা এবং সব শেষে সেখানে যে সব মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এদের মধ্যে আবার হয়তো বারো আনা মানুষকে ভুলেই মেরে দিয়েছি। কিন্তু দোকান-গুলো ঠিক মনে থাকে। এবারে দেখলুম প্রাহার দোকানের জগতে একটা মস্ত ওলোট-পালোট এসে গেছে।

আগেকার দিনে দোকানগুলো ছিল লোকের নামে বা দোকানীর নিজের নামে। যেমন ধরা যাক, একটা বিখ্যাত জুতোর দোকান ছিল, তার নাম ছিল 'পাপেশ'—কর্তারই নাম। একটা মিষ্টির দোকান ছিল প্রাহার পুরোনো পল্লীতে, দূর থেকে ট্রামে করে লোকে আসত সেখানে আইস ক্রীম খেতে। কর্তার নামে দোকানের নাম ছিল

'আন্টনিন লিয়ান'। দোকানদার নিজস্ব নামে বা কোনো শখের নামে ব্যবসা করত। নামটা ক্রমে ব্যবসারই একটা অঙ্গ হয়ে যেত। হয়তো করলে কাগজ-কলমের দোকান ; ছেলেপুলেরা খাতা কিনতে আসে ; তাদের বাঁধবার জন্যে দিলে আইসক্রীম বিক্রি করা শুরু করে। বাপ-মায়ের জন্যে হয়তো দোকানের এক কোণে লেমনেড, ছুঁচ, সুতো, বোতাম রইল। খদ্দেররা জানত অমুক লোকের দোকানে অমুক অমুক জিনিস ভালো পাওয়া যায়! যেমন 'কালো'র দোকানের চা অথবা 'দিলখুসা'র চপ। এই ধরনের দোকানের গুণও ছিল, দোষও ছিল। যে দোকান খদ্দেরকে যত বেশী খুশী করতে পারত তার তত বেশী নাম হত। লোকে জানত অমুক জিনিস সব চেয়ে ভালো সব চেয়ে সস্তা পেতে গেলে অমুক দোকানে যেতে হয়। এর ফলে দোকানদারী করেও যেমন তৃপ্তি ছিল, ভালো জিনিস কিনেও তেমনি তৃপ্তি। দোষের মধ্যে, যারা ভাল দোকানের খোঁজ পেত না তাদের পক্ষে ভাল জিনিস উপযুক্ত মূল্যে খরিদ করাও সম্ভব হত না। এক একটা জিনিসের জন্যে এক একটা পাড়ার খ্যাতি ছিল। পাঁচটা জিনিস ভালো-ভাবে কিনতে গেলে পাঁচ পাড়ায় ঘুরতে হত মানুষকে। মানুষের হাতে যখন প্রচুর সময় থাকে, তাস পিটে, ম্যাচ দেখে, হাওয়া খেয়েও পুরো অবসর কাটিয়ে ওঠা যায় না, তখন বেশ রসিয়ে রসিয়ে দোকান বাজার করায় মস্ত আনন্দ। কোনো লোভনীয় জিনিস দু-পয়সা কম দরে কেনার জন্যে চার আনা বাস ভাড়া খরচ হলে গায়ে তো লাগেই না, বরং মনে হয় মস্ত সাশ্রয় হল সংসারে!

কিন্তু চেকোস্লোভেকিয়ার কপালে আজ দুদণ্ড বসে সময় নষ্ট করবার ফুরসত নেই। দোর্দণ্ড বেগে লেগেছে সবাই দেশটাকে গড়ে তুলতে। তাস পেটাবার, আড্ডা দেবার অবসর কারো নেই। দোকানে দোকানে ঘুরে দর দস্তুর করে বাছাই করে জিনিস কিনে ঘরে তুলবে, এ বিলাসিতা আর সাজে না। এই জন্যেই বোধ করি দোকান-গুলোকে এরা একেবারে ঢেলে সাজিয়েছে। মানুষের নামের বা

শৌখিন নামের কোনো দোকান আর নেই। ব্যবহার্য যত কিছু দ্রব্য হতে পারে তাদের নানা ভাগে ভাগ করা হয়েছে—যেমন ওষুধ-পত্র, কাগজ-কলম, খাদ্য-দ্রব্য, আধা-রাঁধা খাবার, জুতো, কাপড়-চোপড়, সেলাই ও বোনার জিনিস ইত্যাদি। এই সব জিনিস যে দোকানে পাওয়া যায় তাদের নাম যথাক্রমে দ্রগারিয়ে, পাপিরনিৎস্ভি পোত্রাভিনি. পলটভারি, অবুভ, অডিয়েঝী, গ্যালেন্টারিয়ে ইত্যাদি। প্রত্যেক পাড়াতেই এই সব কয়কম দোকান আছে। সব জিনিসই নিজের পাড়ায় পাওয়া যাবে—অন্য পাড়ায় যেতে হবে না। অন্য পাড়ায় গেলেও যে আরো ভাল বা আরো সস্তা জিনিস পাওয়া যাবে তাও নয়। জিনিসের নামে দোকানের নাম। তাই দেখে ঢুকে যান। জানলায় প্রত্যেক দ্রব্যের দাম লেখা, তা সে স্বয়ং-সেব দোকানই হোক আর দোকানদার-সেবিত বিপণীই হোক। দাম দেখে জিনিস পছন্দ করুন। তামাম দেশের প্রত্যেকটি জিনিসের দাম বাঁধা। এক পয়সাও ঠকবেন না।

কিছুদিন পরে একদিন এক মিষ্টির দোকানে ঢুকেছিলুম। প্রাহার যে প্রধান সড়ক তার থেকে লম্বভাবে বেরিয়ে এসেছে ভজিচ্‌কোভা রাস্তা। সেই রাস্তায় ট্রামের লাইনের ধারে একটানা এক বারান্দার শেষে দোকানটি। প্রাহায় যতবার এসেছি এ দোকানে একবার না একবার না খেয়ে যাই নি। আগে কি নাম ছিল মনে নেই, এবারে আজকালকার পর্যায়নিয়মানুযায়ী—'ৎস্লুক্রার্না' অর্থাৎ মিষ্টির দোকান। জানলায় দাঁড়িয়ে মিষ্টিগুলো দেখলুম। মিষ্টির চেহারা সব বদলে গেছে। মিষ্টির রকম অজস্র হলেও আগেকার দিনে যেমন মিষ্টির মধ্যে দোকানের একটা বৈশিষ্ট্য পাওয়া যেত তা আর নেই। অন্য সব ৎস্লুক্রার্নাতে যা, এখানেও বেশীর ভাগ তাই, সামান্য দু-চারটে ছাড়া। ঐ টুকু বৈশিষ্ট্য এখনও দেখলুম আছে। দোকানে ঢুকেই দেখি সেই পঁচিশ বছর আগে যে বুড়িকে দেখেছিলুম সেই একই বুড়ি চোখে চশমা এঁটে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আগেরই মত কটমট করে

চেয়ে এক থোকা দোকানের বিল হাতে করে প্রত্যেক খদ্দেরের হাতে একটা করে গুঁজে দিচ্ছেন। এই হচ্ছে এ দোকানের নিয়ম। ঢোকবার একটিই দরজা—সেখানে ঐ বুড়ি। তাঁর হাত থেকে একটি করে বিলের কাগজ নিয়ে তবে ঢুকতে হয়। ঐ হচ্ছে দোকানে ঢোকবার টিকিট বা আমন্ত্রণ পত্র। তারপর সেই কাগজের টুকরোটি বাঁ হাতে উঁচিয়ে ধরে ডান হাতের আঙুল দিয়ে মিষ্টি দেখিয়ে দিতে হবে। মিষ্টি ভরা কাঁচের তাকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ঝি-রা। তাঁরা চকচকে থালায় করে আপনার পছন্দ-করা মিষ্টিগুলি সাজিয়ে দিয়ে আপনার হাত থেকে বিলের কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে মিষ্টির দামটা লিখে দেবেন। তারপর চলে যান চা-কফি-লেমনেডের জায়গায়। সেখানকার ঝিও বিল-কাগজের উপর চা কফি বা লেমনেড যা খেতে চান তার দামটা লিখে দেবেন। খাওয়া শেষ হলে চলে যান আর একটা দরজার কাছে—সেটা হচ্ছে বেরোবার দরজা। সেখানে আর এক গিন্নি বসে আছেন পয়সার বাক্স নিয়ে। তাঁর কাছে এসে পৌঁছলেই তিনি বিলের কাগজটা আর একবার আপনার হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে দামগুলো যোগ করে ফেলবেন। দামটা চুকিয়ে দিলে তবে আপনি বেরোতে পারবেন দোকান থেকে। নইলে রইলেন। বিলের কাগজ হারিয়ে ফেললেই বিপদ। ঐ বুড়িকে ঠিক ঐখানে দাঁড়িয়ে ঐ রকম কড়া মেজাজে কাগজ বিলি করতে দেখে এসেছি পঁচিশ বছর আগে। প্রথমে হয়তো ইনি এই দোকানের অধিকারিণী ছিলেন। এখন অধিকার হারিয়ে নিশ্চয় হয়েছেন মাইনের চাকরানী। কিন্তু তাতেও এঁর বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নি। দোকানের যে দরজার সামনে ইনি দাঁড়াতেন এখনও সেইখানেই দাঁড়াচ্ছেন। আগেও যেমন বেঁটে ছিলেন, যেমন পাকা-চুল ছিল এখনও তেমনি আছে। জার্মানরা যখন প্রাহা দখল করে নেয়, সব কিছু তছনছ করে ওলোট-পালোট করে দেয়, তখনও মনে হয় এই বৃদ্ধাকে এঁর স্থান থেকে কেউ নড়াতে পারেনি। তারপর

এত বড় যুদ্ধ গেল। যুদ্ধের পর বিপ্লব। কে কোথায় ছটকে পড়ল, এই বুড়ি কিন্তু ঠিক নিজের জায়গায় আছেন। মিষ্টি খেয়ে ফেরবার সময় সেই আদ্যিকালের বুড়ির দিকে বেশ করে আর একবার তাকিয়ে নিয়েছিলুম। এত ঝড় ঝাপটার মধ্যেও এই বৃদ্ধার স্থৈর্য মনকে মুগ্ধ না করে পারেনি।

৩

প্রাহায় পৌঁছে আমার প্রথম ও প্রধান করণীয় ছিল চেক্ বিজ্ঞান আকাদেমির সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার কাজের ব্যবস্থা করে ফেলা। বিজ্ঞানের নানা শাখায় যত কিছু গবেষণা হয় তাদের মধ্যে একটা সঙ্গতি আনা বিজ্ঞান আকাদেমির একটি প্রধান কাজ। এ কাজের যেমন গুরুত্ব তেমনি দায়িত্ব। সত্যি কথা বলতে কি, দেশের বৈজ্ঞানিক প্রগতির চরম দায়িত্ব আকাদেমির। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরা সাধারণত ঐ শাখার কোনো এক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করেন। এমনি নানা সংস্থা আছে। তাদের সবার উপরে এই বিজ্ঞান আকাদেমি। ভ্ল্টাভা নদীর ধারে যেখানে এ দেশের বিখ্যাত সুন্দর এবং প্রকাণ্ড জাতীয় রঙ্গমঞ্চ তার ঠিক উল্টো দিকে বিজ্ঞান আকাদেমির আফিস। সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলুম আমার আগমনবার্তা জানাতে। ওঁদের সঙ্গে কথাবার্তায় জানতে পারলুম যে, আমি যে সংস্থায় কাজ করব তার অধিকর্তা এখন জেনিভায়। তাঁর ফিরতে কয়েকদিন দেরী হবে। এই সুযোগে এ কদিনের মধ্যে আমি বরং প্রাহার বাইরে কোথাও ঘুরে আসতে পারি।

—এই এলেন, এরই মধ্যে কাজ আরম্ভ করবেন কি? একটু অভ্যস্ত হয়ে নিন আমাদের আবহাওয়ায়! এই বলে আমাকে খুব খুশী করে বিজ্ঞান আকাদেমি বিদায় দিলেন।

আমি বাড়ি ফিরে এসে ঠিক করলুম, বোহিমিয়ার উত্তরাংশে ক্রকনশে পাহাড়ের নীচে কটা দিন কাটিয়ে আসব। আমাদের মেয়ে লামিই প্রস্তাব করল। লামি ছুটির মধ্যে বসে না থেকে ভূতত্ত্বের কিছু কিছু শিক্ষানবিসি শুরু করে দিয়েছিল। পাহাড় অঞ্চলে যেত মাঝে মাঝে 'ফিল্ড ওয়ার্ক' করতে। ও-দেশে বসে থাকা মুশকিল, বসে থাকা যায়ই না। লামির শখ ভূতত্ত্ব পড়ার, এ কথা যেই এরা জানল অমনি ব্যবস্থা হয়ে গেল আপনি। ঠিক হয়ে গেল ভূতত্ত্ব সংস্থার একটি দলের সঙ্গে লামি যাবে ফিল্ড ওয়ার্ক করতে। যে ভদ্রলোক লামিকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার ভার নিয়েছিলেন তিনি উক্ত সংস্থার একজন কর্মী—নাম ভ্লাদিমির। আমার সঙ্গে আলাপ হতেই আমি নাম দিয়ে দিলুম—ভোলাবাবু। সেই নামেই তিনি এখনও পরিচিত। তাঁর স্ত্রী লীডা দেবীও এ নিয়ে বিন্দুমাত্র আপত্তি করেন নি। ভোলাবাবু বললেন—চলে আসুন আপনারা আমাদের গ্রামে ক্রকনশে পাহাড়ের তলায়। সেখানে এবং পাহাড়ের উপরে দু জায়গাতেই আমাদের ক্যাম্প হয়েছে। আপনারা থাকবেন পাহাড়ের নীচে আর লামি ঘুরবে আমাদের সঙ্গে মোটার বাইকে। এ ব্যবস্থা আমাদের মনঃপুত হল।

পরদিন ট্রেনে করে সন্ধ্যার সময় গিয়ে পৌঁছলুম পাহাড়তলীর স্টেশানে। ভোলাবাবু বলেছিলেন, তিনি প্রাহা থেকে মোটার বাইক-এ করে আসছেন। এবং আমাদের আগেই এসে পৌঁছবেন। স্টেশানে থাকবেন তিনি। সেখান থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন গ্রামে তাঁদের বাড়িতে। কিন্তু দেখলুম, ভোলাবাবু বা তাঁর মোটার বাইক কারুরই কোনো চিহ্ন নেই। জায়গাটা আমাদের অচেনা। লামি একবার এসেছিল, তাই চেনে খানিকটা। স্টেশান থেকে বেশ কিছু দূরে গ্রাম। লামি বললে ও ঠিক নিয়ে যেতে পারবে। লোকে তাড়াহুড়ো করে কোথাও আসবার সময় এটা ওটা ভুলে ফেলে আসে ; আমাদের হয়েছিল ঠিক উল্টো। আমরা তাড়াহুড়োয়

জিনিস বাছাবাছির সময় না পেয়ে তিনখানা বাড়তি স্যুটকেস নিয়ে এসেছিলুম। এ ছাড়া রুকস্যাক, থলি এবং আরো বাক্স ছিল। প্রত্যেকে পিঠে একখানা করে রুকস্যাক বেঁধে দু হাতে স্যুটকেস ব্যাগ প্রভৃতি ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লুম স্টেশন থেকে। কিছুদূর এগিয়েই দেখা গেল রাস্তা আর রাস্তা নেই—অবুঝের মত ধীরে ধীরে রেলের লাইনের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গিয়েছে। লামি স্বীকার করলে যে তার রাস্তার গোলমাল হয়েছে। আমরা বললুম—আচ্ছা বেশ, গ্রামটা কোন্ দিকে মনে আছে? লামি তখন আমাদের নিয়ে খানিকটা পিছন ফিরে গেল। তারপর একটা টিলার উপর উঠে আঙুল দিয়ে দূরে দেখিয়ে বললে—ঐদিকে! তখন অন্ধকার হয়ে আসছে। টিলার নীচে বহুদূরবিস্তৃত এক উপত্যকা, তার এক দিকে একটা ছোট পাহাড় আর অন্য দিকে পাহাড়েরই মত উঁচু কয়লার গুঁড়োর স্তূপ, কয়লার খনির ক্ষেত্রে যা থাকে। খুব সম্ভবত গ্রামটা কয়লাগুঁড়োর পাহাড়েরই আড়ালে—কারণ, গ্রামের কোনো আলো আমাদের চোখে পড়ল না এবং সেই ঘনায়মান কুয়াসাচ্ছন্ন অন্ধকারে গ্রাম যে কত দূর তারও আন্দাজ পেলুম না। তবে একটা রাস্তা পাওয়া গেল। লামি বললে—এইটেই বোধহয় গ্রামে যাবার রাস্তা।

অনিশ্চিত পথ। অনির্দিষ্ট যাত্রা। চারটি প্রাণী—একজনের পিছনে আর একজন, মাথা নীচু করে গুটি গুটি এগোচ্ছি। দু পা এগিয়েছি, দেখি একদল লোক হল্লা করতে করতে আমাদের দিকে আসছে। মদ খেয়েছে। আমাদের লক্ষ্য করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে শুনলুম—বিদেশী লোক। কে এরা?

একজন এগিয়ে এল। কম বয়েসী একটি ছেলে—মুখে হালকা হালকা সোনালী গোঁফ দাড়ি। কদিন কামায়নি কে জানে? দু পায়ে দাঁড়াতে পারছে না—টলছে। মাতাল দেখে লামি আর লামির মা হন্ হন্ করে দূরে সরে পড়লেন। মাতাল ছেলেটি আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল—কোথায় চলেছ তোমরা?

বললুম—গ্রামে যাচ্ছি।

—আরে কোন্ গ্রামে ?

এই খেয়েছে। গ্রামের নাম তো জানা নেই। দু একবার শুনেছিলুম বটে, কিন্তু চেক গ্রামের নামগুলো এমন শক্ত যে, মুখস্থ না করে নিলে মনে থাকবার নয়। অসহায়ভাবে মিতুর দিকে তাকালুম।—কিরে মিতু, গ্রামের নাম জানিস ?

মিতু ঘাড় নেড়ে বললে—না।

আমি তখন অন্ধকারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললুম, ও······ই নীচের দিকে।

ছেলেটি বোধহয় ভাবলে, আমরা সত্যিই কোনো থাকবার জায়গা ঠিক করে আসিনি ; সন্ধ্যের সময় খুঁজে দেখছি, কোথায় থাকা যায়। সে বললে—কোথায় ঘুরে মরবে ? চল আমার বাসায়। সেখানে থাকবে।

আমি বললুম—আমাদের এক বন্ধু আছেন নীচের গ্রামে। অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্যে।

—নাম কি ?

নাম বললুম। ছেলেটি বললে—ও নামে তো তিন চার ঘর আছে। হয়তো আরো বেশী। দাও তোমার স্যুটকেসটা। আমি বয়ে নিয়ে যাবো।

কথা কওয়ার ফলে পিছিয়ে পড়েছিলুম। দূর থেকে গৃহিণীর তাগিদ কানে এল—মাতালকে ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসো।

লোকটা এমনভাবে কথা কয়ে উঠল যে, মনে হল, আমাদের বাংলা বাক্য বুঝেছে। বললে—ভয় নেই। ভয় পেও না, আমি তোমাদের ঠিক পৌঁছে দেব। বলে ভারি স্যুটকেসটা আমার হাত থেকে প্রায় কেড়েই নিল। আমি চেঁচিয়ে গৃহিণীকে বললুম—মাতাল হলেও লোকটা ভাল। এ ভাল মাতাল।

খানিক হেঁটে আমরা কয়লা-খনির সদর দরজার কাছে এসে

পৌঁছলুম। সেখান থেকে ডান-হাতি একটা শুঁড়ি রাস্তা গেছে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নীচে উপত্যকার দিকে নেমে। মনে হল, সেইটেই গ্রামে যাবার শর্টকাট পথ। ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করতে সে বললে—এইটেই গ্রামে যাবার রাস্তা বটে, কিন্তু দাঁড়ান, হয়তো পাকা রাস্তা দিয়ে আপনাদের গ্রামে পৌঁছে দিতে পারব। দেখি একটা গাড়ি পাওয়া যায় কিনা। 'পানি' (অর্থাৎ শ্রীমতী), আসুন তো একবার আমার সঙ্গে। এই বলে গৃহিণীকে সঙ্গে করে কয়লাখনির আফিসে টেলিফোন করতে ঢুকল।

আমাদেরই কপাল খারাপ—গাড়ি নিয়ে কর্তারা একটু আগেই শহরে বেরিয়েছেন, ফিরতে দেরি হবে। টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে কয়লাখনির আফিস থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেটি বললে—কোনো ভয় নেই, আমি ঠিক পৌঁছে দেব তোমাদের! বলে দু হাতে দুটো ভারি ভারি সুটকেস নিয়ে রাস্তায় নেমে দাঁড়াল। পা দুটো যে ভেঙে ভেঙে পড়ছে সে দিকে খেয়ালই নেই।

আমরা হাঁ হাঁ করে আপত্তি করে বসলুম। প্রথমত অচেনা লোক দিয়ে এত মাল বওয়াই কি করে? দ্বিতীয়ত, অন্ধকারের মধ্যে এই মাতাল কোথায় নিয়ে যায় তার ঠিক কি? বললুম—আপনি কেন কষ্ট করবেন? রাস্তাটা কোন দিকে বলে দিন, আমরা ঠিক যেতে পারব।

—না, না, অন্ধকারে কোথায় যাবেন এত মালপত্র নিয়ে? কোথায় হোঁচট খেয়ে পড়েন তারই ঠিক কি? 'তুমি' থেকে এতক্ষণে আমরা 'আপনি'তে উঠলুম। মাতাল হলে কি হয়, আমাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান দেখলুম বেশ টনটনে। আমাদের ইতস্তত ভাব বোধহয় বুঝল খানিকটা। পকেট থেকে চকোলেট বার করে বললে —এই নিন চকোলেট। ভয় পাবেন না। বলে মস্ত এক প্যাকেট চকোলেট আমাদের হাতে গুঁজে দিলে।—এই নিন আর একটা চকোলেট। এই নিন আরেকটা। ভরসা দেবার উৎসাহে এবং

মাতাল-সুলভ উদারতায় তিন প্যাকেট চকোলেট তিনজনকে দান করে ফেলল। আমরা মহা অপ্রস্তুতে পড়লুম। বর্তমান চেকো-শ্লোভেকিয়ায় চকোলেটের দাম সাংঘাতিক। মাঝারি সাইজের এক প্যাকেট চকোলেট দশ বারো মুদ্রার কম নয়। আর এই অচেনা লোকটা আমাদের তিনটে বড় বড় প্যাকেট খয়রাত করে ফেলল। ফিরিয়ে দিতে গেলুম—কে শোনে কার কথা। ভারি ব্যাগ দুটো দু হাতে তুলে নিয়ে টলতে টলতে এগোল অন্ধকারের মধ্যে। আমরা চললুম তার পিছু পিছু।

পায়ে চলা এবড়ো খেবড়ো রাস্তা। খানিক আগে বৃষ্টি হয়ে ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে। আধ-ভাঙা একটুখানি চাঁদের মুখ কখনো দেখা যাচ্ছে কখনো বা যাচ্ছে না। টর্চ আমাদের একখানা আছে বটে কিন্তু ব্যাটারি নেই। ভারি মাল নিয়ে পিছল পথে সাবধানে চলতে হচ্ছে, কখন বা পিছলে পড়ে যাই। মাতালের কিন্তু কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সার্কাসের দড়ির উপর দিয়ে যারা মাতালের অভিনয় করতে করতে হাঁটে ঠিক সেই রকম। রাস্তার মাঝখানে ব্যাগ দুটো নামিয়ে পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরাল। আমরাও থামলুম একটু জিরোতে। ছেলেটি বললে—ভয় পাবেন না, ঠিক পৌঁছে দেব আমি।

গৃহিণী হেসে বললেন—কোথায় পৌঁছে দেবেন? বাড়ি চেনেন আপনি?

—গ্রামের মাঝখানে পৌঁছই আগে। তারপর খুঁজে বার করতে কতক্ষণ? দেখুন না, আপনাদের শর্টকাট দিয়ে নিয়ে যাই। তারপর মাল দুটো এক হেঁচকায় মাটি থেকে তুলে নিয়ে আমার দিকে ফিরে বললে—মহাশয়, কোথা থেকে আসছেন বলুন তো? ঘর কোথায়?

বুঝলুম, দেশ জানতে চাইছে। বললুম—কেন, ইণ্ডিয়া!

—আরে না, তা কখনো হয়? বলে সিগারেটে একটা গভীর টান দিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল। আমার কথা বিশ্বাসই করল

না। ভাবলে, ঠাট্টা করছি। এইভাবে চলতে চলতে পাহাড়ের ঢালুটা পার হয়ে ক্রমে আমরা সমতল জমিতে নামলুম। পিছনে গুঁড়ো কয়লার প্রকাণ্ড আকাশচুম্বী পাহাড়—খনি থেকে কয়লা তোলবার পর যা বাদ যায় তা জমা করতে করতে পাহাড়ে দাঁড়িয়ে গেছে। সামনে গ্রামের আলো চোখে পড়তে লাগল। ছেলেটি বললে—এই রাস্তা দিয়ে সোজা গেলেই গ্রামের চৌরাস্তা পাবো। এই বলতেই লামি দেখি একটা নতুন রাস্তা আবিষ্কার করে হনহন করে চলতে শুরু করেছে।

ছেলেটি বলে উঠল—আরে স্লেচ্না যান কোথা ?

আর স্লেচ্না! স্লেচ্না অর্থাৎ কুমারী লামি ততক্ষণে বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছেন এবং তারপর শুনলুম আমাদের ডাকছেন—পেয়েছি। এই রাস্তা। এদিকে চলে এস সবাই।

আমরা ঘুরতে যাই, মাতাল বাধা দেয় ; বলে—স্লেচ্না কি জানে ? আমাদের গ্রাম আমি জানি। ডাকো স্লেচ্নাকে, আমি ঠিক নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের।

কিন্তু লামি ততক্ষণে স্থিরনিশ্চিত যে সে ঠিক রাস্তা ধরেছে। সে ফিরল না। দূরে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করতে লাগল। আমরা দোটানার মধ্যে পড়ে দাঁড়িয়ে রইলুম খানিকক্ষণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিতলো লামিই। ব্যাগ দুখানা তুলে নিয়ে মাতাল বলল—চলুন, দেখাই যাক স্লেচ্না কোন্ দিকে নিয়ে যেতে চান।

লামির পথ ধরে চলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এক নিথর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালুম। লামি বললে—এই বাড়ি। দেখে মনে হল, বাড়িতে কেউ নেই। কে জানে, আমাদেরই খুঁজতে বেরিয়েছে কিনা ? কিন্তু তা নয়, এখানকার লোকেরা আসলে বাড়ির মধ্যে চুপচাপ থাকতে ভালবাসে—বাইরে কোনো শব্দ কানে আসে না। যেই ঘণ্টা টিপলুম, অমনি ভোলাবাবুর বোন এসে দরজা খুলে দিলেন। পিছনে ভোলাবাবুর বাবা।

মাতাল ছেলেটিকে দেখে ভোলাবাবুর বাবা বললেন—আরে, তুমি কোথা থেকে?

ছেলেটি বললে—এঁরা ঘুরছিলেন দিশেহারা হয়ে, তাই পৌঁছে দিয়ে গেলুম।

আমরা বললুম ছেলেটির দয়ার কথা। জানালুম, আমরা কত কৃতজ্ঞ।

ভোলাবাবুর বাবা আমাদের মালপত্র ভিতরে টেনে নিতে নিতে বললেন—আসুন সবাই। ছেলেটিকে বললেন—তুমিও এসো।

ছেলেটি রাজী হল না। বললে—আমার কর্তব্য শেষ। এখন আমি চললুম। এ অবস্থায় আজ আর নয়। আর এক দিন আলাপ করা যাবে। বলে চলে যেতে যেতে ভোলাবাবুর বাবাকে এক পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—এঁরা কোথাকার লোক?

ভোলাবাবুর বাবা বললেন—কেন, ইণ্ডিয়ার।

—অ্যাঁ? বলে সে আমাদের দিকে আর একবার বড় চোখ করে তাকিয়ে মাথা-টাথা চুলকে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল টলতে টলতে।

আমরা ভোলাবাবুর বাবাকে বললুম— একে আপনি চেনেন?

—চিনি বইকি। খনি-মজুর—এই তো ক মাস আগে কাজের উৎকর্ষের জন্যে মস্ত একটা প্রাইজ পেয়েছে। সেদিন আমরা সবাই ওকে অভিনন্দন দিলুম। ছেলেটি ভাল, অনেক গুণ আছে, তবে ঐ —হঠাৎ এক-এক দিন কি খেয়াল চাপে, মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে যায়। তবে অভদ্রতা কোনদিন করেনি।

আমরা বললুম—আমাদের সঙ্গে তো অতি ভালো ব্যবহার করেছেন। উনি নিজে থেকে মাল বয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন তাই, নইলে অন্ধকারে মাঠের মধ্যে দিয়ে আমরা কিছুতেই আসতে পারতুম না।

ভোলাবাবুর বাবা বললেন—ছেলেটির বাবা ছিল আমার

সমসাময়িক। আমরা এক সঙ্গে খনিতে কাজ করতুম। তখনকার দিনে কী ছিল আমাদের অবস্থা! খনির কুলি মানে মজুর সমাজের মধ্যেও সবচেয়ে নগণ্য। তখনকার দিনের কথা দুঃস্বপ্নের মত মনে পড়ে। ঐ ছেলেটির বাবা কয়লাখনির ছাদ পড়ে মারা যায়। তারপর অনেক দিন দুঃখে কষ্টে কাটিয়েছে ওদের পরিবার। আর আজকে ঐ ছেলের রোজগার—দেখে আসবেন ওদের বাড়ি, অবাক হবেন দেখে।

আমরা বললুম—উনি তো ওঁর বাসাতেই আমাদের নেমন্তন্ন করেছিলেন।

ভোলাবাবুর বাবা নিজে খনি-মজুর ছিলেন। দেশে বিপ্লব হবার পর খনি-মজুরদের অবস্থা একেবারে ফিরে যায়। আগেকার দিনের সঙ্গে কোনোরকম তুলনার কথা ভাবাই যায় না। এখন যা হয়েছে তা অবিশ্বাস্য রকমের ভাল। বয়েস হওয়ায় কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন কয়েক বছর হল। জমি সমেত বেশ বড় একটা বাড়ির দোতলাটা নিয়ে আছেন। অনেকগুলি ঘর। নীচের তলায় মেয়ে-জামাই থাকে। পেনসন পান। সচ্ছল অবস্থা। মাঝে মাঝে প্রায়ই খুচরো কাজের জন্যে ডাক আসে—তখন রোজগার হয় আরো বেশী। লেখাপড়া নিয়ে আছেন এখন। বাড়ি-ভরা বই। বয়েস-কালে সরস্বতীর প্রসাদে বঞ্চিত ছিলেন, এখন সুদ সুদ্ধ পুষিয়ে নিচ্ছেন। ছেলে বুদ্ধিমান, বিদ্যাচর্চা করেছে, তার ফলে আজ ভূতত্ত্ব সংস্থায় কাজ করে। তবে মজা আছে। ভোলাবাবু বিজ্ঞানচর্চা করেছেন, ভূতত্ত্ব সংস্থায় গবেষণায় লিপ্ত, কিন্তু রোজগারের কথা যদি ভাবা যায়, তা হলে ঐ মাতাল ছেলেটি, যে খনি-মজুর, তার রোজগার ভোলাবাবুর থেকে অনেক বেশী। ভোলাবাবুর পক্ষে তিন প্যাকেট চকোলেট পকেট থেকে বার করে অচেনা পথিকদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া অত সহজ হত না।

ভোলাবাবুর মা ও বোন আমাদের দোতলায় নিয়ে গেলেন

রান্নাঘরে। রান্নাঘরের গরমে এসে বেশ আরাম পেলুম। ভোলা-বাবুর মা বললেন, তাঁর ছেলে একটু আগে মোটার বাইকে করে বাড়ি পোঁছেছেন। পোঁছেই আমরা এসেছি কিনা খোঁজ নিয়ে ছুটেছেন স্টেশানে। খুব সম্ভবত আমরা শর্টকাটে এসেছি বলেই পথে মোলাকাত হয়নি।

আমাদের পৌঁছতে রাত হয়ে গিয়েছিল। খাবার সময় উতরে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। এ-সময় কারুর বাড়িতে গরম খাবার থাকবার কথা নয়—বড় জোর পাঁউরুটি আর চীজ আশা করা যেতে পারে। কিন্তু ভোলাবাবুর মা কোথা থেকে জানি না গরম স্যুপ, মাংসের ঝোল প্রভৃতি চর্বচোষ্য এনে হাজির করলেন।

ভোলাবাবুর মোটার বাইকের শব্দ পাওয়া গেল। আমাদের না পেয়ে ফিরে আসছেন। রান্নাঘরে ঢুকেই বললেন—আপনাদের পথ-প্রদর্শকের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। তাতেই দেরী। ধরে নিয়ে গেল আমাকে তার এক বন্ধুর বাড়ি। এখন তো দোকান সব বন্ধ, কাজেই বন্ধুর কাছ থেকে এই দেখুন এই চকোলেটটা আদায় করে আমার হাত দিয়ে আপনাদের পাঠিয়ে দিয়েছে। এই বলে ভোলাবাবু মস্ত এক প্যাকেট চকোলেট রাখলেন টেবিলের উপর।

আমরা অবাক হয়ে বললুম—সে কি, আমরা তো তিন প্যাকেট চকোলেট পেয়ে গেছি ইতিমধ্যেই।

—তিন প্যাকেটের জন্যেই তো মুশকিল। আপনারা চারজন তার উপর সাগরপারের অতিথি। ছেলেটি ভারি অস্বস্তি বোধ করছিল। ভাগ্যিস আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এবার বাড়ি গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমবে।

॥ ৪ ॥

পরদিন ভোরে ভোলাবাবুদের ফিল্ড ওয়ার্কে বেরবার কথা, কাজেই আমি ঘুম থেকে উঠেই হাতুড়ি হাতে ওদের গাড়ি করে চলে গেল পাথর ভাঙতে। আর আমরা ঘুম থেকে উঠে মুখটুখ ধুয়ে দেখি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন ভোলাবাবুর মামা।

—চলুন আপনাদের কারেল চাপেকের জন্মস্থান দেখিয়ে আনি।

আমাদের গ্রামের নাম 'টিনে'। তার পাশের গ্রাম 'মালে স্বাটনভিৎসে'। সেইখানেই চেকোস্লোভেকিয়ার এ যুগের শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক কারেল চাপেক জন্মেছিলেন। কারেলের সব উপন্যাস এবং নাটকই ইংরেজীতে তর্জমা হয়েছে। যুদ্ধের আগে চাপেকের বই ইংলণ্ডের লোক প্রচুর পড়ত।

চাপেকের বিখ্যাত নাটক 'ইনসেক্ট প্লে' এবং 'মাদার' মাসের পর মাস লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। এমন একটি ছোট্ট দেশ থেকে আধুনিক যুগে বিশ্বের সাহিত্য ক্ষেত্রে যে এদেরই একজন গদ্যলেখক পাকাপোক্ত স্থান করে নিয়েছেন এর জন্যে এরা সবাই ভারি গর্ব অনুভব করে। চাপেকের উপন্যাস ছাড়াও তাঁর অপূর্ব ভ্রমণ কাহিনী, ছোট গল্প এবং রম্যরচনা আমি পড়েছিলুম। উপন্যাসের চেয়েও সেগুলি আমার আরও ভালো আরো সরস আরো মধুর লেগেছিল। কাজেই চাপেকের জন্মস্থানের এত কাছে আমরা এসে পড়েছি এটা যখন শুনলুম তখন সুখী এবং চঞ্চল না হয়ে থাকতে পারলুম না। মামাবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম মালে স্বাটনভিৎসে গ্রামের দিকে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু পাশে গমের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। গম কাটা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে 'য়েটেল' আর ঘাসের জমি।

এই থেকে এদের ঘোড়ার বিচালি হয়। য়েটেল একটু বেড়ে উঠলেই কেটে ঘরে নিয়ে যায়। কিছুদিনের মধ্যে ডগা থেকে আবার পাতা বেরয়। তখন আবার কাটে। এমনি চলে শীতের আরম্ভ পর্যন্ত। এদের শুকিয়ে বাড়ির ছাদের ঘরে জমা করে রেখে দেয়। শীতকালে যখন চারিদিক বরফে সাদা, কোথাও ঘাসের চিহ্ন মাত্র থাকে না, তখন ছাদের ঘর থেকে এই বিচালি টেনে বার করে ঘোড়াকে গরুকে খেতে দেয়। চরণিক যারা, তারা জানে এই শুকনো ঘাসের আসল মূল্য। সন্ধ্যার সময় ঘুরতে ঘুরতে কোনো অচেনা গ্রামে পৌঁছে অজানা চাষীর বাড়ি আশ্রয় নিলে তার ছাদের ঘরে শুকনো ঘাসের উপর রাত কাটাবার স্থান পাওয়া যায়। শুকনো ঘাসকে এরা বলে 'সেনো'। সেনোর উপর চাদর পেতে ঘুমোতে যা আরাম—চরণিক হয়ে যে না ঘুমিয়েছে সে ছাড়া আর কেউ জানে না।

গম আর সেনোর জমির ঠিক পিছনেই ঢিপি-মত একখানা পাহাড়। মামাবাবু বললেন—এ পাহাড়টা এখানে কেমন করে এল জানেন ?

আমরা বললুম—পাহাড় আবার আসে নাকি ? যেখানকার পাহাড় সেখানেই তো থাকে।

মামাবাবু মুখ গম্ভীর করে বললেন—এ পাহাড় সে রকম পাহাড় নয়। শুনুন তাহলে বলি। এই যে ক্রেকনশে অঞ্চল দেখছেন এখানে পুরাকালে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে, এও তার মধ্যে একটা। আমাদের গ্রাম থেকে খুব বেশী দূর নয়, এক জায়গায় একটি সুফলা চেরিগাছ ছিল, সে গাছে সারা বছর চেরি ফল ধরত। ফল খেতেও যেমন মিষ্টি ফলের গুণও ছিল তেমনি। সেই চেরি খেয়ে কত লোকের কত রোগ যে সেরে গেছে তার ঠিক নেই। একবার হল কি, সেই চেরিগাছ হঠাৎ যেতে লাগল শুকিয়ে। তাতে আর ফল ধরে না। সবাই বললে—দেশের লোকের পাপে গাছ মরে যাচ্ছে। তাকে অনেক বাঁচাবার চেষ্টা হল কিন্তু কিছুই হল না।

একের পর এক পাতা ঝরে ঝরে পড়ে যেতে লাগল ; একের পর এক ডাল শুকিয়ে যেতে লাগল। সেই সময় কোথা থেকে দেশে এক সাধু এলেন। তিনি এসে বসলেন সেই গাছের তলায়। তিন দিন শুধু চুপ করে বসে রইলেন। তারপর চেরি গাছের তলা থেকে একখানি পাথর সরিয়ে ফেললেন। পাথর সরাতেই কুল-কুল ঝরনার জল বয়ে চলল। গ্রামের লোক চারিদিক থেকে সাধুকে দেখতে জড় হয়েছে। সাধু বললেন—খোঁড়ো এখানে এক 'স্টুডাংকা' অর্থাৎ চৌবাচ্চা। সবাই মিলে মস্ত এক স্টুডাংকা খুঁড়ে ফেলল। সেই স্টুডাংকা থেকে জল তুলে গাছের গোড়ায় ঢালতেই গাছ আবার আগের মত হয়ে গেল। সবুজ পাতায় গাছের ডাল গেল ভরে। খবরটা রটে যেতেই চারিদিক থেকে পূজো পড়তে লাগল সেই স্টুডাংকায় আর গাছতলায়। জায়গাটা তীর্থস্থানে পরিণত হল। লোকেরা বললে, এখানে ঠাকুরের মন্দির তৈরী করতে হবে।

এখন ঠাকুরের শত্রু হচ্ছেন শয়তান। শয়তানের কানে যেই এ খবরটা পৌঁছল অমনি সে তার একজন 'চের্টকে' অর্থাৎ দৈত্যকে পাঠিয়ে দিল স্টুডাংকা বুজিয়ে গাছটাকে মেরে ফেলবার জন্যে। চের্ট করল কি, একখানা ছোট-খাট পাহাড় উপড়ে নিয়ে রাত্তির বেলা রওয়ানা হল আমাদের এই গ্রামের দিকে। আমাদের গ্রাম পেরিয়ে তবে পবিত্র স্টুডাংকা আর চেরি গাছ। দৈত্যের চেষ্টা পাহাড় চাপা দিয়ে স্টুডাংকা বন্ধ করে দেবে। এই করতে পারলে ঝরনাও চাপা পড়বে, গাছও মরে যাবে, ঠাকুরের মন্দিরও আর তৈরী হবে না—তীর্থস্থান যাবে ভেঙে। দৈত্য ছুটল পাহাড় কাঁধে। অনেক পথ যেতে হবে, রাত পোয়াবার আগেই পৌঁছতে হবে। রাত পুইয়ে গেলে শয়তানের চের্টের জারিজুরি আর খাটবে না। চের্ট যখন আমাদের গ্রামের কাছে এসে পৌঁছেছে তখনও রাত রয়েছে। আর একটু এগোলেই সে স্টুডাংকার কাছে পৌঁছে যায়। ঠিক সেই সময় ঠাকুর করলেন কি, এই গ্রামের মোরগদের বললেন—ডাকো তোমরা।

গ্রাম সুদ্ধ মোরগ চারিদিক থেকে ডেকে উঠল—কক্কর কোঁ। সে কী আওয়াজ। চের্ট ভাবলে, সকাল হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ঘাড় থেকে পাহাড় নামিয়ে দৌড় দিল পাতালে। স্টুডাংকা বেঁচে গেল। আর ঐ দেখুন সেই পাহাড়। সেই থেকে আজ অবধি ওখানে পড়ে আছে।

আমরা শুনে তাজ্জব হয়ে গেলুম। বললুম—আর সেই স্টুডাংকা? সেই চেরি গাছ?

—চেরি গাছ কি অতদিন বাঁচে? কবে মরে গেছে। চলুন স্টুডাংকা দেখাতেই তো নিয়ে যাচ্ছি। চাপেকের বাড়ির পাশেই। এই বলে তিনি মালে স্বাটনভিৎসের দিকে পা বাড়ালেন। আমরাও পিছু ধরলুম।

মাইল দেড়েক দূরে মালে স্বাটনভিৎসে গ্রাম। সকালের আকাশ মেঘলা। গ্রামের পথে লোকজন খুব কম। এই শান্ত গ্রামের রাস্তায় মাঠে কারেল আর তাঁর ভাই য়োসেফ চাপেক মানুষ হয়েছেন। য়োসেফ চাপেকেরও লেখক বলে নাম আছে, তবে য়োসেফের খ্যাতি শিল্পী হিসেবেই বেশী। এই দুই ভাইকে জন্ম দিয়ে এদের গ্রাম ধন্য। এমনি মেঘলা আলোয় জানলার ধারে বসে কারেল প্রথম গল্প প্রথম উপন্যাস লিখেছেন। য়োসেফ তুলি হাতে নিয়ে হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন। সেদিনের সকালে কি হয়েছিল জানিনা, মনে হচ্ছিল যেন এ গ্রাম থেকে সভ্যজীবনের সমস্ত বেগ, চাঞ্চল্য, কর্মব্যস্ততা ছুটি নিয়েছে। আমরা ধীর গতিতে হাঁটতে হাঁটতে ক্রমে গ্রামের চত্বরে এসে পৌঁছলুম। প্রস্তরময় স্থানটি। একদিক তার নীচু, অন্য দিক উঁচু। এই হচ্ছে গ্রামের কেন্দ্রস্থল। এখানে গ্রামের পৌর আফিস, গ্রাম-সরকারের আফিস আর চাপেকের মিউজিয়াম স্থাপিত। আমাদের দেশে হলে এইখানে থাকত গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ। চাপেকের বাবা ছিলেন ডাক্তার। এই বাড়িতেই তিনি থাকতেন। দুই ছেলের জন্ম এই বাড়িতে।

সেই বাড়ি সযত্নে রক্ষা করেছে এখানকার মানুষরা। আমাদের দেশে হলে কবে ভেঙে উড়িয়ে দিত। আমরা পৌঁছে দেখলুম মিউজিয়ামের দ্বার বন্ধ। চারিদিকে কেমন একটা যেন ছুটি ছুটি ভাব। কিন্তু মামাবাবু কি অত সহজে ছাড়বার পাত্র? ভারত থেকে চাপেকের ভক্তরা এসেছেন, তাঁদের কি বন্ধদ্বার দেখিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, না বসিয়ে রাখা যায়? চললেন তিনি চাবির খোঁজে। চত্বরে এসে বললেন—উঁচুর দিকের ঐ কোণে সেই পবিত্র স্টুডাংকা আর মন্দির। দেখে আসুন গিয়ে। আমি চাবির অধিকারীকে খুঁজে বার করি ততক্ষণ।

আমরা সেই পবিত্র স্টুডাংকার দিকে এগোলুম। লোহার রেলিং দিয়ে খাঁচার মত করে ঘেরা গোল একখানা চৌবাচ্চা। তার মাথার কাছে পাথরের মধ্যে দিয়ে কলকল করে জল বেরিয়ে চৌবাচ্চা ভর্তি হচ্ছে। স্বচ্ছ চৌবাচ্চার জলের মধ্যে রাশি রাশি টাকা পয়সা চকচক করছে। তীর্থযাত্রী যারা আসে, জলের মধ্যে পয়সা ফেলে পুণ্য সঞ্চয় করে। জলের ধারে ঐতিহাসিক চেরিগাছ আর নেই। দেয়ালের গায়ে চেরিগাছের একখানা ছবি শুধু আঁকা। উপরে যীশুমাতা মেরীর মন্দির। ঝরনার জল অতি উপাদেয়। ভেষজ গুণও নাকি আছে। এক চুমুক করে সেই প্রবহমান ঠাণ্ডা জল খেয়ে নিয়ে আমরা চত্বরে এসে নামতেই মামাবাবু দেখি আমাদের চেঁচিয়ে ডাকছেন। মিউজিয়ামের কর্তাকে পাওয়া যায়নি, তিনি শহরে, কিন্তু যে রক্ষয়িত্রীর কাছে চাবি থাকে তাঁকে পাওয়া গেছে। তিনি চত্বরেরই একটি দোতলা বাড়ির বারান্দা থেকে রেলিং-এর উপর মোটা মোটা হাত রেখে মামাবাবুর সঙ্গে কথা কইছেন। ভারতের মত সুদূর দেশ থেকেই যে অতিথিরা এসেছেন মামাবাবুর এ কথায় রক্ষয়িত্রীর তখনো সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মেনি। তাই মামাবাবু তাড়াতাড়ি আমাদের চেহারা দেখাতে চান। আমরা খানিকটা এগিয়ে আসতেই উপর থেকে আমাদের আকৃতি তাঁর চোখে পড়ল।

তিনি হন্তদন্ত হয়ে হাতে চাবি ঝুলিয়ে নেমে এলেন। তারপর মহা খাতির করে নিয়ে গেলেন আমাদের মিউজিয়ামে।

কারেল চাপেকের সব কিছু রক্ষয়িত্রীর একেবারে মুখস্থ। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গড়গড় করে কি সব বলে যেতে লাগলেন না থেমে। ঐ প্রচণ্ড স্রোতের মধ্যে থেকে হয়তো এক আধটা পরিচিত শব্দ ছটকে আসছিল কানে, বাকিটা অবোধ্য। আমরা অমনোযোগী হয়ে পড়লুম কিন্তু তাতে মহিলার বক্তৃতার তোড় একটুও কমল না, তিনি কড়িকাঠের দু ফিট নীচে দেয়ালের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাঁর বাক্যস্রোত চালিয়ে যেতে থাকলেন। আমরা কখন যে আস্তে আস্তে তাঁর কাছ থেকে সরে গিয়ে মিউজিয়ামের নানা দ্রব্যাদির আশে পাশে নিজেদের নির্লিপ্ত করে ফেলেছি তা তিনি টেরই পেলেন না। সেই সময় মিউজিয়ামের কর্তা এসে ঢুকলেন। শহরে গিয়েছিলেন, কেউ বোধহয় তাঁকে খবর দিতে ছুটেছিল। তাঁকে দেখে রক্ষয়িত্রীর বক্তৃতা থেমে গেল এবং তাঁর সুকঠিন কর্তব্য কেমন সুসঙ্গতভাবে সমাধা করেছেন এই উপলব্ধিতে তাঁর মুখ স্মিত হাস্যে ভরে গেল। আমরা দেখলুম রক্ষয়িত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে মিউজিয়ামের কর্তা হাঁপাচ্ছেন।

তারপর তিনি যখন দম ফিরে পেলেন, আমাদের প্রচুর আপ্যায়ন করলেন। ছোট ছোট বই দিলেন এবং দেখাতে শুরু করলেন মিউজিয়ামের এক মুড়ো থেকে আর এক মুড়ো পর্যন্ত। প্রায় যখন মিউজিয়াম দেখা শেষ করে এনেছি সেই সময় ভোলাবাবু আর আমি তাদের পাথর কাটা শেষ করে মিউজিয়াম দেখতে এসে হাজির। কর্তামশায় নতুন উৎসাহে আবার গোড়া থেকে মিউজিয়াম দেখানো শুরু করলেন।

ক্রকনশে পাহাড়ের নীচে যে অঞ্চলে আমরা এসেছি সেটা খনি অঞ্চল। অনেকগুলো কয়লার খনি এখানে আছে। টিনে আর মালে স্বাটনভিৎসের অধিকাংশ লোকই কোন না কোন রূপে কয়লার

খনির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বংশ-পরম্পরা ধরে এই চলে আসছে। চাপেকের বাবা ছিলেন খনির ডাক্তার। গ্রামের বড়লোকেরা ছিল সব খনির মালিক। এখন খনির স্বত্ব জাতির। জাতির জীবনের মানের অগ্রগতির প্রধান উপকরণ, দেশের শ্রমশিল্পের টিঁকে থাকবার প্রধান উপায়, মোটের উপর জাতির দিনকে দিন বেঁচে থাকবার মূল রসদ আসে এই খনির থেকে। চাপেকের বাবা যখন বেঁচে ছিলেন তখনকার দিনে খনির মালিকরা খনিগুলোকে মনে করতো খুব বড়লোক হয়ে যাবার একটা চমৎকার উপায়। আজকের দিনে চেকরা মনে করে খনিগুলি হচ্ছে সমস্ত জাতির স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবার অন্যতম সহায়। সেই জন্যেই এরা খনি অঞ্চলের চেহারা একেবারে ফিরিয়ে দিয়েছে। খনি অঞ্চল শুনলে যেমন মনে হয় কালো-কালো ময়লা নোংরা গলি, ভাঙা বাড়ি, খোলা নর্দমা আর দুর্গন্ধ-ভরা বস্তি, তেমনি মোটেই নয় জায়গাটা। বরং একেবারে উল্টো। অন্য অনেক শহরের চেয়েও মনে হয় যেন বাড়িগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাজানো-গোছানো, রাস্তাগুলি ঘষা মাজা, জানলায় জানলায় ফুলের গাছ, বাগানে সযত্নে পালিত ফলের গাছ। ঘরে ঘরে রেডিও, টেলিভিশান, বিজলি উনুন, বিজলি কাপড-কাচা কল। আজকাল খনিতে যারা কাজ করে তারা নামেই মজুর, কাজের বেলা তারাই কর্তৃপক্ষ। নিজেদের মাইনে একরকম নিজেরাই ঠিক করে। বেশ আরামে আছে। নতুন নতুন বাড়ি, আধুনিক কায়দার ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে এদের জন্যে চারিদিকে।

মিউজিয়াম থেকে ফিরে এসে ভোলাবাবু সেদিন বললেন, তারপর দিন তিনি ক্রকনশে পাহাড়ের উপরে যাবেন। সেখানে এক পাহাড়ী কুটিরে তাঁর স্ত্রী ও দুটি শিশু ছুটি কাটাচ্ছেন। কাছেই পাহাড়ের উপর তাঁদের ফিল্ড ওয়ার্ক হচ্ছে, এবার তাঁকে সেইখানে কাজে যেতে হবে। আমি তাঁর সঙ্গে গেলে ভালো হয়। তাঁদের

পাহাড়ী কুটিরে থাকতেও পারবে লামি কদিন। আমরা বললুম—এ অতি উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু আমাদেরও একটা পাহাড়ী কুটির যোগাড় করে দিন না। দু-চার দিন কাটিয়ে আসি। ঠিক হল ভোলাবাবু আর লামি পরদিন পাহাড়ে গিয়ে খুঁজে দেখবেন আমাদের থাকবার মত জায়গা মেলে কিনা।

ভোলাবাবুর বাবা বললেন—চাপেকের জন্মস্থান তো দেখলেন, বোজেনা নিয়েম্‌ৎসোভা কোথায় তাঁর শৈশব কাটিয়েছিলেন দেখবেন না? বলে আলমারি থেকে টেনে নিয়েম্‌ৎসোভার একটি সুদৃশ্য সংস্করণ "বাবিচ্‌কা" বার করলেন। বাবিচ্‌কা অর্থাৎ দিদিমা, বোজেনা নিয়েম্‌ৎসোভার বিখ্যাত উপন্যাস।

আমরা বললুম—বোজেনা নিয়েম্‌ৎসোভার জন্মভূমি এখানেই নাকি?

ভোলাবাবুর বাবা বললেন—এখান থেকে ট্রেনে করে পূবমুখো একটু দূরে গেলেই উপা নদীর ধারে ফুলে ভরা যে অপূর্ব উপত্যকা পাবেন তারই নাম বাবিচ্‌কার উপত্যকা। বোজেনা যদিও জন্মেছিলেন বিদেশে ভিয়েনা শহরে, কিন্তু জন্মের পরেই তাঁর বাপ-মা তাঁকে নিয়ে চলে আসেন এখানকার রাটিবরিৎসে গ্রামে। বাবিচ্‌কার উপত্যকার পাশেই ঐ গ্রাম। সেই গ্রামেই তাঁর বেশীর ভাগ জীবন কেটেছিল। যান, কাল গিয়ে দেখে আসুন—ভাল লাগবে আপনাদের।

কাজেই তার পর দিন বেরোলুম আমরা বাবিচ্‌কার উপত্যকা দেখতে। বোজেনা নিয়েম্‌ৎসোভার লেখা বাবিচ্‌কা আমার পড়া ছিল। অপূর্ব বই। নিজের অতীব দুঃখ দুর্দশা এবং কষ্টের সময় একটু একটু করে এই বই তিনি লিখেছিলেন। মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে দারিদ্র্যের মধ্যে বোজেনা মারা যান। শৈশব আর কৈশোরের সুখস্মৃতি আর তাঁর বাবিচ্‌কার মধুর স্নেহময় অপূর্ব চরিত্র বোজেনা কোনো দিন ভুলতে পারেন নি। দুঃখের দিনে অতীতের সেই

সুখস্মৃতিকে উল্টে-পাল্টে দেখে রচনার মধ্যে যে আনন্দ পেতেন সেই টুকুই ছিল তাঁর শেষ জীবনের একমাত্র সুখোপভোগ। এই গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে তাঁর বাবিচ্‌কাকে তিনি অমর করে রেখে গেছেন।

অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় যখন বোজেনার জন্ম হয় তখন তাঁর মায়ের মা বাবিচ্‌কা বহু দূরে সিলেশিয়া অঞ্চলের এক গ্রামে বাস করতেন—মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে কোনো দিন দেখা হত না। বোজেনার জন্মের কয়েক বছর পরেই বোজেনার বাবা ভিয়েনা ত্যাগ করেন। তিনি একটি মনের মত কাজ পেয়ে যান। কাজটা রাটিবরিৎসে গ্রামে, এবং জায়গাটা সিলেশিয়া থেকে বেশী দূরে নয়। বোজেনার মা বাবিচ্‌কাকে লেখেন সিলেশিয়ার গ্রামের পাট তুলে দিয়ে রাটিবরিৎসেতে চলে আসতে। বৃদ্ধা দোটানার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। সিলেশিয়ার যে গ্রামে থাকতেন সুখে ছিলেন। সেখানে তাঁর কোনো আত্মীয় ছিলেন না, কিন্তু গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষ ছিল আত্মীয়ের বাড়া। এদের সবাইকে ছেড়ে এই বুড়ো বয়সে অজানার সন্ধানে ভেসে যাওয়া তাঁর পক্ষে বড় সমস্যাময় বড় কঠিন। কিন্তু তবু রক্তের টান বড় টান। অজানা দেশ হোক তবু নাতি-নাতনীদের তো কাছে পাবো—এই টানে পড়ে তিনি সব ছেড়ে চলে এলেন—উপা নদীর তীরে মেয়ে জামাইয়ের কাছে। যেদিন প্রথম এসে পৌছলেন, ছোট ছোট নাতি-নাতনীদের সে কী উত্তেজনা। তারা তো দিদিমাকে কখনো দেখেনি, কেমন তিনি হবেন কে জানে? অন্য শিশুদের দিদিমাদের তারা দেখেছে, তাই মনের মধ্যে দিদিমা বস্তুটির একটা ছবি আঁকা ছিল, কিন্তু যখন তাদের নিজেদের দিদিমা এসে গাড়ি থেকে নামলেন, তারা দেখল তাদের কল্পনার সঙ্গে একটুও মিলছে না। এ একেবারে নতুন বস্তু। তারপর থেকে এই বাবিচ্‌কা ছাড়া নাতি-নাতনীদের একটি দিনও কাটেনি। অদ্ভুত গল্প বলার ক্ষমতা এবং কৌশল ছিল বাবিচ্‌কার। বাবিচ্‌কার প্রভাব নাতি-নাতনীদের সারা জীবনকে

প্রভাবান্বিত করেছিল। বাবিচ্‌কার মুখে গল্প শুনতে শুনতেই বোজেনার গল্প লেখার আগ্রহ জন্মায়। তিনি বহু রূপকথা সংগ্রহ এবং রচনা করেছেন। গ্রাম্য জীবন নিয়ে অপূর্ব রচনা তাঁর আছে। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা দিদিমার স্মৃতির পক্ষপুটে বসে তাঁরই স্নেহাচ্ছন্ন বিগত শৈশবের সহজ সরল সুখের দিনগুলির লিপি "বাবিচ্‌কা।"

আঁকাবাঁকা পথে পাহাড়ী ট্রেন ছুটে চলেছে। ট্রেন থেকে উপা নদীর তীর চোখে পড়ল। আমরা এসে নামলুম স্টেশানে। তারপর এগোলুম গ্রামের দিকে। জায়গাটা ভারি সুন্দর। উপা নদীর একদিকে খাড়া পাহাড় আর বন। অন্য দিকে মস্ত চওড়া সবুজ ঘাসে ভরা উপত্যকা। তার পাশে পাশে বাদাম গাছের সারি। উপত্যকার এ পাশেও প্রকাণ্ড একটা বন আছে। বনের উঁচু উঁচু গাছের চন্দ্রাতপের আড়ালে রোদ এসে পৌঁছয় না মাটির উপর। এরা বলে বন-মোরগের বন। বন-মোরগ চারিদিকে—তাদের তীক্ষ্ণ ডাক আর ডালপালার মধ্যে শোঁশোঁ করে উড়ে যাওয়ার চকিত শব্দ থেকে থেকে কানে আসে। বনের মধ্যে দিয়ে সুঁড়ি রাস্তা বেয়ে আমরা চললুম। বনের ভিতরে ঠিক মনে হয় রূপকথার দেশ। পথ হারিয়ে যে-কোন সময় যেন পিঠে-দিয়ে-গড়া ডাইনি বুড়ির কুটিরে পৌঁছে যাওয়া যায়। এই বন পেরিয়ে জমিদার বাড়ি, সেখানে নিয়েম্‌ৎসোভার বাবা কাজ করতেন। এখন মিউজিয়ামে পরিণত। কিছু দূরে বাবিচ্‌কা তাঁর নাতি-নাতনীদের হাত ধরে বেড়াতে বেরিয়েছেন—এই মূর্তি গড়ে বনের ধারে এক রাস্তার মোড়ের মাথায় এরা সাজিয়ে রেখে দিয়েছে। কাছেই বোজেনা নিয়েম্‌ৎসোভার বাড়ি দেখলুম আর বাড়ি থেকে একটু দূরে নদীর ধারে পুরানো দিনের নদীর জলশক্তিতে চলা যাঁতা-কল, যার কথা নিয়েম্‌ৎসোভার কত লেখার মধ্যেই আছে। আর দেখলুম, নিয়েম্‌ৎসোভা যেখানে পড়তে যেতেন সেই বহু দিনের

পুরোনো ঐতিহাসিক কালের আসবাব ভরা স্কুলটি। এ সবই আজ এদের জাতীয় সম্পত্তি। প্রতিটি জিনিস, যেটি যেখানকার, অতি যত্নে তাদের রক্ষা করা হয়েছে। সারা দেশ থেকে লোক আসে এই সব মিউজিয়াম দেখতে।

তারপর আমরা একটু হাত-পা ছড়াবার জন্যে ফিরে চললুম বাবিচ্কার উপত্যকায়। রোদের আলোয় প্রকাণ্ড একটি সবুজ গালিচা বিছিয়ে রয়েছে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে। কী তার কারুকার্য! কাছে গিয়ে দেখলুম প্রায় এক হাঁটুর সমান নরম ঘাসে ভরা মাঠ আর কী বিচিত্র ফুলই যে ফুটেছে সারা মাঠ ভরে, দেখে দেখে আর চোখের ক্ষুধা মেটে না। ঘাস মাড়াতে পা সরে না। অনেক খুঁজে সরু মত একটা পথ পেয়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে নদীর দিকে এগোলুম। ছোট্ট একটি নদী—বড় বড় পাথরের গোলার উপর দিয়ে কুলকুল করে বয়ে চলেছে। সাঁকোর উপর দিয়ে ওপারে গিয়ে বাদাম গাছের তলায় বসে অবাক হয়ে তাকালুম উপত্যকার দিকে। এইটুকু নদীর কী বিস্তৃত উপত্যকা! নিশ্চয় এ নদীতে যখন বান আসে তখন ঐ মাঠের শেষ পর্যন্ত এর জল গিয়ে পৌঁছয়, তা নইলে অত বড় উপত্যকা হবে কেন? মনে পড়ে গেল বাবিচ্কা বইটির একটি পরিচ্ছেদের কথা। উপা নদীতে সেবার বান এসেছিল। সবে বসন্ত কাল তখন এসেছে। বরফ গলে গিয়ে মাঠ হয়ে উঠেছে সবুজ, তার উপর এসেছে বসন্তের ফুলের জোয়ার। পাহাড়ের উপর খোলা রোদে গিরগিটিরা চিত হয়ে রোদ পোহাতে শুরু করেছে। সেই সময় একদিন সকাল বেলা গ্রামের বনরক্ষী এসে বাবিচ্কাকে বললেন তিনি শুনে এসেছেন পাহাড়ে নাকি দুর্জয় বৃষ্টি নেমেছে। বসন্তের বৃষ্টি ঐ রকমই আসে। প্রচণ্ড বৃষ্টির জল আর তার সঙ্গে মেশে বরফ-গলা জল। পাহাড়ী ঝরনা নালা সব ফুলে ফেঁপে ওঠে।

বাবিচ্কা উদ্বিগ্ন হয়ে বনরক্ষীর দিকে তাকান। জিজ্ঞেস করেন,

তাঁর মত কি? বৃষ্টি তো প্রতিবারই হয়, এবারকার অবস্থা কি আশঙ্কাজনক?

—খুবই খারাপ অবস্থা। বলে গম্ভীর মুখে বনরক্ষী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

তারপর দুপুর বেলা এসে বনরক্ষী বললেন, নদীর জল-তল উপর দিকে উঠতে আরম্ভ করেছে। বাইরে থেকেও যে সব খবর এসেছে তা-ও খুব আশাপ্রদ নয়। এখনই সাবধান হওয়া দরকার। তিনি বললেন—বাড়ি ছেড়ে সবাই চলে আসুন আমার কুটিরে। বনরক্ষীর কুটির ছিল পাহাড়ের উপরে। সেখানে বানের জল পৌঁছবে না। নিরাপদ আশ্রয়। কিন্তু বাবিচ্‌কা বললেন—না। নাতি-নাতনীদের নিয়ে তাদের মা চলে যাক বনরক্ষীর কুটিরে। তিনি নিজে কিন্তু বাড়ি আগলাবেন। মেয়ে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি শুনলেন না মেয়ের কথা। শুধু ঝি উরসুলাকে রাখলেন। বললেন—উরসুলা আমায় সাহায্য করবে নিচের ঘরের আসবাব পত্র দোতলার ঘরে তুলে ফেলতে। বলে সবাইকে পাঠিয়ে দিলেন বিপদের বাইরে। নিজে বুড়ো মানুষ রয়ে গেলেন এক উরসুলাকে নিয়ে যুঝতে বানের সঙ্গে।...

"যেমন সন্ধ্যে হয়ে এল জলও উঠতে লাগল উঁচু থেকে আরো উঁচুতে। নদীর গা থেকে যে নালী দিয়ে পেষাই কলে জল ঢুকত তাও ভর ভর হয়ে এল। বাঁধের ওপারে যতখানি মাঠ তা ইতিমধ্যেই জলের তলায়। বাড়িটা নীচু জমির উপর; সেখান থেকে নদীর উঁচু পাড়টা দেখা যায়। পাড়ের গায়ে যেখানেই ভর্বা গাছের শ্রেণীতে ফাঁক সেখান দিয়ে দিদিমার চোখে পড়ছিল জলের উত্তাল তরঙ্গ বয়ে চলেছে। তিনি চরখার টেকো সরিয়ে রাখলেন। হাত জোড় করে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে বসলেন। উরসুলা ঘরে এসে ঢুকল। ক্ষিপ্র হাতে জানলার ধারের বেঞ্চিটা ঝাঁট দিতে দিতে বললে—জলের যা গর্জন, শুনতে শুনতে ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। জন্তুরা যেন

টের পেয়েছে কিছু একটা হবে। স—ব লুকিয়ে পড়েছে, কোথাও একটি চড়াই পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

ঘোড়ার খুরের শব্দ পাওয়া গেল আর বাঁধের ধারের রাস্তা ধরে একজন ঘোড়সওয়ার টগবগিয়ে এসে হাজির হলেন। এক মিনিটের মত তিনি ঘোড়ার বেগ কমিয়ে বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—গ্রামবাসী সব! নিজেদের প্রাণ বাঁচাও! বান আসছে! বলেই তিনি জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে নদী-তীর ধরে পেষাই কারখানার দিকে চলে গেলেন এবং পেষাই কল থেকে শহরের দিকে।

দিদিমা মুখ শুকিয়ে বললেন—ভগবান আমাদের রক্ষা করুন। উজানের দিকে তাহলে নিশ্চয় খুব খারাপ—না হলে ওরা দূত পাঠায়? আবার তখনই তিনি সাহস দিতে থাকলেন উরসুলাকে। তারপর আর একবার গেলেন উঁকি মেরে দেখতে—যাতে নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে বাঁধ এখনও টিঁকে আছে—কূল ছাপিয়ে যায়নি।···

মধ্যরাত্রির ঠিক আগে বাড়ির চারিদিক জলে ছেয়ে গেল। যে দিকটায় পাহাড় সেদিকে পাহাড়ের গা দিয়ে লোকে হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে হেঁটে বেড়াতে লাগল। বনরক্ষী পাহাড়ের গায়ে-লাগা বহিঃশালায় ঢুকে দিদিমারা কেমন আছেন জানবার জন্যে দিদিমার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। তিনি জানতেন এমন রাতে দিদিমা নিশ্চয়ই ঘুমোন নি।···সব কিছু ঠিক আছে খবর নিয়ে বনরক্ষী ফিরে গেলেন দিদিমার মেয়ে আঁর নাতি-নাতনীদের নিশ্চিন্ত করবার জন্যে।

যখন সকাল হল তখনই ঠিক জানা গেল বন্যা কতদূর এসেছে। সমস্ত উপত্যকা এক প্রকাণ্ড হ্রদে পরিণত হয়েছে। একতলার বসবার ঘরে কাঠের পাটাতন পেতে তবে এক দিক থেকে আর এক দিকে যাওয়া যায়। য়াকুব অনেক কষ্টে জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে পাহাড়ের গায়ে মুরগীদের খাওয়াতে গেল। জলের এমনই তোড় যে য়াকুবকে ফেলে দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেল না এইটেই আশ্চর্য। দিনের বেলা বনরক্ষীর বাড়ি থেকে সবাই এল বাড়ির কি অবস্থা হয়েছে

দেখবার জন্যে। দূর থেকে দাঁড়িয়ে শিশুরা যখন দেখল তাদের বাসস্থান জলমগ্ন আর তাদের দিদিমা বসবার ঘরে পাটাতনে পা রেখে জলের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছেন তখন তারা এমনই কান্না শুরু করে দিল যে তাদের শান্ত করাই মুশকিল হয়ে দাঁড়াল।

কুদর্না এসে খবর দিলে, নদীর নিম্নভাগে যে সব গ্রাম সেখানকার অবস্থা নাকি আরো অনেক খারাপ। ঝিলচ্ গ্রামে দুখানা বাড়ি স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, তার মধ্যে একটা এক বুড়িসুদ্ধ ভেসে গেছে। ঘোড়সওয়ার এসে বুড়িকে সাবধান করে দিয়েছিলেন— বলেছিলেন বাড়ি ত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে, কিন্তু বুড়ি ইতস্তত করছিল, কোনো মতেই বাড়ি ছাড়তে পারেনি।......

পুরো দু'দিন ধরে এই ভীতি বজায় ছিল। তিন দিনের দিন জল কমতে আরম্ভ করল। বনরক্ষীর বাড়ি থেকে শিশুদের যখন নিজেদের বাড়িতে আনা হল তারা একেবারে অবাক হয়ে গেল। বাগানটা একেবারে ভেসে গেছে। ফলের বাগানে কাদার পাহাড়। জায়গায় জায়গায় বিরাট গর্ত।......"

কত কাল আগে কত যুগ আগে বান এসেছিল এই শান্ত নদীতে তারই দৃশ্য আমাদের মনের চোখে ভেসে ভেসে উঠতে লাগল।

॥ ৫ ॥

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে শুনলুম ভোলাবাবু টেলিফোন করে জানিয়েছেন যে, পাহাড়ে আমাদের কুটির তৈরী আছে। ক্রকনশের মত জায়গায় আজকালকার দিনে হঠাৎ দরকার হলে কোনো কুটিরেই জায়গা পাওয়া ভারি মুশকিল। আগেকার চেয়ে অনেক বেশী লোক আজকাল বেড়াতে আরম্ভ করেছে, তাতেই ছুটি কাটাবার জায়গা পড়েছে কম। তাই হঠাৎ যখন খবর পেলুম আমাদের ভাগ্যে কুটির জুটেছে, ঠিক করলুম, পরদিন সকালেই যাবো পর্বতারোহণে।

ট্রেনে করে ঘণ্টা দেড়েক, তারপর বাসে করে আধ ঘণ্টা। যেখানে এসে পৌঁছলুম সেটা পাহাড়ের অর্ধেক পথ। এইখান থেকে হেঁটে আমাদের এইবার যেতে হবে। ছোট্ট একখানি পাহাড়ী গ্রাম। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত একে বলা হত 'জার্মান' গ্রাম। জার্মানীর প্রান্তদেশে এমনি শত শত গ্রাম চেকোস্লোভেকিয়ায় ছিল। সমস্ত স্থানটাকে বলা হত 'সুডেটেন' ভূমি। এখানে সুডেটেন জার্মানরা বাস করে এসেছে আজ কয়েক শ' বছর। চেকোস্লোভেকিয়ার গণতন্ত্রের জন্মের পর থেকে এমনি বিশ লক্ষ সুডেটেন জার্মান চেকোস্লোভেকিয়ার প্রজা হয়েই নির্বিবাদে বাস করছিল। তারপর হঠাৎ এল হিটলারের আমল। চেকোস্লোভেকিয়ার সংখ্যালঘিষ্ঠ জার্মানরা ঠিক করল হিটলারের সাহায্য নিয়ে তারাই দেশটাকে গ্রাস করবে। চেক্‌দের বাঁধবে দাসত্বের শৃঙ্খলে। হিটলারও এই সুযোগ নিয়ে চেকোস্লোভেকিয়া দখল করে নিয়েছিল। তারপর এল সুদীর্ঘ বিশ্বযুদ্ধ। হিটলার নিঃশেষ হয়ে গেল। চেকোস্লোভেকিয়া আবার স্বাধীন হল। তখন প্রশ্ন উঠল সুডেটেন জার্মানদের কি হবে? তারা যে দেশদ্রোহীতা করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জার্মানীকে পিতৃভূমি বলে ঘোষণা করেছিল। চেকোস্লোভেকিয়াকে করতে চেয়েছিল জার্মানীর উপনিবেশ। কাজেই এদের নিয়ে কি করা যায়? ত্রিশ লক্ষ মানুষ তো বড় কম নয়। চেকোস্লোভেকিয়ার সমগ্র জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ। কেউ কেউ বললেন—থাকুক, আগে যেমন ছিল। স্বাধীন যখন আবার হয়েছি, বিষদাঁত ওদের যখন ভেঙেই গেছে, জার্মানী যখন পরাজিত তখন আর ভয় কি? কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তি সবাই মিলে বললেন—না, বিপদ এখন নেই বটে, কিন্তু পরে হবে না, তারই বা ঠিক কি? জার্মানীর উপর আস্থা হারিয়েছিল চেকোস্লোভেকিয়া। তারা বললে—বিপদ যদি ওদিক থেকে আসে তাহলে প্রাণপণ করে লড়ব সবাই, কিন্তু ঘরের শত্রু জিইয়ে রাখলে না লড়েই মরতে হবে। একবার শিক্ষা হয়ে গেছে। আর নয়। ঐ ত্রিশ

লক্ষ জার্মানকে দেশের বাইরে জার্মানীতে পাঠিয়ে দেওয়াই স্থির হল। মিত্রশক্তিও এ সংকল্পে সায় দিলেন। কাজ বড় সহজ নয়। অত মানুষের ব্যবস্থা করা তো চাট্টিখানি কথা নয়। তার উপর এরা দেশ থেকে চলে গেলে ঐসব শূন্যস্থানের কি হবে? ওখানে চাষ হত, বাস হত, কতরকমের শিল্প ছিল। বিখ্যাত কাঁচের শিল্প ঐ অঞ্চলে, কত কাপড়ের কল ওখানে আছে—মানুষ চলে গেলে তাদের চালাবে কে? সমস্যা গুরুতর হলেও চেক সরকার এগিয়ে গেলেন ঐ নীতির পথে। কয়েক মাসের মধ্যে সমস্ত সুডেটেন ভূমি খালি করে ট্রেনে ট্রাকে চড়িয়ে যত জার্মান ছিল সবাইকে পাঠিয়ে দিলেন জার্মান দেশে। অতবড় একটা ব্যাপার, বেশ সহজভাবে সম্পন্ন হয়ে গেল। হৈচৈ হট্টগোল কিছুই হল না।

সেই থেকে এইসব খালি অঞ্চলগুলির গ্রাম শহর ধীরে ধীরে চেক অধিবাসী দিয়ে ভর্তি করা চলেছে। কল-কারখানা চলতে আরম্ভ করেছে। ক্ষেত-খামারে চাষবাস শুরু হয়েছে, কল-কারখানার উৎপাদন বাড়াচ্ছে আধুনিক যন্ত্র এনে ফেলে, যাতে মজুর কম লাগে। ক্ষেতের উৎপাদন বাড়াচ্ছে ট্রাক্টর আর রাসায়নিক সার এনে ফেলে—যাতে চাষী কম লাগে। যাই হোক, গ্রাম শহরগুলিকে ভরে ফেলবার মত অত লোক এনে ফেলতে পারে নি বলেই কিছু কিছু বাড়ি এখনও খালি পড়ে।

আমরা যে গ্রামে এসে নামলুম তার কোনো কোনো বাড়িতে লোক এসেছে। তাদের জানলার কাঁচগুলি ঝকঝকে। জানলার ধারে ফুলের টবে রঙিন ফুল। পিছন দিকে রান্নাঘরের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। রান্নাঘরের পিছনে ছোট্ট সবজি-বাগান। সেখানে লোহার তারে ক্লিপ দিয়ে টাঙানো বাচ্চাদের জামা আর হাত-মোছা তোয়ালে। এ ছাড়া আর যে-সব বাড়ি সেগুলি খাঁখাঁ করছে। জন-মনিষ্যির চিহ্ন নেই। সেই যে তার আদি অধিবাসীরা ফেলে দিয়ে চলে গেছে তার পর থেকে কেউ আর সে বাড়িতে ঢোকেনি। ঘরের

ভিতরগুলি আসবাব-শূন্য। ধুলোয় ভরা মেঝে। জানলার কাঁচ ময়লা। দরজায় রঙ পড়েনি কতদিন—এখানে ওখানে চটা ওঠা।

এমনি একটি বাড়ির সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় ভোলাবাবু তাঁর মোটার-বাইকে করে ভট্‌ভট্‌ করতে করতে লামিকে নিয়ে এসে হাজির হলেন। এবারে লামি নামল মোটার-বাইক থেকে আর মিতু উঠল। ঠিক হল, আমরা হাঁটব পাহাড়ী পাকদণ্ডি দিয়ে আর ওরা মোটার-বাইকে করে পাহাড়টাকে বেষ্টন করে ওধারে গিয়ে মিলবে আমাদের সঙ্গে।

রুকস্যাক পিঠে তুলে হাঁটতে শুরু করে দিলুম। খোলা পাহাড়ের খাড়াই রাস্তা, খাবার জিনিস আর কাপড়ে-ভরা পিঠের বোঝা। বহুদিন হাঁটা অভ্যেস নেই, দেশে বেতের চেয়ারে পাখার তলায় বসে কাটাচ্ছিলুম এতদিন। হঠাৎ হাঁটার তাগিদ এসে পড়ায় পা যেন আর চলতেই চায় না। পিঠ নুয়ে পড়ে। কোমরে ব্যথা ধরে যায়। দেশে থাকতে রোদ থেকে মাথা বাঁচানো এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে, মাথায় রোদ পড়তেই মনে হতে থাকে, এই বুঝি মাথার চাঁদি ফেটে গেল। অথচ বাইরে থেকে রোদের রঙ যেমনই হোক এখানকার রোদ তো মিঠে। রাস্তার স্থানে স্থানে আঁকা নীল রঙের চিহ্ন ধরে চলেছি। খানিক চলতেই পর্বত-শোভা সব-কিছু কষ্ট সবকিছু অস্বাচ্ছন্দ্য ভুলিয়ে দিল। মশগুল হয়ে উঠতে থাকলুম উচ্চ • থেকে উচ্চতর স্থানে। তারপর হঠাৎ এক মোড়ের মাথায় এসে নীল চিহ্ন শেষ হয়ে গেল। দু'দিকে দুটো রাস্তা গিয়েছে, তার কোনোটাতেই নীল বা হলদে কোনো চিহ্নই নেই। আমরা জল্পনা করছি, কোন্‌ দিকে যাওয়া যায় এমন সময় লামি চেঁচিয়ে ডাকল—এই দেখ, মাটির উপর আঁচড় দিয়ে কি লেখা! আমরা ছুটে এসে দেখলুম, মাটির উপর গভীর আঁচড় দিয়ে কে লিখে রেখেছে—'গাঙ্গুলি' এবং তার পাশে স্পষ্ট চিহ্নিত করা একখানি তীর। আমরা অবাক হয়ে তীরের ফলা ধরে কিছুদূর এগোতেই একটা

বাঁক ঘুরে একখানা দোতলা কাঠের কুটিরের সামনে এসে হাজির হলুম। তার দরজার চৌকাঠের উপর মিতু বসে। মিতু বেশ কিছুক্ষণ আগে এসে পৌঁচেছে ভোলাবাবুর সঙ্গে। আমাদের জন্যে তীর চিহ্ন এঁকে বসে আছে অপেক্ষায়। এইটেই আমাদের কুটির। এইখানেই আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। ভারি নির্জন জায়গাটি। চারিদিকে বন। কুটিরের পাশেই ঝিরঝিরে ঝরনা। মিতু বললে—ভোলাবাবু বলে গেছেন, এখান থেকে আধঘণ্টার পথ, পাহাড়ের উপর একটি আবাস আছে, সেইখানে তৈরি-খাবার মিলবে।

আমাদের খিদে পেয়ে গিয়েছিল। কুটিরে রুকস্যাক রেখে ঝরনার জলে হাতমুখ ধুয়ে আমরা বনের পথ ধরে উঠলুম গিয়ে সেই আবাসে। ছবির মত জায়গাটি। ছ'পাশে ঢেউ-খেলানো সবুজ মখমলের মতো ঢালু জমি—দেখলেই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। পায়ের নীচে গভীর বন। বনের ওপারে আবার পাহাড়। পাহাড়ের ওপারে বহুদূরে সমতল ভূমি। মাথার উপরে পাইন বনের শ্রেণী চলে গেছে—চেকোস্লোভেকিয়ার সীমান্ত। আবাসটি শুনলুম পররাষ্ট্র দপ্তরের চাকুরেদের ট্রেড ইউনিয়ন দ্বারা স্থাপিত। সেখানে পররাষ্ট্র দপ্তরে যাঁরা কাজ করেন তাঁরাই ছুটি কাটাতে আসবার সুযোগ পান। হোটেল খরচ বেশ সস্তা। এই পাহাড়ে এবং এই ধরনের আকর্ষণীয় স্থানে এইরকম সুন্দর সুন্দর বহু আবাস ছড়ানো আছে। সেগুলি সবই কোনো না কোনো দপ্তর বা কারখানার ট্রেড ইউনিয়নের সম্পত্তি। সত্যি কথা বলতে কি, আজকালকার দিনে ট্রেড ইউনিয়নের আবাসগুলি চেকোস্লোভেকিয়ায় সবচেয়ে সস্তা এবং লোভনীয় হোটেল। এদের খাবার ঘরে অনেক সময় বাইরের লোকেরাও খেতে পায়। তবে রাত কাটাবার অধিকার শুধু সভ্যদের।

আমরা খাবার ঘরে বসে চারজনের খাবারের অর্ডার দিতেই গৃহিণী রান্নাঘরের দরজা ফাঁক করে রান্নাঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন।

আমরা মনে করলুম, হয়তো নতুন ধরনের কোনো খাবারের সন্ধানে গেছেন। কিন্তু বেরিয়ে যখন এলেন, বললেন—সব ব্যবস্থা হয়ে গেল।

আমরা বললুম—কী ব্যবস্থা?

—এখানে থাকার ব্যবস্থা। আমরা এই হোটেলেই থাকব।

—সে কি? এটা না 'এর-ও-হা'র (ট্রেড ইউনিয়ন) হোটেল?

—তাতে কি? ওরাই তো জানতে চাইলে আমরা কোথা থেকে আসছি। আমি রান্নাঘরে ঢুকেছিলুম ওদের রান্না কেমন করে হয় দেখতে। ফল হল অন্যরকম। ওরাই বললে—ভারতবর্ষ থেকে এ-হেন অতিথিরা এসেছি, কোথায় বনের মধ্যে একা থাকব? এখানে চলে আসতে। সুবিধে অনেক বেশী। সস্তাও হবে।

আমরা বললুম—তা ছাড়া জায়গাটা অতুলনীয়।

গৃহিণী বললেন—অনির্বচনীয়।

খেয়ে-দেয়ে আমরা তাই ছুটলুম নীচের কুটির থেকে আমাদের রুকস্যাকগুলো নিয়ে আসতে।

আমাদের ঘরটা বোধ করি আবাসের সেরা ঘর। দোতলার উপর, আলো ভরা। চারিদিকে কাঁচের জানলা। জানলা খুলে দিতেই নীচেকার বিস্তৃত পাইন বন আর তার ওপারের সমতল জমি চোখে পড়ল। রঙিন সন্ধ্যা। মাথার উপরে বনের ওধারে পোল্যাণ্ডের সীমান্ত-রেখা। একটু হাঁটলেই বিদেশে পৌঁছে যাওয়া যায়। আগে ওখানটা জার্মানী ছিল। গত যুদ্ধের পর যখন জমি-জমা ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় তখন চেকোস্লোভেকিয়ার উত্তরের এই অংশটা পোল্যাণ্ডে জুড়ে দেওয়া হয়। জার্মানী যাতে ভবিষ্যতে আবার পূব-দিকে এগিয়ে এসে রাশিয়াকে আক্রমণ করতে না পারে, বোধ করি এই জন্যে উক্ত ব্যবস্থা। চেকোস্লোভেকিয়ারও উত্তর-সীমান্তটা এইভাবে রক্ষিত হয়েছে।

রয়ে গেলুম আমরা পাহাড়ী কুটিরে। ক'দিনের ছুটি কাটাবার

অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হয়ে গেল। পাইন বনের মাঝে মাঝে যেখানেই ফাঁক সেখানেই বেরীর ঝোপ। 'বরুফ্‌কি' আর 'মালেনি'র ঢেউ লেগে গেছে। 'বরুফকি' খেলে মুখ নীল হয়ে যায় কালোজাম খাওয়ার মতো—কিন্তু কী মিষ্টি রস! লাল টুকটুকে মালেনিগুলিও তেমনি রসে ভরা। তাদের গন্ধে প্রাণ মেতে ওঠে। আর পেলুম 'য়াহোডি'—এমন রসে ভরপুর যে মুখে দিলেই মিলিয়ে যায়। হাঁটতে হাঁটতে একবার পোল্যাণ্ডের সীমান্তের কাছে এসে পড়েছিলুম। বনের ধারে একখানি গ্রাম, সুন্দর একটি উপত্যকার উপর। ঢেউ-খেলানো মাঠের দৃশ্য ছবির মতো। গ্রামের মধ্যে দিয়ে পাকা রাস্তা সীমান্তের কাছে এসে একটা কাঠের বেড়ার কাছে শেষ হয়েছে। তার ওপারে পোল্যাণ্ড—সীমান্তের প্রহরীরা দাঁড়িয়ে। ঠিক এইখান থেকে পাকা রাস্তার সঙ্গে লম্বভাবে তুই দেশের প্রান্তরেখা চলে গিয়েছে ঘন বনের মধ্যে দিয়ে—মাঝে মাঝে কংক্রিটের পিল্‌পে দ্বারা তা চিহ্নিত। আমরা যেদিক থেকে এসেছিলুম সেদিক দিয়ে না ফিরে ঠিক করলুম সীমান্ত-রেখা ধরে আমাদের হোটেলের মাথা পর্যন্ত গিয়ে টুপ করে নীচের দিকে নেমে পড়ব—ভারি চমৎ-কার হবে সমস্ত ভ্রমণটা। এই পরিকল্পনার মধ্যে একটু খুঁত ছিল। সীমানা দিয়ে যে সুঁড়ি পথটা গেছে তাতে পেঁছিতে গেলে বেড়া পার হয়ে ওপারে যেতে হয়। মিতু বললে—মা, তোমার তো পোল্যাণ্ডের ভিসা নেই, তুমি ওখানে যাবে কি করে?

মিতুর মা চটে গেলেন। বললেন—সীমান্তের উপর দিয়ে যে রাস্তা গেছে তাতে তু' দেশেরই সমান অধিকার। কে ধরবে আমায়?

মিতু বললে—তা তো বুঝলুম। কিন্তু ওখানে পেঁছিবে কি করে? এখানেই তো প্রহরী।

—দেখবি? বলে মিতুর হাত ধরে গৃহিণী রাস্তা ছেড়ে গভীর বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন। আমরাও পিছু পিছু। তারপর বন-বাদাড়

ভেঙে প্রহরীর নজর এড়িয়ে কিছু দূরে একখানি সীমান্তের পিলপের কাছে গিয়ে পেঁৗছলেন।

—দেখলি মিতু? এইবার আসুক না আমাদের ধরতে। চেকোস্লোভেকিয়া দিয়ে আমরা হাঁটছি—ওদের কি? এই বলে হঠাৎ পিলপে পার হয়ে ওপারে গিয়ে ডাকলেন—মিতু, এদের বরুফ্‌কিগুলো অনেক বড় বড় রে, আর বেশ মিষ্টি। আয় এইগুলোই তুলি। কে কি বলবে?

প্রান্তরেখা ধরে পোল্যাণ্ডের বড় বড় বরুফ্‌কি কুড়োতে কুড়োতে সেদিন আমরা পরম তৃপ্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছিলুম।

একদিন একটি টিলা আবিষ্কার করলুম, ক্রুসিংকির ঝোপে একেবারে ভরা। এগুলি মূল্যবান ভারি দুষ্প্রাপ্য বেরি। অনেক খুঁজলে হয়তো দু-এক মুঠো পাওয়া যায়। এমন এক-পাহাড় ক্রুসিংকি সহজে মেলে না। যে-কোন কারণেই হোক, এখানকার যাত্রীরা এ পাহাড়টার সন্ধান পায় নি। কাজেই আমরা সকলে মিলে একদিন সারা দুপুর ধরে খুঁটে খুঁটে সের-দুই ক্রুসিংকি তুলে ফেললুম। ক্রুসিংকি কাঁচা খাওয়া যায় না। উপরে লাল নীচে একটুখানি সাদা এই গোল গোল ছোট্ট বেরিগুলিকে চিনির রসে ফুটিয়ে নিলে টকটকে লাল চাটনিতে পরিণত হয়। সারা বছরেও খারাপ হয় না। আমাদের প্রায় এক বছরের মতো ক্রুসিংকির চাটনির ব্যবস্থা তো হলই, বন্ধু-বান্ধবদের দেবার মতোও কিছু রইল।

প্ল্যাস্টিকের থলি-ভরা ক্রুসিংকি নিয়ে যখন আমাদের আবাসের একতলায় প্রবেশ করলুম, এক কোণ থেকে একটা শব্দ উঠল—য়ু উ উ উ উ উ! কোণে উপবিষ্ট এক ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রীর মুখ থেকে যুগপত উচ্চারিত ঐ বিস্ময়সূচক ধ্বনি।

—আসুন, আসুন, দেখান আপনাদের ফসল। আমরা তো এর সিকির সিকিও পাই নি।

আমরা গিয়ে বসলুম।

—আপনারা দেখছি আমাদেরই মতো বেরির ভক্ত। আপনাদের দেশে এইরকম বেরি হয়?

—শুনিনি কখনও। দেখিও নি। খুব সম্ভব হয় না।

এই বলে গল্প শুরু হয়ে গেল। স্বামী কাজ করেন পররাষ্ট্র দপ্তরে। স্ত্রী খেলনার কারখানায়। কাজের জাতিভেদ চেকো-স্লোভেকিয়া থেকে উঠে গেছে। দুজনেরই মোটামুটি সমান রোজগার। কলম ধরলেই যে সে উঁচু জাতের কর্মী আর বাটালি ধরলেই সে নীচু জাতের এ ধারণা কারুর মনের মধ্যে আর নেই। স্বামীর রোজগারেই সংসার চলে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী রোজগার করতে আরম্ভ করলে আরো অনেক কিছু করা যায়। টেলিভিশান সেট কেনা যায়, মোটরগাড়ি কেনা যায়, মফস্বলে ছুটি কাটাবার জন্যে কুটির তৈরী করা যায়। কাজ করবার ইচ্ছে প্রায় সব মেয়েরই আছে। সুযোগ পেলেই তারা কাজ করতে চায়, রোজগার করতে চায়। সে সুযোগের কোনো অভাব আজকের চেকোস্লোভেকিয়ায় নেই। বাচ্চারা খানিকটা বড় হয়ে গেলেই মায়েরা অনেকেই কাজে লেগে পড়েন। খুব সকালে বাপ-মা কাজে বেরিয়ে পড়েন, ছেলেমেয়েরা স্কুলে। আমাদের দেশে যেমন ছেলেপিলেকে স্কুলে পাঠাবার পরও ছেলেকে বাড়িতে পড়িয়ে দেবার অনেকখানি দায়িত্ব বাপ-মায়ের থেকে যায়, এখানে ঠিক তার উল্টো। লেখাপড়া শিখিয়ে ছেলেকে তৈরী করার সমস্ত দায়িত্ব স্কুলের মাস্টারমশায়দের। দুপুরের খাওয়ার পর সবার ছুটি। তখন বাড়িতে এসে বাপ-মা ছেলেমেয়ের সঙ্গে মিলিত হন। বরফ-ঝরা শীতের দিনে গরম ঘরে বসে গল্প করেন। রোদে-ভরা গ্রীষ্ম হলে বেড়াতে বের হন সবাই মিলে। এই দম্পতীর একটি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলেটি বড়, মেয়েটি ছোট। দু'জনে একই স্কুলে পড়ে। বাড়ির কাছেই স্কুল। হেঁটেই যাওয়া-আসা করে। স্কুল থেকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে গেছে হ্রদের ধারে এক ক্যাম্পে। সেখানে

খুব হৈচৈ করছে তারা। বাপ-মাও এই ফাঁকে ক'টা দিন ছুটি কাটাতে চলে এসেছেন পাহাড়ে!

॥ ৬ ॥

আমাদের ছুটি শেষ হল পয়লা সেপ্টেম্বারের ঠিক আগে। প্রতি বছর পয়লা সেপ্টেম্বার চেকোস্লোভেকিয়ার এক মস্ত দিন। ঐদিন সমস্ত রিপাবলিকের প্রত্যেকটি স্কুল লম্বা গ্রীষ্মের ছুটির পর খোলে। ছুটি শেষ। সারা রিপাবলিকে এই রব। খবরের কাগজে কাগজে বড় বড় হরফে ছাপা হয়—স্কুল খুলছে পয়লা সেপ্টেম্বার! দোকানে দোকানে নোটিশ—স্কুল খুলছে! দোকানের কাঁচের জানলার পিছনে দেখা যায় থরে থরে সাজানো নতুন খাতা-পেন্সিল। ছবিসহ খবর বের হয় কেমন করে ছেলেমেয়েরা বাপ-মায়েরা ছুটির ক্যাম্প ভেঙে বাড়ির দিকে ফিরছেন। ট্রামে ট্রেনে বড় বড় নোটিশ—স্কুল খুলছে! কেউ যেন ভুলে না যায়! হৈচৈ লেগে যায় সারা দেশ জুড়ে!

মিতুকে স্কুলে ভর্তি করে দেবার জন্যে আমাদেরও ফিরতে হল। স্টেশানে এসে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন সামনে পেয়ে গেলুম—যাচ্ছে প্রাহা। ঘন্টাতিনেক অপেক্ষা করলে একটা এক্সপ্রেস ট্রেন পাওয়া যেত, কিন্তু কে আর অতক্ষণ বসে থাকে স্টেশানে? উঠেই পড়লুম। আঁকা বাঁকা পাহাড়ে পথ ধরে প্রতি স্টেশানে থামতে থামতে এগিয়ে চলল ট্রেন। প্রায় সন্ধ্যে যখন হয়ে এসেছে, তখন প্রাহার কাছাকাছি এসে পৌঁছলুম আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতি স্টেশান থেকে দলে দলে লোক উঠতে লাগল। স্কুলের ছুটি ফুরিয়ে এল—প্রাহার বাইরে যারা গিয়েছিল, তাদের ফেরবার পালা। প্রাহায় যাঁরা স্থায়ীভাবে থাকেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই শহরের বাইরে ষাট সত্তর কিলোমিটারের মধ্যে মনোরম জায়গা বেছে ছোট ছোট কুটির তৈরি করেছেন। নিজেদের

এই সব ডেরায় তাঁরা ছুটি কাটিয়ে যান। চেকরা বলে 'খাটা'। ছুটি শেষ হল বলে খাটা বন্ধ করে সব শহরে ফিরছেন। দু-তিনটি স্টেশান পেরোতেই যত বসবার জায়গা ছিল, সব ভরে গেল। তারপর মাঝ-খানের ফাঁকটুকুতেও গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে রইল যাত্রীরা। সেই সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ সরু গলায় চিৎকার—আহোই মিতু!

মিতু কাউকে দেখতে না পেয়েও জবাব দিলে—আহোই!

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে লোকের হাতের পায়ের ফাঁক গলে একটি ছেলে এসে দাঁড়ালো মিতুর পাশে। সাশা!

—কোথায় চললে সাশা?

—প্রাহায়। স্কুল খুলছে। তুমিও তো তাই?

—হ্যাঁ, আমিও!

হাজার হাজার ছেলের মতো সাশাও ফিরছে তার মায়ের সঙ্গে গ্রীষ্মের ছুটি শেষ করে। গ্রীষ্মের প্রথম দিকে একদল ছেলের সঙ্গে মিতু দু-হপ্তা ক্যাম্পিং করেছিল, তখনই সাশার সঙ্গে আলাপ। একই তাঁবুতে দুজনে থাকত। চেকোস্লোভেকিয়ায় পৌঁছেই ক্যাম্পে চেক্ ছেলেদের সমুদ্রে পড়ে অজানা চেক্ ভাষার মধ্যে হাবুডুবু খাওয়ার গুণে দু হপ্তার মধ্যে বেশ খানিকটা চেক্ ভাষা শিখে নিয়েছিল মিতু। দেখলুম তারই জোরে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে সাশার সঙ্গে।

নেমে যাবার আগে সাশা বললে—সামনের বছর আবার ক্যাম্পে এসো মিতু।

মিতু বললে—যাবো, আহোই!

—আহোই!

তারপর তারা নেমে যেতেই মিতু বললে—যাচ্ছে! যা জ্বালিয়েছিল ছেলেটা!

আমরা বললুম—কি রকম?

—কি রকম মানে? ছেলেটা এমনিতে ভালো। কিন্তু মহা দোষ, ঘুমকাতুরে। রাতে যখন আমাদের দু'জনের একসঙ্গে পাহারা দেবার পালা পড়ত, নিজে লেপের মধ্যে সেঁধিয়ে বলত, তুই পাহারা দে। কেউ এলে আমায় জাগিয়ে দিস্। রাত দুটোয় আমি একা জেগে পাহারা দিয়েছি।

প্রাহায় পৌঁছলুম সন্ধ্যে উতরে যাবার পর। বিজ্ঞান আকাদেমি জানিয়েছিলেন, আমাদের স্থায়ী আবাসের বন্দোবস্ত করতে আরও দু-এক দিন দেরি হবে। তখনকার মতো ইণ্টারন্যাশানাল হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। কাজেই সেইখানেই গিয়ে উঠলুম। নানা দেশের নানা জাতের লোকেরা এখানে অতিথি হন। তার মধ্যে পেয়ে গেলুম দুজন বাঙালীকে। মোটার টায়ারের কারখানা হবে কাঁকিনাড়ায়, তারই যন্ত্রপাতি কিনতে এসেছেন। গল্পসল্প করতে রাত হয়ে গেল। শেষে শুতে গেলুম।

ঘণ্টাখানেক ঘুমোবার পর তারপর আর ঘুমোয় কার সাধ্য। দামামা বাজছে। ঘুমের মধ্যে মনে হল, কোথায় যেন ঢাক পেটাচ্ছে। ঘুমের ঘোরটা একটু কেটে যেতে বুঝলুম ঢাক নয়, হোটেলের খোলা ময়দানে আলো জ্বেলে দিন করে সায়েব-মেমের নাচ হচ্ছে। তারই ভ্যাঁ ভ্যাঁ প্যাঁ পোঁ ঢপ্ ঢপা ঢপ্ আওয়াজ। হোটেলে দু-শ পাঁচ-শ লোক সব সময় গমগম করে। নানা দেশ থেকে লোক আসে। আন্তর্জাতিক হোটেল। কত রকম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স এখানে হয়। ডেলিগেটরা এই হোটেলে থাকেন। তাঁদের ফূর্তি-ফার্তা করবার শখ জাগে। তাই নাচ-গানের ব্যবস্থা করতে হয় হোটেলকে। তা হোক, কিন্তু আমাদের সেদিন ঘুমের বড় দরকার। সারাদিন ঘোরার পর শরীর বেজায় ক্লান্ত। ভোরে উঠে মিতুকে নিয়ে যেতে হবে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে। এদিকে কিন্তু নাচ-গানের আওয়াজ একবার থামছে, আবার শুরু হচ্ছে। রাত বারোটা বাজল, একটা

বাজল, তারপর বোধ হয় দুটোই বাজল। বিছানা ছেড়ে আমি উঠে বসলুম। একটা কিছু না করলেই নয়। উঠে বসতেই বাজনা থেমে গেল। সব চুপচাপ। দশ মিনিট কোনো শব্দ নেই। ঘুমটি সবে আসতে আরম্ভ করেছে, সেই সময় আবার ফেটে পড়ল দামামার আওয়াজ। আর পারলুম না। গায়ে শালটা জড়িয়ে আস্তে আস্তে দরজা খুলে লিফ্‌টের কাছে গেলুম। লিফ্‌টে করে নীচে নেমে গিয়ে দেখি, আপিসের কাউন্টারে বসে একজন খাতা লিখছেন। এগিয়ে এসে বললুম—দেখুন মশায়, কয়েকজন মানুষের নাচবার শখ হয়েছে বলে হোটেলে আর কেউই কি ঘুমোবে না? একবার চোখ মেলে দেখুন তো হোটেলের ঘড়িতে কটা বেজেছে?

আপিসের বাবুটি চোখ মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বললেন—নাচ, হচ্ছে নাকি? কই জানি না তো?

—তা হলে শুনে আসুন না একবার বাগানে গিয়ে।

—ওরে কে কোথায় আছিস?

একজন দরোয়ান ছুটে এল। তাকে বললেন—যাও তো বাছা বাগানে। এবার গান থামাতে বল। লোকে ঘুমোবে।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনাদের ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছে বলে দুঃখিত।

বাস্, গান-বাজনা থেমে গেল দুটোর সময়। কিন্তু কতটুকুই বা আর রাত বাকি? চারটের সময়েই তো ভোর। যাই হোক, আমরা চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়লুম আর সাতটার আগে উঠলুম না।

ঘুম থেকে উঠে মিতুকে নিয়ে গেলুম স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে। যে-পাড়ায় আমাদের স্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা হচ্ছে, সেই পাড়ারই একটি স্কুল। এ দেশের প্রত্যেক শহরের পাড়ায় পাড়ায় স্কুল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটু হাঁটলেই স্কুলে পৌঁছন যায় আর প্রত্যেকটা স্কুলই ভালো। বাছবিচার করতে হয় না।

স্কুলের আপিস-ঘরে ঢুকে দেখলুম, বেজায় ভিড়। একজনের

পর একজন ফর্ম দিচ্ছে, নাম-ধাম-ক্লাস লেখা হচ্ছে, নানা রকম প্রশ্ন উত্তর চলছে। স্কুলের এক দিদিমণি টুলে বসে একজনের পর একজনকে ভর্তি করে নিচ্ছেন। ফর্ম নিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি : আমাদের পালা আসার অপেক্ষায়। সামনে ভিড, পিছনে একট খালি জায়গা, সেখানে মিতু দাঁড়িয়ে।

অনেকক্ষণ এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা মিতুর কোনোদিন ধাতে সয় না। কিছু একটা করা চাই, তা সে যাই হোক। মিতু হঠাৎ আমায় ডাকল—বাবা, এদিকে দেখে যাও ?

মিতুর মায়ের হাতে ফর্মটা দিয়ে আমি লোকেদের পাশ কাটিয়ে মিতুর কাছে গেলুম। গিয়ে দেখি, তার সামনে একটা নীচু গোল টেবিল, তাতে বসানো একখানা চকচকে গ্লোব। পৃথিবীর মানচিত্র। খুব মন দিয়ে মিতু দেশ দেখছে। ভাবলুম, হয়তো কোনো দেশের নাম জানতে চায় আমার কাছ থেকে। আমি ঘাড় নীচু করে এগিয়ে যেতেই মিতু গ্লোবটাকে এক পাক ঘুরিয়ে কেমন একটা সুর করে বললে—দুরন্ত ঘূর্ণি !

মনে হল সুরটা কোথায় শুনেছি। বললুম—বাঃ।

মিতু আর-এক পাক ঘুরিয়ে বললে—লেগেছে পাক !

কলকাতা থেকে আসবার আগে পূজো বাড়ি, বিয়ে বাড়ির বিকট সব 'মাইক' থেকে ঐ ধরনের কতকগুলো অদ্ভুত কথা, অদ্ভুত সুর ভেসে এসে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতো মনে পড়ে গেল। বুঝলুম, মিতু শিখেছে। আমি কি একটা বলতে যাচ্ছিলুম, দেখি টকটকে লালমুখ এক গিন্নী চশমার উপর দিয়ে মিতুর দিকে কটমট করে তাকাচ্ছেন। আমি আর কিছু বললুম না। মিতুর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সে আর একটু জোরে গ্লোবটা ঘুরিয়ে বললে—দুনিয়া ঘোরে বন্‌বন্‌।

গিন্নী চমকে উঠে তাঁর চশমাটা খুলে এবার মনোযোগ দিয়ে ঘুরন্ত গ্লোবটাকে দেখতে লাগলেন।

মিতু একজন নতুন সমঝদার পেয়ে সুর করে গেয়ে উঠল—ছন্দে ছন্দে কত রং বদলায়। কত রং বদলায়!

গিন্নীটি হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে টপ্‌ করে চশমাটা পরে পিছনে ফিরে ভালো মানুষের মত মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলেন—যেন কিছুই দেখেন নি, কিছুই শোনেন নি। আমি কোনো রকমে হাসি চেপে পাশ কাটিয়ে মিতুকে টেনে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলুম। দেখলুম, মিতুর মা-ও ফর্ম দিয়ে বেরিয়ে আসছেন। বুঝলুম মিতুর স্কুলে ভর্তি হওয়া হয়ে গেল।

দুনিয়া ঘুরতে লাগল বন্‌বন্‌। রং বদলে চললো।

জিজ্ঞেস করলুম—স্কুলের ফী দিতে হল কত?

—কিচ্ছু না। এ দেশে স্কুল-কলেজের পড়া সব ফ্রী হয়ে গেছে বলল।

—বুক-লিস্ট নিয়েছ?

—দিল না। বলল ক্লাসে এলেই সমস্ত বই দিয়ে দেওয়া হবে। খাতা কলম পর্যন্ত। কিচ্ছ পয়সা লাগবে না।

—বাঃ, বেশ মজা তো।

—শুধু দুপুরের খাবার পয়সাটা দিয়ে যেতে বলেছে। আজকে ভিড়ে কারুর সময় নেই। এ-হপ্তার মধ্যে যে-কোন দিন দিয়ে গেলেই চলবে।

মিতুকে ক্লাসে পাঠিয়ে দিলুম আর বললুম, ছুটির পর আমরা একজন এসে নিয়ে যাবো।

॥ ৭ ॥

তারপর আমাদের নতুন বাসায় থাকার বন্দোবস্ত করে ফেলা গেল। পাড়ার নাম বুবেনেচ্‌। রুশ রাজদূতের, চীনা রাজদূতের, আমেরিকান রাজদূতের, আলবেনিয়া, গিনি, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, কম্বোডিয়া, কোরিয়া, লেবানন, মালি, মেক্সিকো, মঙ্গোলিয়া, হল্যাণ্ড,

উরুগুয়ে, ব্রেজিল, ভিয়েৎনাম রাজদূতের দপ্তর এই পাড়াতেই। মাইলখানেকের মধ্যেই ভারতীয় এবং ব্রিটিশ রাজদূতের দপ্তর। রাস্তার নাম মায়াকভ্স্কেহো। রাস্তাটি 'স্পেইখার'-এর মোড় থেকে নীচু হয়ে নেমে এসে যেখানে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে দুদিকে চলে গেছে সেই দুই রাস্তার মধ্যস্থলে স্থাপিত একটি 'ভিলা'। দোতলা গোছানো বাড়ি। এক সময় ধনী এক ব্যবসায়ী শখ করে গড়েছিলেন এটি। পিছনে বাগান টাগান সবসুদ্ধ নিয়ে এদেশীয় একটি সাজানো বাগান বাড়ি। আপাতত বিজ্ঞান আকাদেমির অধিকারে। বিজ্ঞান আকাদেমির আমন্ত্রিত বিদেশী বিজ্ঞান কর্মীরা কেউ কেউ এখানে থাকবার অনুমতি পান। এইখানেই আমরা এসে উঠলুম।

উজ্জ্বল আলোকিত সব ঘর। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। বসবার শোবার ঘর ছাড়া সকলের জন্যে যেসব সাধারণ ঘর আছে সেখানে পড়ার এবং আড্ডা দেবার টেবিল, চেয়ার, সোফা, রেডিওগ্রাম। সভা এবং কনফারেন্স করবার ঘর আছে, সে ঘরে আছে টেলিভিশান। চেকোস্লোভেকিয়ায় এবার এসে দেখছি রেডিওর ছড়াছড়ি। এখানকার এই বিজ্ঞান কর্মীদের গৃহে প্রত্যেক ঘরে একটি করে রেডিও। কয়েকটি চীনা ছাত্রছাত্রী, পাকিস্তান থেকে একজন, আর একজন জার্মান, এই কজন কর্মী এখানকার বাসিন্দা। আর আমরা এলুম। আমাদের সবাইকার দেখা শোনা করবার জন্যে আছেন শ্রীমতী পিকোভা। অতি দক্ষ অতি দয়ালু অতি সমঝদারনী নারী। পিকোভা এসে আমাদের দোতলায় নিয়ে গেলেন। বসবার ঘরে রাস্তার দিকে পূব মুখো প্রকাণ্ড একখানা কাঁচের জানলা। একখানা বললে ভুল হবে। দু-খানা উপরি উপরি কাঁচের জানলা একই ফ্রেমে লাগানো। ডবল কাঁচ না থাকলে এ দেশের শীত নিবারণ হয় না। গ্রীষ্মকালে অবশ্য অনেক সময় এক পাটি জানলা খুলে রেখে দেওয়া হয়—একখানা দিয়েই কাজ চলে। জানলার সামনে লম্বা টবে ফুলের গাছ। গুচ্ছ গুচ্ছ লাল ফুল ফুটেছে তাতে। টেবিলের সামনে

চেয়ারে বসে রাস্তার দিকে তাকালে প্রথমে চোখে পড়বে ফোটা ফুলের গুচ্ছ—তার পিছনে রাস্তার দৃশ্য। রাত্রে রাস্তার আলো জ্বেলে দিলে টবের ফুলের ছায়া ঘরের দেয়ালে এসে পড়ে—ভারি চমৎকার দেখায়। মায়াকভ্স্কেহো রাস্তাটি দূরের বৃক্ষশ্রেণীর আড়াল থেকে সোজা বেরিয়ে এসে দু ভাগে ভাগ হয়ে বাড়ির দু পাশ দিয়ে পিছনে চলে গেছে। পাথরে বাঁধানো রাস্তা। শক্ত জুতো পরে যদি কেউ হেঁটে যায় তাহলে তার খট্‌খট্ শব্দ আমাদের ঘর থেকেই শোনা যায়। রাস্তার ধারে কাশ্‌টান গাছ। তার কাঁটাওয়ালা ফলগুলি পেকে ফেটে গেলে বড় বড় বীচি রাস্তার উপর ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক গিলের মত দেখতে। চকচকে। এদেশের ছেলেরা সেই বীচি-গুলোকে কুড়োতে খুব ভালবাসে। কি করে কে জানে? খাওয়া তো যায় না। মায়েরাও কুড়োয় দেখেছি।

এই হল আমাদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জায়গা। জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেই মিতুর ইস্কুল চোখে পড়ে। সকাল আটটা হল তো ছেলের দল পিঠে বই বেঁধে একে একে স্কুলের দরজা দিয়ে ঢুকছে দেখা যায়।

মিতুকে স্কুলে ভর্তি করে দেবার পর বাকি রইল লামিকে কলেজে ভর্তি করে দেওয়া। কলেজের লেকচার ইংরিজীতে হবে না, হবে চেক্ ভাষায়। দু-মাসে লামি এলোপাথাড়ি যেটুকু চেক্ শিখেছে তাতে করে ক্লাসের লেকচারের অর্থ বোধগম্য হবার কথা নয়। লামিকে বললুম—কি করবে?

লামি বললে—কি আবার? প্রথমটা বোকার মত বসে বসে শুনব, তারপর দেখা যাবে কি হয়। ইতিমধ্যে ভাষা শেখার একটা ক্লাসে ভর্তি হয়ে পড়ি। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বসে তো আর থাকতে পারি না?

লামিকে নিয়ে যাওয়া হল প্রাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগে। কলেজ সেদিন খুলছে। হোমরা চোমরারা সবাই এসেছেন।

প্রকাণ্ড হলে খুব ভিড়। বক্তৃতা হল লম্বা লম্বা। লামিও শুনল, আমরাও শুনলুম। কিছুই বুঝলুম না। তা হলেও লামি ভর্তি হয়ে গেল কলেজে। এবারেও বিনি পয়সায়।

বাড়ি ফিরে এসে লামি বললে—বাপ্‌স্ খুব বেঁচে গেছি।

—কি ব্যাপার লামি ?

—এদের কোর্স-এর মধ্যে মার্কসীজ্‌ম হচ্ছে অবশ্য পাঠ্য। বিজ্ঞানের প্রত্যেক ছাত্রকে মার্কসীয় দর্শন ও অর্থনীতি পড়ে পরীক্ষা দিতে হয়। আমি বললুম, আমি বিদেশী মানুষ, চেকই বুঝি না তো মার্কসীয় দর্শন। ভূতত্ত্বের পরীক্ষায় যদিও বা কোনো রকমে পাশ করতে পারি মার্কসীজ্‌মে গোল্লা পাবো। শুনে ওদের কি দয়া হল, মার্কসীজ্‌মের ক্লাস মাপ করে দিল।

নতুন সমাজ গড়ছে এরা। একেবারে নতুন করে। সমাজের দ্রুত অগ্রগতির জন্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দরকার এদেশে—তা আসছে মার্কসীয় শিক্ষার মধ্যে দিয়ে। তাই মার্কসের দর্শন মার্কসের মূলনীতি এদেশের ছাত্রদের সবাইকে জানতে হয়, পড়তে হয়।

॥ ৮ ॥

একদিন কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফিরে দেখি টেবিলের উপর এক টুকরো কাগজে টেলিফোনের বার্তা। আমাদের বিশেষ বন্ধু ডাঃ স্টেপানভ্‌স্কি জানিয়েছেন, আগামী কাল আমি যদি তাঁর সঙ্গে গাড়ি করে ব্রনো শহরে গিয়ে সেখানকার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীটি দেখতে আসি, তিনি সবিশেষ কৃতজ্ঞ হবেন। তিনি আরও একজন ভারতীয়কে নিয়ে যাচ্ছেন। সেইদিন রাত্রেই প্রাহায় ফেরা হবে। টেলিফোন করে ডাঃ স্টেপানভ্‌স্কিকে তখনই জানিয়ে দিলুম যে আমি যেতে পারব।

ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের এক বৃহৎ প্রদর্শনী প্রতি বছর ব্রনো শহরে

হয়। পৃথিবীর সব দেশ থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের আধুনিকতম যন্ত্রাদি এবং দ্রব্যাদি এখানে পাঠানো হয়। প্রদর্শনী সাজাবার কায়দার জন্য চেক্‌দের বিশ্বজোড়া খ্যাতি। তাদের প্রদর্শনীর বিন্যাস দেখবার জন্যেও সারা পৃথিবী থেকে লোক আসে।

ভোরবেলা আমাদের জানলার নীচে দরজার সামনে একটি প্রকাণ্ড কালো রংএর 'তাতরা' গাড়ি এসে দাঁড়াল। নীচে নেমে এসে ড্রাইভার সায়েবকে অভিবাদন করতে তিনি আমার কুশল শুধিয়েই বললেন উঠে পড়ুন, যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় ততই ভাল। অনেক পথ।

শহরের মাঝখানে 'য়ালটা' হোটেল। সেখান থেকে তুলে নিতে হবে শ্রীখান্নাকে। খান্না এসেছিলেন জেনিভায় আইনজীবীদের এক আন্তর্জাতিক অধিবেশনে। সেখানে চেক্ আইনজীবী ডেলিগেটদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় তাঁরা খান্নাকে নিমন্ত্রণ জানান প্রাহায় আসতে। তারই ফলে তাঁর এখানে আগমন। খান্না সায়েব গাড়িতে উঠেই বললেন—আইনজীবী মানুষ আমি, বৃহৎ যন্ত্রের প্রদর্শনী কি বুঝতে পারব? কি বলেন মিঃ গাঙ্গুলী?

আমি জবাব দিলুম—দেখুন, কাল রাত্রে আমার মনেও ঠিক ঐ প্রশ্নই জেগেছিল। পরিসংখ্যান চর্চা করি, বৃহৎ যন্ত্রের আমি বুঝব কি? ভেবে দেখলুম বেড়ানো হবে, নতুন কিছু দেখা হবে। সেই জন্যেই যাওয়া।

খান্না বললেন—ঠিক বলেছেন সেই জন্যেই যাওয়া। আচ্ছা মিঃ গাঙ্গুলী আপনাকে কখন ফিরতে হবে আজ? আমার আবার সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে না এলেই নয়। কালই আমি ফিরে যাচ্ছি জেনিভায়।

আমি বললুম—সাতটার মধ্যে ফিরতে পারলে আমার পক্ষেও তো ভাল।

তারপর চলল আমাদের গাড়ি ডাঃ স্টেপানভ্‌স্কিকে তুলে

নিতে তাঁর ভিনোহ্রাডির বাড়ি থেকে। তৈরি হয়েই দাঁড়িয়েছিলেন ডাঃ স্টেপানভ্স্কি তাঁর বাড়ির দরজায়। আমরা আসতেই গাড়িতে এসে উঠলেন। ডাঃ স্টেপানভ্স্কি ভারতে এসেছিলেন বছর খানেক আগে। মিশেছিলেন এদেশের অনেকের সঙ্গে। বক্তৃতা দিয়ে বেরিয়েছিলেন নানা জায়গায় আন্তর্জাতিক আদান প্রদান বিষয়ে। শান্তিনিকেতনে এঁকে নিয়ে সে সময় ঘুরেছিলুম আমি। ভারতবর্ষকে ভালবাসেন। ভারতীয়দের সঙ্গে মিশতে পারলে তাদের সঙ্গে গল্প করতে পারলে আর কিছু চান না। দুটি আমন্ত্রিত ভারতীয়কে ব্রনো প্রদর্শনী দেখাবার আয়োজন এঁর উৎসাহেই ঘটেছিল। চেক্-সরকারের তরফ থেকে ডাঃ স্টেপানভ্স্কিই আমাদের নিমন্ত্রণকারী এবং প্রদর্শক হয়ে চললেন।

পূব মুখো ছুটল আমাদের গাড়ি প্রাহা ছাড়িয়ে। পূর্ব বোহিমিয়ার মধ্যে দিয়ে আমাদের পথ। এই প্রদেশের উত্তর অংশ দিয়ে বহে গেছে "লাবে" নদী এবং লাবের উপত্যকা হচ্ছে চেকোস্লোভেকিয়ার অন্যতম উর্বর স্থান—এরা বলে "বোহিমিয়ার সোনার ফিতে।" সোনার শস্যে ভরে যায় এই উপত্যকা প্রতিবছর হেমন্তকালে। চমৎকার রাস্তা দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটেছে আমাদের গাড়ি। থেকে থেকে দেখছি গতির কাঁটা ১২৫ কিলোমিটার ছুঁয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে সোনার ফিতে শেষ হয়ে গেল। বোহিমিয়া অঞ্চল শেষ। মোরাভিয়ার আরম্ভ। দুই অঞ্চলের মাঝে এক-সারি পাহাড়। সেই পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট একটি শহর। অতটা পথ ছুটে এসে এইবার ড্রাইভার সায়েব সেই শহরে গাড়ি এনে থামালেন। হাত-পা ছড়াবার জন্যে নামলুম সকলে একবার। সামনেই এক কাফিখানা। তাতে ঢুকে কফি-বুখ্টা খেয়ে নিলুম সবাই। তারপর গাড়িতে উঠতেই আবার গাড়ি ছেড়ে দিল। পাহাড় আর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে আঁকা বাঁকা রাস্তা। বনের মধ্যে রোদের ঝিলিমিলি। খরগোস খেলা করে বেড়াচ্ছে গাছের ফাঁকে ফাঁকে। দু-একটা রাস্তার

উপরেও এসে পড়ে। গাড়ি কাছে এসে পড়লে দৌড় দেয় বনের আড়ালে। পথের ধারেই গ্রাম। গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠ, ক্ষেত, তারপর বন। বন ছাড়িয়ে ফাঁকা জায়গা, তারপর আবার গ্রাম। এমনি করে ছবির পর ছবি পার হয়ে বেলা এগারোটার সময় এসে পৌঁছলুম আমরা ব্রনোর উপকণ্ঠে। একটু এগিয়েই চোখে পড়ল প্রদর্শনীর মাঠ। শহরের প্রান্তে চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা গোল একটা জায়গা। সেইখানেই প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর বাইরে বিরাট একটা জায়গায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাস সারিবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে। প্রত্যেক সারিতে খান কুড়ি করে বাস, যার প্রত্যেকটার মধ্যে সত্তর আশিজন লোক ধরবে, এই রকম কত যে সারি গুণে শেষ করা যায় না। বাসের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা তারা যে শহর থেকে আসছে তার নাম—যাত্রীরা যাতে খুঁজে পায়। কত দূর দূর থেকে যে তারা এসেছে নাম দেখলে বোঝা যায়। দু-শ. তিন-শ চার-শ কিলোমিটার। এই বাসগুলি দেখলে মালুম হয় প্রদর্শনীর মারফত কত বড় শিক্ষার আয়োজন এরা করেছে। দেশের যে যত দূরেই থাকুক না কেন, কারখানার শ্রমিক, স্কুলের পড়ুয়া, আপিসের কেরানী, সরকারী দপ্তরের কর্মী সবাই এই বিরাট প্রদর্শনী দেখতে আসবার সুযোগ পায়। ক্রমান্বয়ে এরা আসছে, দর্শকের ভিড়ের কমতি নেই। এক দলের দেখা শেষ হয়ে গেলেই আবার আর এক দল। সারা দেশের লোককে জালে ধরে টান দিয়েছে এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী। সুশিক্ষিত গাইডরা অতিথিদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে নিয়ে প্রদর্শনী ঘুরিয়ে দেখান, যা পারেন বুঝিয়ে দেন। এই চলেছে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত।

একটা ফাঁকা গোছের গেট দেখে আমাদের গাড়ি দাঁড় করানো হল। চার নম্বরের গেট। ডাঃ স্টেপানভ্স্কি নেমে ভিতরে গিয়ে একটি গাইড নিয়ে ফিরলেন। ফুটফুটে দেখতে একটি মেয়ে। বয়েস কুড়ি একুশ। বুকে ‘চেডক’ ভ্রমণ কোম্পানীর পদক লাগানো।

মেয়েটিকে বললুম—আপনি কি চেডক কোম্পানীতে কাজ করেন ?

মেয়েটি বললে—না, এ কাজটা আমার শখের। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আমি। কলেজ যখন খোলা তখন লেখাপড়া করি। বন্ধ থাকলে যাত্রীদের নিয়ে ঘুরি।

—কোথায় ঘোরেন ?

—ও···নানা জায়গায়। এই সেদিন পাড়ি দিয়ে এলুম পোলাণ্ড এবং তামাম রাশিয়া। পোলিশ এবং রুশ ভাষা ভালই জানি। ইংরেজীটা শেখা আরম্ভ করেছি আজকাল। চেডককে তাই বলছিলুম ইংরেজী জানা অতিথিদের ভার আমায় দিতে। তারা এইখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।

—এখানে আপনি ইংরেজী জানা দর্শক পাচ্ছেন যথেষ্ট ?

—পাচ্ছি। আন্তর্জাতিক মেলা অধিবেশন কংগ্রেস—এই সবেই ইংরেজী বলা লোক পাওয়া যায়। তা নইলে আজকাল চেকো-স্লোভেকিয়ায় ইংরেজী বলা লোক খুব কমে গেছে।

প্রদর্শনীর মধ্যে ঢুকে পড়লুম আমরা। কি প্রকাণ্ড সব প্যাভিলিয়ান। এক জায়গায় খালি ইঞ্জিনের সমারোহ। যত রকমের ইঞ্জিন তৈরী হচ্ছে, বাষ্পে চলা, ডিজেলে চলা, বিজলিতে চলা, সব এনে জড় করেছে মস্ত একটা জায়গায়। আর এক জায়গায় চেকোস্লোভেকিয়ার নিজের, জার্মানীর, ইংলণ্ডের, ইটালীর, রাশিয়ার সব নতুন চকচকে মোটরগাড়ি। তার মধ্যে যেটা দেখতে সব চেয়ে ভিড় সেটা হচ্ছে তাঁবুওয়ালা গাড়ি। গাড়ির সঙ্গে তাঁবুর ব্যবস্থা আগেও দেখেছি। এটা কিন্তু আরও উন্নত। কি একটা ধরে টান দিলেই হড়হড় করে তাঁবুটা বার হয়ে গাড়ির ছাদে উঠে যায়। দোতলা তাঁবু। উপরে শোবার ঘর নীচে বসবার খাবার বারান্দা। গাড়ির ছাদে দোতলা তাঁবু দেখতে দারুণ ভিড়।

এই বিরাট প্রদর্শনীর মধ্যে প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যন্ত্র

তৈরি করবার যন্ত্র। আমাদের মত অজ্ঞ লোকের সে সব যন্ত্র দেখে কিছুই বোঝবার উপায় নেই। কিন্তু যেটা হৃদয়ঙ্গম করে অবাক হয়ে যেতে হয় সেটা হচ্ছে এই সব নতুন নতুন যন্ত্রোৎপাদী যন্ত্রের বিরাটত্ব। ছুঁচ বা সেফটিপিন তৈরি করতে নিশ্চয় কল লাগে। ছোট ছোট কল। সেই সব ছোট কল তৈরি করতে নিশ্চয় আরও বড় যন্ত্র লাগে। আবার সেই সব যন্ত্র যখন একসঙ্গে অনেক অনেক তৈরি করতে হয়, তখন তাদের বা তাদের অংশগুলি বানাবার জন্যে আরো বড় যন্ত্র লাগে। তারপর আরো বড়। আরো বড়। উৎপাদনের স্রোত যত বাড়ছে, যন্ত্র তৈরির যন্ত্র ততই আকৃতিতে বড় হয়ে চলেছে। তাড়াতাড়ি করে কোটি কোটি জিনিস তৈরি করতে গেলে এ ছাড়া উপায় নেই। হাত-যন্ত্র দিয়ে কেটে-কুটে চেঁছে-ছুলে ঘষে-মেজে জিনিস তৈরি করার দিন উঠে গেছে। সব কলে হওয়া চাই। কলের আকার বাড়তে বাড়তে কোথায় গিয়ে শেষ হবে কে জানে ?

প্রদর্শনীর কতটুকু দেখলুম জানি না। যদি এক-দশমাংশ দেখে থাকি তো খুব। দেড়টা বেজে গেল। খিদে পেয়ে গেল সবারই। অগত্যা আমরা চললুম খাবার ঘরে।

স্যুপের প্লেট টেনে নিয়ে স্টেপানভ্স্কি সায়েব বললেন—স্ট্যালেক্টাইটের গুহা দেখেছেন মিঃ খান্না ?

—সে আবার কি ? বলে মিঃ খান্না বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইলেন।

স্টেপানভ্স্কি বলে চললেন—স্ট্যালাকটাইট স্ট্যালেগমাইট গুহার জন্যে আমাদের দেশ বিখ্যাত। মিঃ গাঙ্গুলী, আপনি তো স্লোভাকিয়ার ডেমানোভা গুহা দেখেছেন। বলুন না।

আমি বললুম—ও জিনিস তো বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু এ বলতে পারি, এখানকার ভূ-মধ্যস্থ গুহা না দেখে ফিরে গেলে চেকো-স্লোভেকিয়া দেখাই হল না।

—এবং অতি সুন্দর অতি বিখ্যাত সেই রকমের একটি গুহা এই ব্রনোর কাছেই আছে। মাৎসোখা গুহা। বলে স্টেপানভ্স্কি উৎসুক নেত্রে খান্নার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম—চমৎকার! মাৎসোখা গুহার খ্যাতি তো আগেই শোনা। চলুন না খান্না সায়েব, দেখে যাওয়া যাক।

খান্না সায়েব বলে উঠলেন—কিন্তু তাহলে আমাদের সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে প্রাহায় ফেরার কি হবে?

সেটা একটা কথা বটে। আমার মাথায় আসেনি কিন্তু আইনজীবী খান্না সায়েবের মাথায় ঠিক এসেছিল। আইনজীবীদের সময়ের জ্ঞান টনটনে। সময় মানেই টাকা। যত মিনিট কথা কন ক্লায়েন্টের সঙ্গে, তত থোক টাকা আসে ঘরে। কিন্তু খান্না সায়েবের মুশকিল এই যে, তিনি শুধু আইনজীবী নন, তিনি আবার দিল্লীর লোক। দিল্লীকা লাড্ডু বলে একটা কথা আছে। ভূ-মধ্যস্থ গুহা ভদ্রলোক কখনও দেখেননি। দেখলেও পস্তাবেন। না দেখলেও পস্তাবেন। দিল্লীর লাড্ডুর মতই। খান্না একটা ঢোক গিলে বললেন—সবাই যখন গুহা দেখতে চাইছেন তখন একা আমার কথায় কি আসে-যায়? চলুন বরং চট্ করে গুহাটা সেরে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় প্রাহায় ফেরা যাবে। ফেরবার সময় কোথাও না থামলেই হল।

খাবার ঘরে এমন ভিড় যে ঝি চাকর হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। কালো রংয়ের পোশাক পরা, মাথায় ফিতে বাঁধা, বুকে লেবেল লাগানো কম-বয়সী ঝিরা ছুটোছুটি করছে খাবার প্লেট নিয়ে। লেবেল-এ লেখা যে, এরা সব হোটেল-বিদ্যের ছাত্রী। এ বিদ্যে শেখবারও স্কুল আছে। হোটেলে কেমন করে খাবারের অর্ডার নিয়ে খাবার পরিবেশন করে খদ্দেরের মনোরঞ্জন এবং তৃপ্তিসাধন করতে হয় তারই শিক্ষানবিশী চলেছে এদের। এত ঝি-চাকর আর শিক্ষানবিশিনী থাকা সত্ত্বেও ভিড় সামলে উঠতে পারছেন না এঁরা। তাই

আমাদের খেয়ে উঠতে বেশ দেরি হয়ে গেল। সাড়ে তিনটের সময় উঠে আমরা আর প্রদর্শনী না দেখে বেরিয়ে পড়লুম মাৎসোখার পথে।

॥ ৯ ॥

ব্রনো ছাড়িয়েই গুহার দিকে পাহাড়ে রাস্তা। প্রথমটা উঠে গেছে পাহাড়ের উপরে, তারপর ধীরে ধীরে নেমে এসেছে একটা গিরিবর্ত্মের মধ্যে। এই বর্ত্মের মধ্যে দিয়ে যত এগোতে লাগলুম দু-পাশে পাহাড়ের গা ততই খাড়া হয়ে আসতে লাগল। বনও হতে থাকল গভীর থেকে গভীরতর। অবশেষে সেই অন্ধকার গিরিবর্ত্মে ঘন বনের মধ্যিখানে যেখানে এসে আমাদের গাড়ি থামল তার সামনেই দেখলুম চিহ্নিত করা গুহার প্রবেশ দ্বার।

মাৎসোখা গুহা। এই ধরনের গুহা এ দেশে অনেক। চুন আর জল এই দুইয়ে মিশে করে বসে আশ্চর্য সব কাণ্ড। চুনা পাথরের পাহাড় দেশের নানা স্থানে। মাৎসোখা অঞ্চলের প্রায় এক-শ বর্গ কিলোমিটার চুনা পাথরে গঠিত। আর চুনা পাথরের প্রধান শত্রু জল। বৃষ্টির জল মাটিতে নেমে নদী নালা ফাটল দিয়ে চুনা পাথরকে যেখানে পায় আক্রমণ করে। ধীরে ধীরে গলতে থাকে চুনা পাথর মাটির উপরে, মাটির নীচে সব জায়গায়। অতি ধীরে চলে এই ক্ষয়ক্রিয়া—লক্ষ লক্ষ বছরই লেগে যায়। এর ফলে মাটির বহু নীচেই হয়তো বড় বড় গুহা অলি গলি সব মিলিয়ে এক পাতাল পুরী তৈরি হয়ে যায়। ক্ষয়ে ক্ষয়ে হয়তো কোনো জায়গাকার গুহার আচ্ছাদন এত পাতলা হয়ে আসে যে ফাঁপা ডিমের খোসার মত ধসে পড়ে যায় একদিন। সেই সময় বনের মধ্যে দিয়ে পথ চলতে চলতে কোনো পথিক হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলে মাটির মধ্যে প্রকাণ্ড এক হাঁ। আর সেই হাঁয়ের মধ্যে রহস্য-জনক অন্ধকার এক

জগত। দুঃসাহসী যাত্রীরা দড়ি বেয়ে নেমে পড়ে সেই বিপদজনক গুহা পথে। হাতে লণ্ঠন। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় হাতড়ে হাতড়ে এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে আবিষ্কার করে চলে অদ্ভুত সব অলি গলি, তাতে ঝুলছে বিচিত্র কারুকার্যে ভরা, দেখতে জলের ফোঁটার মত নরম অথচ প্রস্তরীভূত সব আকৃতি যার নাম স্ট্যালাকটাইট আর স্ট্যালেগমাইট। লণ্ঠন উঁচু করে দেয়ালের গায়ে আলো ফেলতে ফেলতে যত দেখে ততই অবাক হয়ে যায়। ভুলেই যায় যে যে-কোনো সময় মাথার উপর থেকে পাথরের বোঝা খসে পড়তে পারে অথবা সামান্য পদস্খলন হলেই অজানা গহ্বরে তলিয়ে যেতে পারে। গুহার মধ্যে ফাঁকা সুড়ঙ্গের দেয়াল আর ছাদ দিয়ে সব সময় চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে জল। ওই জলের ফোঁটার সঙ্গে আছে চুনের গুঁড়ো। বেশীর ভাগ জলই গড়িয়ে চলে যায়। তবু তিলার্ধ যে চুনের গুঁড়ো দেয়ালের গায়ে আর ছাদে লেগে থাকে তাই তিল তিল করে জমা হয়ে হাজার হাজার বছর ধরে নানান কঠিন আকৃতি নেয়। উপর থেকে ঝুলতে ঝুলতে যেগুলি বাড়ছে তাদের নাম স্ট্যালাকটাইট। মাটির উপর ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার ফলে ধীরে ধীরে যেগুলি উঁচু হয়ে উঠছে তাদের নাম স্ট্যালেগমাইট। দুঃসাহসীরা দুর্গম পথে যে গুহা আবিষ্কার করেন, পরিশেষে ভূতত্ত্ববিভাগের কর্তারা পাহাড় ফাটিয়ে অন্যান্য পথ বার করে দিয়ে, গুহার মধ্যে বিজলীর লাইন, লোহার সিঁড়ি পেতে গুহা-প্রবেশের সেই সব পথ সাধারণ দর্শকের জন্যে সুগম করে দেন।

মাৎসোখা মানে সৎমা—বিমাতা। বহুকাল আগে এ পাহাড়ের কি নাম ছিল জানা নেই। কিংবদন্তী আছে, পাহাড়ের চূড়োয় যে বিরাট গভীর এক গর্ত আছে তা স্থানীয় লোকেরা কেউ জানত না। গভীর জঙ্গলে ঢাকা জায়গাটা এত অন্ধকার যে বাইরে থেকে কিছুই দেখা যেত না। জানতো শুধু এক সৎমা। সে তার সৎ ছেলেকে নিয়ে ঐ পাহাড়ের চূড়োয় ওঠে। উঠে সে গহ্বরের সামনে এসে

ছেলেকে গহ্বরের মধ্যে ঠেলে ফেলে দেয়। গাঁয়ে ফিরে বলে ছেলেকে ভালুকে ধরে নিয়ে গেছে। গ্রামের লোকেরা ছেলেটাকে ভালবাসত, তারা লাঠি সড়কি নিয়ে খুঁজতে বেরল বনে। ছেলেটা কিন্তু মরেনি। পড়তে পড়তে একটা গাছের ডালে আটকে ঝুলছিল। তার কান্না শুনতে পেল গ্রামের লোকেরা। মাটির নীচে থেকে শব্দ এলে নাকি বোঝা যায় না কোন দিক থেকে আসছে। দিক-ভুল হয়ে যায়। জঙ্গলের মধ্যে অনেক খুঁজল সকলে। শেষে ঐ গহ্বরের মুখের দেখা পেল। তার গা এত খাড়াই যে মানুষ নামতে পারে না। নীচেটা এত গভীর যে কিছুই দেখা যায় না। আধ-পথে শুধু দেখা গেল ছেলেটা গাছে লট্-পট্ করছে। তখন দড়ি-টড়ি ঝুলিয়ে ছেলেকে উদ্ধার করা হল। কিন্তু ক্রুদ্ধ গ্রামবাসী সেই সৎমাকে ধরে এনে গুহার মধ্যে ঠেলে ফেলে দিলে। সেই থেকে সেই গহ্বরের নাম হল মাৎসোখা—সৎমা।

মাৎসোখা গুহা ১৩৮ মিটার গভীর। গুহার মধ্যে এক জায়গায় পাথরের নীচে থেকে জন্ম নিয়েছে একটি ছোট নদী, তার নাম পুংখ্বা। আর আছে গুহার তলদেশে দুটি হ্রদ। পুংখ্বা নদী এই দুই হ্রদের মধ্যে দিয়ে বয়ে অবশেষে পাহাড়ের বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

আমরা গিয়ে যখন গুহাদ্বারে পৌঁচেছি ঠিক সেই সময় একদল যাত্রী নিয়ে একজন গাইড গুহার মধ্যে ঢুকছেন। টিকিট কটা কিনে দলের পিছনে আমরা জুটে পড়তেই গুহার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গুহার ভিতরে জ্বলে উঠল শত শত বিজলীর আলো। শ-খানেক লোক আমরা সুঁড়ি পথের মধ্যে ঠেসাঠেসি করে দাঁড়িয়ে; দলের সম্মুখ ভাগে গাইড। যেমন আর সব গাইড বক্তৃতা দেন তেমনি বক্তৃতা শুরু করলেন আমাদের গাইড। প্রথমেই শুনিয়ে দিলেন গুহার মধ্যে কত লক্ষ মণ স্ট্যালাকটাইট আছে, গুহা কবে আবিষ্কৃত হয়েছে আর তার দৈর্ঘ্য কত। এক ঘণ্টা লাগবে গুহার

মধ্যে দিয়ে হাঁটা পথে যেতে। তারপর আছে খানিকটা জলপথ। সেটুকু নৌকোয় আধ ঘণ্টা। খান্না সায়েবের মুখের দিকে আমরা তাকালুম। তাঁরই সবচেয়ে প্রাহায় ফেরবার তাড়া। খান্না সায়েব একটু হেসে বললেন—যাক, এসে যখন পড়েইছি কি আর করা যায়? ফিরতে সেই আটটা হবে দেখছি—হোক গে!

তারপর প্রকাণ্ড এক গুহার মধ্যে আমরা হাজির হলুম—অপূর্ব তার শোভা। বিরাট এই হলের মধ্যে যেদিকে তাকাই সেদিকেই একটি বুদ্ধ মূর্তি—ছোট বড় নানা আকারের। আর তার চারিদিকে, ডাইনে, বাঁয়ে, মাথার উপরে সহস্র ধারাময় পতনশীল জল যেন হঠাৎ কিসের মন্ত্রে স্তব্ধ হয়ে অর্ধস্বচ্ছ পাথর হয়ে গেছে। আমাদের তাড়া ছিল বলে ভিড়কে এবং গাইডকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলুম গলির মধ্যে। কিছু দূরে গিয়েই চোখে পড়ল একটি ক্ষীণ আলো। সেই দিকে যেতেই একটা ফাঁকা জায়গায় এসে হাজির হলুম আমরা। ঘাড় বাঁকিয়ে উপরে তাকাতে দেখলুম আকাশ দেখা যায়। সন্ধ্যার আকাশ। তখনও বেশ সোনালী আলো আছে। কিন্তু সেই আলোই গহ্বরের নীচে এসে কেমন এক পাণ্ডাশ নীল বর্ণ ধারণ করেছে। দেখে গা হিম হয়ে আসে। চারিদিকে খাড়া পাথরের দেয়াল, তার মাঝে মাঝে ঝোপ। এই হচ্ছে মাৎসোখার গহ্বর। কোন ঝোপে ছেলেটা ঝুলছিল কে জানে? এখানে-ওখানে পাহাড়ের গায়ে বড় বড় ফাটল, তার মধ্যে হাতী পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে পারে। জায়গাটা একটা জীবন্ত কবরখানার মতো—বেশীক্ষণ থাকা যায় না। গুহা পথ এই মাৎসোখা গহ্বরের এক দেয়াল দিয়ে ঢুকে আর এক দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। গুহার নীচেটা মনে হয় এক সময় জলে ভরা থাকত। এখন শুকনো পাথরে ভরা।

গাইডকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছি। তার জন্যে অপেক্ষা করা বৃথা। এগিয়ে গিয়ে অপর দেয়ালের গুহা পথে আমরা প্রবেশ করলুম এবং একটু এগিয়ে যেতেই দেখলুম একটা দরজা। ঠেলতেই

খুলে গেল। দরজার ওপাশে বহু লোক দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। মিটমিটে আলো। সেই আলোয় দেখলুম এক সরু নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা। নৌকো এসে পৌঁছানোর জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই। এঁরা হচ্ছেন আমাদের আগের দল। আমাদের দলের বক্তৃতা সেরে এখানে এসে পৌঁছতে এখনও অনেক দেরি।

সরু একখানা নৌকো এল। আটখানা বসবার তক্তা। প্রত্যেক তক্তায় চারজন করে সবসুদ্ধ বত্রিশ জন। নৌকো ছেড়ে দিল। জলের উপরে খুব সামান্যই ফাঁক। উঠে দাঁড়াবার পর্যন্ত উপায় নেই—মাথা ঠেকে যাবে। জলের নীচে সারি সারি বিজলীর আলো, তাতেই এই জলগুহা পথ আলোকিত। জলপথ এত সংকীর্ণ যে শুধু একখানা নৌকোই চলে। কয়েক হাত অন্তর একটা করে বাঁক। প্রত্যেক বাঁকের মুখে নৌকো এসে পড়লেই মাঝি তার দাঁড় দিয়ে পাথরের দেয়ালে ঠেলা দিচ্ছে আর আমাদের সামাল দিচ্ছে এই বলে—মাথা নীচু করুন ভাইরা সব। জিওলজি দপ্তরের সম্পত্তি এই গুহার সব পাথর। দেখবেন যেন আপনাদের মাথায় লেগে ভেঙে না যায়! তাহলে আপনাদেরই খেসারত দিতে হবে।

একটা মোড় পেরিয়ে বেশ চওড়া একটা জায়গায় এসে হাজির হলুম। যে দুই হ্রদে এসে পুংখ্বা নদী পড়েছে এটি হচ্ছে তার প্রথমটি। মাঝি বলছে—শুনুন ভাইরা সব। এতক্ষণ নদীর যে অংশ দিয়ে আমরা আসছিলুম তার গভীরতা ছিল পঁচিশ মিটার। —অ্যাঁ, বলে কি? আমরা তো আঁতকে উঠেছি। দেখে মনে হয় দু-হাত জল। নৌকো উল্টোলে তো সলিল সমাধি। মাঝি বলে চলেছে—এবার যেখানে আসছি, খোলা জায়গার এই হ্রদটার গভীরতা চল্লিশ মিটার। এখানে যাত্রীদের এনে আমরা ডুবিয়ে দিই। অ্যাঁ, বলে কি?—হ্যাঁ ডুবিয়েই দিই। এখান থেকে ওঠবার কোনো উপায় নেই—চারিদিকে খাড়া পাথরের দেয়াল। তবে আজকের বরাদ্দ মাফিক এক-নৌকো যাত্রী আগেই ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাজেই

আপনাদের আর ডোবাবার দরকার হবে না। চলুন এগিয়ে যাই —সামলে বসুন ভাইরা সব। মাথা বাঁচিয়ে! বলে লগির এক ঠেলায় আমাদের সেই ভয়ানক জায়গাটা পার করে নিয়ে গেল মাঝি।

আবার কিছু দূরে গিয়ে বলছে—এ নদীর জল যে স্থির তা ভাববেন না। এরও স্রোত আছে। হাত ডুবোলে টের পাবেন না, কারণ এখন ক্ষীণ স্রোত। নৌকোর ধারে যারা বসেছিলুম, ঠাণ্ডা জলে একবার করে তবুও হাত ডুবিয়ে নিলুম।—কিন্তু এমনও অনেক সময় হয় যে হু হু করে জলের স্রোত বাড়তে থাকে আর সেই সঙ্গে নদীর জল উঠতে থাকে। মাথার উপর দেখুন ভাইরা সব কত নীচে গুহার ছাদ—হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। আমরা কেউ কেউ হাত তুললুম।—কাজেই হঠাৎ এখন যদি এই পাহাড়ে নদীর ইচ্ছে হয় ইনি ফুলে ফেঁপে উঠবেন তাহলে আপনাদেরই চোখের সামনে মাথার উপরের এই ফাঁকটুকু জলে ভরে যাবে। কোনো দিক দিয়ে পালাবার কোনো রাস্তা নেই। শুনে মেয়েদের সব মুখ শুকিয়ে গেল। তখন মাঝি ভরসা দিয়ে বললে—কিন্তু জিয়োলজি দপ্তর তার ব্যবস্থাও করে রেখেছে। জল বাড়লেই সঙ্গে সঙ্গে তার নিকাশ করবার রাস্তা আছে। এখন যতখানি জল দেখছেন, তার বেশী বাড়তে দেওয়া হয় না। তবে সাবধান মশায়েরা, সব সময় জলের উপরে থাকবেন। একবার জলের নীচে গেলে তখন আর জিয়োলজি দপ্তর কিছুই করতে পারবে না। ঐ দেখুন রাস্তা শেষ হয়ে এল। আশা করি আপনারা বত্রিশ জনই এখানে আছেন। আর সবাই বহাল তবিয়তে তো? এই রকম নানা রংএর আর রসের কথায় মাঝি কোথা দিয়ে যে আধ ঘণ্টা কাটিয়ে দিলে টের পেলুম না। নৌকো এসে গুহার বাইরে ঘাটে লাগল। আমরা বেরিয়ে এলুম।

ঘড়িতে পৌনে ছটা বাজল। ডাঃ স্টেপানভ্স্কি খান্না সায়েবকে মনে করিয়ে দিলেন—প্রাহায় পৌঁছতে বেশ দেরী হবে বুঝতেই তো

পারছেন। বলেন তো এখান থেকে টেলিফোন করে একটা খবর দিয়ে দিই।

খান্না সায়েব একটু ভাবলেন, তারপর বললেন—দরকার হবে না। চলুন যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ফেরা যাক।

মোটার ছুটে চললো পাহাড়ের আঁকা বাঁকা পথে। কিছু দূর গিয়েই হঠাৎ কোথা থেকে মেঘ এসে ছেয়ে ফেলল আকাশ। তারপর অঝোরে বৃষ্টি। এ দেশের বৃষ্টি সাধারণত টিপি টিপি, কিন্তু এ একেবারে আমাদের দেশের শ্রাবণের ধারা। মোটারের সামনের কাঁচটার উপর কে যেন জলের পাইপ খুলে দিয়েছে। জলে কাঁচ ঝাপসা, তার মধ্যে দিয়ে ভালো করে দৃষ্টি চলে না। অগত্যা গাড়ির গতি কমে গেল। যত জোরে যাচ্ছিলুম তার অর্ধেক গতিও রাখা সম্ভব হল না। এদিকে বৃষ্টির কোনো কমতি নেই। চলেছি তো চলেইছি—বৃষ্টির তেজ যেমন কে তেমনি। স্টেপানভ্স্কি খান্নাকে বললেন—ঐ দেখুন মাইল পোস্ট। হিসেব করে নিন এই স্পীডে প্রাহা পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে। সাড়ে দশটা তো বটেই। আপনার খুবই অসুবিধে হল দেখছি।

খান্না সায়েব বললেন—ও নিয়ে আর ভাববেন না। দেরী যখন হয়েই গেছে তখন আর খিদে-পেটে প্রাহায় পৌঁছে লাভ কি? আসুন বরং কোথাও গাড়ি থামিয়ে খেয়ে নেওয়া যাক। বৃষ্টিটাও হয়তো তার মধ্যে থেমে যেতে পারে

এ প্রস্তাব সকলেরই যুক্তিযুক্ত মনে হল। পথের ধারে একটা সরাইখানা দেখে আমরা গিয়ে ঢুকলুম।

খান্না বললেন—প্রাহায় ফেরার জন্যে কেন আমি এত তাড়া করছিলুম তাহলে আপনাদের বলি। জেনিভার কনফারেন্স থেকে একজন মিশরীয় এবং একজন ইরাকী ডেলিগেটও প্রাহায় এসেছেন। তাঁদের আমারই মতো নানা স্থানে ঘোরার প্রোগ্রাম। কথা ছিল সন্ধ্যা সাতটার সময় য়ালটা হোটেলে ফিরে এসে দেখা করব।

আন্তর্জাতিক আইন নিয়ে আমাদের আলোচনা করবার অনেক কিছু আছে, এখনও সময় পাইনি। তিনজনেই ফিরব বলেছি বটে কিন্তু সবাই জানি হয়তো কোথাও আটকে গিয়ে না-ও ফিরতে পারি। জেনিভাতে এইরকম অনেকবার হয়েছে। একবারও আমরা এক সঙ্গে মিলিত হতে পারিনি। সবাই সমান। কার দায়িত্বজ্ঞান যে বেশী, ভারত, মিশর না ইরাকের আর কার যে কম তা এখনও প্রমাণিত হয়নি। এই শেষ বার য়ালটা হোটেলে সেটা বোধ হয় হয়ে যাবে। তাই আমার তাড়া। ভারতের যে দায়িত্ববোধ কম নয় এটা দেখাতে চাই। তবে ভেবে দেখছি, কেউই বোধ হয় আসবেন না। নিন স্টেপানভ্স্কি, ভাল করে ডিনারের অর্ডার দিন, বেশ খিদে পেয়েছে।

স্টেপানভ্স্কি খাবারের তালিকাটা টেনে নিয়ে তার উপর চোখ বোলাতে বোলাতে বললেন—আমার তো আন্দাজ মিশর বা ইরাক কেউই আজ রণক্ষেত্রে ঠিক সময়ে অবতীর্ণ হবেন না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন খান্না।

খান্না বললেন—কেমন করে জানলেন ?

স্টেপানভ্স্কি তালিকা থেকে মুখ তুলে বললেন—কাল সন্ধ্যায় আলক্রন হোটেলে যাঁদের সঙ্গে আমার অল্প অল্প আলাপ হয়েছিল, মনে হচ্ছে এঁরা তাঁরাই। দু জনেই নৃত্যশাস্ত্রে সুপটু। আজকের সন্ধ্যায় উভয়েই উক্ত শাস্ত্র চর্চার একটা আয়োজন করছিলেন বলে কানে এসেছিল। প্রাহায় থাকলেই বুঝবেন খান্না সায়েব, আইন-শাস্ত্র আলোচনার চেয়ে অনেক হৃদয়গ্রাহী বস্তু অত্র আছে।

খান্না সায়েবের চোখ স্তিমিত হয়ে আসছিল, তিনি উজ্জ্বলিত হয়ে বললেন—ঠিক বলেছেন। আইনশাস্ত্রের চেয়ে অনেক ভালো ঐ গুহা, ঐ প্রদর্শনী আর এই বেড়ানো আপনদের সঙ্গে।

স্টেপানভ্স্কি বললেন—আপনার বন্ধুদের প্রতি অবিচার করবেন না। সুন্দরী পরিবৃত বিজলী অলোকে উজ্জ্বল নৃত্যশালাও। তাঁরাও নিশ্চয়ই আপনার চেয়ে কিছু কম পাচ্ছেন না।

খান্না বললেন—মানলুম।

টেবিলে স্যুপ দিয়ে গিয়েছিল। স্টেপানভ্স্কি বললেন—খান্না সায়েব, আপনার আজকের এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখার ব্যাপার নিয়ে আমার একটা ভারি মজার ঘটনা মনে পড়ল। আমাদের পরিবারের ব্যাপার। আমার বোন গত মাসে বিয়ে করেছে, তারই সম্পর্কে। আপনাদের নিশ্চয় ধারণা ঠিক সময়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না রাখা খুবই লজ্জার বিষয়—চারিত্রিক দুর্বলতাই প্রকাশ পায় ওতে। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে কথা দিয়ে তারপর দেরি করে আসা এক মস্ত গুণ হয়েও দাঁড়াতে পারে।

আমরা বললুম—কি রকম, কি রকম শুনি?

স্টেপানভ্স্কি এক চামচ স্যুপ মুখে দিয়ে দেখলেন বেজায় গরম। তিনি বলতে শুরু করলেন—আমার বোনের সঙ্গে যার বিয়ে হল তার নাম স্টেপান। বিবাহের পূর্বে স্টেপানের সঙ্গে আমার বোনের প্রায়ই অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকত, যেমন এ অবস্থায় আর সকলেরই থেকে থাকে—কফিখানায়, রেস্তরাঁয়, সিনেমায়, ট্রাম স্টপে, পার্কের গেটে, নানা জায়গায়। সিনেমার টিকিট করতে গেলে প্রকাণ্ড 'কিউ' লাগে প্রায়, অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হয়। স্টেপান পূর্ব-নিযুক্ত সময়ে হাজির হয়ে কিউতে দাঁড়িয়ে পড়ত, এভার দেখা নেই। বিশ মিনিট ধরে একটু একটু করে এগতে এগতে বেচারা যখন টিকিট-বেচা জানলার কাছে পৌঁছে ভাবতে আরম্ভ করেছে দুটো টিকিট কিনবে না একটা কিনবে, সেই সময় এভা হন্তদন্ত হয়ে হাজির হত। ট্রাম স্টপেও, পার্কের গেটেও এমনি। দাঁড়িয়েই আছে স্টেপান হয়তো আধ ঘণ্টা, তারপর ছুটতে ছুটতে এভার উদয়। স্টেপান বিরক্তি প্রকাশ করত আর বলত, যে-মেয়ে কথা দিয়ে সময় রাখতে পারে না তার সঙ্গে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা উচিত নয়। তারপর একদিন জুন মাসে যখন গাছ-পালা সবুজ হয়ে উঠেছে, নদীর জল আর আগের মত হিম নেই, তারা ঠিক করল ভ্লটাভা নদীতে নৌকো বাইতে যাবে।

তিনটের সময় দুজনের নদীর ধারে মিলিত হবার কথা রইল। স্টেপান কাঁটায় কাঁটায় তিনটের সময় নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে তার হাতঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে মুখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেল রাস্তা পার হয়ে এভা এগিয়ে আসছে। মুখ তার বিজয়গর্বে উল্লসিত। এই প্রথম সে স্টেপানের সঙ্গে ঠিক সময়ে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট রাখতে পেরেছে। কিন্তু স্টেপানের কাছে সে এগিয়ে আসতেই স্টেপানের মুখ মলিন হয়ে গেল। এভা কাছে এসে মুখ তুলে বললে কি হল স্টেপান? স্টেপান বললে—এভা, তোমায় বাহাদুরি দিচ্ছি তুমি সময় মতো আজ আসতে পেরেছ বলে, কিন্তু আমার কি রকম মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এভা ভয় পেয়ে বললে—কি রকম? স্টেপান বললে—দেখ দেরি করে আসাই তোমার স্বভাব। তোমার দুর্মূল্যতা ঐতেই। আজ কেমন যেন সুলভ হয়ে চলে এলে তুমি। আমার এটা ভাল লাগছে না। এভা স্টেপানের হাত ধরে টানতে টানতে তাকে নদীর পাড়ের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বললে—পাগলামি ছাড়ো স্টেপান। চল, নৌকো ভাড়া কর। আর দেখ, আর দেরি নয়, সামনের মাসেই আমাদের বিয়ে। স্টেপান অবাক হয়ে এভার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—অঁ্যা, সামনের মাসে? এই যে তুমি সেদিন বললে, ডিসেম্বারের আগে আমাদের বিয়ে হতে পারে না? এভা বললে—এই এক্ষুণি আমি মত বদলালুম। কারণ তোমার মতি গতি সুবিধের নয়। বাস্ জুলাই মাসের সতের তারিখে তাদের বিয়ে হয়ে গেল।

খান্না সায়েব বললেন—চমৎকার গল্প। আমার একটা ভুল ধারণা জন্মেছিল কমিউনিস্ট দেশের লোকগুলি সম্বন্ধে—তারা বুঝি সব কলের মতো হয়ে যায়। আপনার গল্প শুনে মনে হচ্ছে এ দেশের লোকগুলিকে তাহলে মানুষ বলে চেনা যাবে, কারণ তাদের মধ্যেও মনুষ্যোচিত দুর্বলতাগুলি সবই বজায় আছে।

স্টেপানভ্স্কি বললেন—আছে বই কি। মানুষ হয়ে থেকেও যে

কমিউনিস্ট হওয়া যায় তা এ দেশে কয়েকদিন থাকলেই দেখতে পেতেন।

খান্না বললেন—দেখুন, এই যে আপনি বললেন আপনার বোন এক কথায় বিয়ের দিন ছ-মাস এগিয়ে দিলেন এটা কিন্তু খুব লক্ষ করবার বিষয়।

স্টেপানভ্স্কি বললেন—কি হিসেবে ?

খান্না বললেন—বোঝা যায় আপনাদের দেশে বিয়ে করাটা কত সহজ হয়ে এসেছে। দুজন তরুণ তরুণী চট করে নিজেদের বিয়ে ঠিক করে ফেলছে, বড়দের হস্তক্ষেপ নেই। কতই বা বয়েস হবে এভার আর স্টেপানের ?

—কুড়ি আর চব্বিশ। এর চেয়েও অনেক কম বয়সে আজকাল বিয়ে হচ্ছে। বুঝছেন না, বিয়ে করা মানে যে একটা দারুণ অর্থ-নৈতিক ঝক্কি মাথায় নেওয়া তা তো আর নেই। ছেলেরা রোজগার করে, মেয়েরাও রোজগার করে! এমন আর কবে ছিল ? এভা আর স্টেপান যেদিন থেকে বিয়ে করল ওদের যুক্ত আয় প্রায় ডবলে গিয়ে দাঁড়ালো। নতুন সংসার শুরু করতে গেলে এক সঙ্গে অনেকগুলো নতুন আসবাব লাগে। তাব জন্যে আগে থেকে টাকা জমাবার কোনো দরকার নেই। নিয়োগ-কর্তাই থোক টাকা ধার দিয়ে দেন বিয়ের উপলক্ষে। কতদিনই বা লাগে তা শোধ করতে ?

খান্না বললেন—মেয়েরা বাইরে গিয়ে এত রোজগার করলে ঘরের কাজ করবে কে ? আপনাদের দেশে তো আবার দেখি বাড়ির চাকর ঝি বলে কোনো বালাই নেই।

—কোত্থেকে থাকবে ? আগে যারা দাসীবৃত্তি করতো তারাও তো মানুষ হয়ে গেছে ? তাদের রোজগারও আজকাল তাদের বাবুদেরই সমান। তবে ঘরের কাজ বলতে আগে যা বোঝাতো তা আর নেই। এক বেলার আহার তো কর্মস্থলেই হয়, রাত্রের খাবারটা

রেঁধে নিতে হয় নিজেদের, বাইরে না খাবার ইচ্ছে থাকলে। তা-ও তো 'পলোটোভারি'র ফলে রান্নার কাজ অর্ধেক কমে গেছে।

—পলোটোভারি ? সে আবার কি ?

—দেখেন নি ? রাস্তায় অনেক আছে পলোটোভারি দোকান। য়ালটা হোটেলের কাছেই তো একটা। অর্ধেক-রাঁধা খাবারের দোকান। মাংস তরকারি স্যুপ অর্ধপক্ক অবস্থায় কিনে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে স্থধু একটু আগুনের উপর চাড়িয়ে নিন। বাস্ হয়ে গেল।

খান্না বললেন—বুঝলুম এভার এখন সংসারের কোনো ঝক্কি নেই। কিন্তু বাচ্চা হলে ?

—হ্যাঁ ঐ এক সমস্যা বটে। দেশ চাইছে মেয়েরা সব কাজে যোগ দিয়ে দেশের পণ্য উৎপাদন বাড়াক। কিন্তু মেয়েদের প্রয়োজন ঘটছে গৃহে তাদের বাচ্চাদের মানুষ করার। এ সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয়নি। অনেকে কাজ ছেড়ে দেয়। যতদিন না ছেলে-মেয়েরা একটু বড় হচ্ছে, স্কুলে যেতে শুরু করছে, আত্মনির্ভরশীল হচ্ছে ততদিন মা হয়তো কাজ ছেড়ে বসে রইল। বাচ্চা হলে এদেশে বাপের মাইনে বাড়ে জানেন তো ? প্রতি বাচ্চার জন্যে বাড়ে। কাজেই মা চাকরি ছেড়ে দিলেই বাপ নেহাত জলে পড়েন না। অনেক মেয়ে আবার শাশুড়ীর কাছে বা মায়ের কাছে বাচ্চাকে রেখে কাজে বেরয়। এভা কি করবে জানি না। আমার নিজের কথা বলতে পারি, আমাদের বাচ্চাকে দিনের বেলায় আমার মা-ই দেখা শোনা করেন। আমার স্ত্রী কাজ সেরে ফেরেন বেলা ছটোয়। তখন আবার তিনি ভার নেন। যাই হোক আজকাল আমাদের দেশে বুড়ী দিদিমাদের কদর খুব বেড়েছে একথা বলতে পারি।

সরাই থেকে বেরিয়ে এসে দেখলুম বৃষ্টি থেমে গেছে। শুধু কনকনে শীতের হাওয়া। গাড়ির মধ্যে আমরা উঠতেই কাঁচের শার্সি-গুলো তুলে দিয়ে উত্তাপ-যন্ত্র খুলে দিয়ে ড্রাইভার সায়েব গাড়ি ছুটিয়ে দিলেন।

প্রাহায় এসে পৌঁছলুম রাত সাড়ে এগারটায়। ঘুমতে গেলুম বারোটায়। খান্না সায়েবের সঙ্গে আর দেখা হয়নি, তিনি পরদিনই জেনিভায় চলে গিয়েছিলেন। তাঁর দুই বিদেশী ডেলিগেটেরও কোনো খবর পাই-নি।

॥ ১০ ॥

দুপুরের দিকে গৃহিণীকে নিয়ে গিয়েছিলুম য়ালটা হোটেলে খবর নিতে খান্না সায়েব আছেন না গেছেন। গিয়ে শুনলুম তিনি আর নেই, চলে গেছেন জেনিভায়। য়ালটা হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে সে সময় নামছিলেন শাড়ি-পরিহিতা এক নারী। আমাদের দেখতে পেয়ে কেমনভাবে তাকালেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আলাপ করে ফেললুম। বাঙালিনী। তনিমা দেবী। ইয়োরোপের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন। প্যারিসে যখন ভারতের নারী সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন এদেশের বিজ্ঞান আকাদেমির একজন পাণ্ডা তাঁর সঙ্গে গিয়ে আলাপ করেন এবং তাঁকে চেকোস্লোভেকিয়ায় আসতে নিমন্ত্রণ জানান। তাঁকে একদিন ভারত-ললনা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হবে, এই উদ্দেশ্যে প্রাহায় আসা।

আমরা বললুম—প্রাহা কেমন লাগছে?

—আর বল কেন ভাই? এদের তো দারুণ উৎসাহ আমায় সব কিছু দেখাবে। গাড়িটাড়ি সব নিয়ে এসেছিল। আমার এদিকে শরীরের যা অবস্থা! বক্তৃতা দিয়ে আর ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এদের মত কি আর দৌড়-ঝাঁপ করতে পারব আমি? গাড়ি ফিরিয়ে দিয়েছি। কিছুই দেখিনি। এই হোটেলেই আছি। হোটেলটা বেশ লাগছে।

প্রথম আলাপেই 'তুমি' বলে সম্বোধন করায় আমাদের সম্পর্কটা

সহজ হয়ে গেল। ভরসা পেয়ে বললুম—শরীর খারাপ তো একবার ডাক্তার দেখালেই তো পারতেন।

তনিমা দেবী বললেন—ও বাবাঃ, এসব দেশে ডাক্তারের যা খরচ! লণ্ডনে এক হার্লে স্ট্রীটই তো আমায় ফতুর করে দিয়েছে। আমার হাত এখন একেবারে খালি। ডাক্তার দেখাবো একেবারে দেশে গিয়ে।

আমরা বললুম—কিন্তু এ দেশে তো শুনেছি ডাক্তারের ওষুধের কোনো খরচ লাগে না। একবার খোঁজ করে দেখব না কি?

তনিমা দেবী বললেন—তা দেখতে পারো, আমি শুধু একবার রক্তের চাপটা দেখিয়ে নিতুম। বেড়েছে বলে সন্দেহ হচ্ছে।

আমরা খোঁজ নিলুম। পলিক্লিনিকে গিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিলুম। যা জানলুম তা হচ্ছে এই। চেক্ দেশের অধিবাসী অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার সমস্ত খরচ বহন করেন রাষ্ট্র। ডাক্তারের ফী লাগে না, ওষুধের দাম লাগে না, ক্লিনিক এবং হাসপাতালের বা অস্ত্র চিকিৎসারও খরচ লাগে না। বিদেশী কেউ এসে যদি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে তাঁর চিকিৎসার সমস্ত দায় চেক রাষ্ট্রের। বিদেশী রোগী যদি স্বইচ্ছায় তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে চান তাহলে ডাক্তারের কোনো ফী তাঁর লাগবে না, কিন্তু ক্লিনিকাল পরীক্ষার খরচ এবং ওষুধের দাম দেওয়া না-দেওয়া রোগীর ইচ্ছাকৃত। রোগী যদি পারগ হন দেবেন, অপারগ হলে দেবেন না। মানুষের স্বাস্থ্যের দিকে এদের রাষ্ট্রের কড়া নজর। এই জন্যেই চিকিৎসা করাতে এখানে পয়সা লাগে না।

আমাদের দেশে আবার ঠিক উল্টো। রোগে ভুগে ভুগে মরবার আগে লোকে ডাক্তার ডাকে। তারপর মরে গেলে ভাগ্যের দোষ দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডাক্তারের দোষ দেয়। একবার যেমন হাতীবাগানে হয়েছিল। বুড়ো বাপ অনেকদিন ধরে ভুগছে: ছেলেরা কিন্তু ডাক্তার দেখাবে না। চার ছেলে, মেলা পয়সা,

কিন্তু ডাক্তার মানেই হল ঠগ। অসুখের অজুহাতে ঠকিয়ে পয়সা নিয়ে যাবে, এ চার ছেলের এক ছেলেরও বরদাস্ত করবার কথা নয়। আর তা ছাড়া বুড়ো মানুষ অসুখে তো ভুগবেই—বৃদ্ধ বয়সে শরীরং ব্যাধিমন্দিরং। তাই ডাক্তার দেখানো হয়নি। শেষে যখন বুড়োর শ্বাস উঠল, তখন বড় ছেলে দৌড়ে গিয়ে পাড়ার একজন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এল। ডাক্তার গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে বড় ছেলের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠে গেলেন যেখানে রোগী শুয়ে, আর মেজ, সেজ, ছোট ছেলে, বাড়ির দরজা আগলে বসে রইল—ডাক্তারকে বেরতে দেবে না, যতক্ষণ না বাপকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে। ডাক্তার হাঁপাতে হাঁপাতে তেতলায় উঠে দেখলেন রোগীর নাভিশ্বাস উঠেছে, মুখে গঙ্গাজল দেওয়া হচ্ছে। তাঁর আর কিছু করবার ছিল না। নাড়ি ধরে বসে রইলেন যতক্ষণ না রোগী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। বেশীক্ষণ বসতে হল না। ডাক্তার রোগীকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই ঘরের বাইরে যে-সব মহিলারা উঁকি দিচ্ছিলেন তাঁরা সবাই এক-সঙ্গে মড়াকান্না কেঁদে উঠলেন। আর সেই কান্না শুনে তিন ছেলে যারা দরজা আগলে বসে ছিল তারা লাঠি হাতে মার মার করতে করতে উঠে এল। তারপর বাপ পড়ে রইল, সে কী মার ডাক্তারকে। ফী আদায় করা দূরের কথা, কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে ডাক্তার। ডাক্তারের পরিত্রাহি চীৎকার মেয়েদের মড়াকান্নাকে ছাপিয়ে উঠল। সেই চীৎকারের চোটে পাড়া-পড়শীর ঘুম ভেঙে গেল। তাঁরা ছুটে এসে সেই গুণ্ডা-বাড়ির ছেলেদের হাত থেকে ডাক্তারকে বাঁচান, তাই রক্ষে। নইলে সেদিন হাতীবাগানের ঐ বাড়ি থেকে একটা মড়া নয়, দুটো মড়া বার হত। ঘটনাটা সত্য—হাতীবাগানের অনেকেই জানেন।

এই হল আমাদের দেশের ডাক্তার দেখানো। এ দেশে আবার ঠিক উল্টো। যে হেতু ডাক্তার দেখাতে, হাসপাতালে যেতে, ওষুধ কিনতে পয়সা লাগে না, মানুষ তাই দুবার হাঁচলেই পলিক্লিনিকে

ছোটে চিকিৎসা করাতে। বিনি-পয়সায় কাটিয়েই এল হয়তো দু-পাঁচ দিন হাসপাতালে।

ব্যবস্থা ভালই। আমরা গিয়ে বললুম তনিমা দেবীকে।

তিনি বললেন—তা হলে ভাই তোমরা আমার রক্তের চাপটা দেখাবার একটু বন্দোবস্ত করে দাও।

বন্দোবস্ত করেই আমরা এসেছিলুম। বললুম—যাবেন আজকের খাবার পর?

তনিমা দেবী বললেন—সঙ্গে কেউ না গেলে তো আমি যেতে পারব না। এদের সঙ্গে হাসপাতালে যেতে আমার লজ্জা করবে। তোমরা এসো না?

আমরা বললুম—নিশ্চয়। আমরাই তো নিয়ে যাব। সেই ব্যবস্থাই করে এসেছি। বিজ্ঞান আকাদেমি দুটোর সময় গাড়ি পাঠিয়ে দেবে। তৈরী থাকবেন।

দুটোর সময় তনিমা দেবীর হোটেলে পৌঁছে দেখি তিনি তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছেন। আমার গৃহিণীকে হাতের ইশারায় এক পাশে ডেকে নিয়ে বললেন—দেখতো ভাই পা-টা কেমন ফুলো মনে হচ্ছে না? ওটাও দেখাবো নাকি ডাক্তারকে?

গৃহিণী বললেন—পা যদি ফুলে থাকে দেখাবেন না? নিশ্চয় দেখাবেন। তিনি তনিমা দেবীর পা-টা একবার দেখলেন দু আঙুল দিয়ে টিপে। কিন্তু কিছুই অনুমান করতে পারলেন না। তনিমা দেবীর পা এমনিতেই ফুলো। আগে বেশী ছিল কি কম ছিল বোঝা শক্ত।

—ঠিকই আছে বোধ হয়।

—বেশ চলো তাহলে।

—ডাক্তারকে বলব আপনার পা ফোলার কথা?

—বলোই বরং। ডাক্তারের সব কিছু জানা দরকার।

পলিক্লিনিকে পেঁাছে তনিমা দেবী আমার গৃহিণীকে নিয়ে

ডাক্তারের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তারপর ডাক্তারকে শুধু যে তাঁর রক্তের চাপাধিক্য আর পা ফোলার কথাই বললেন তা নয়, সারা জীবনে যত কিছু অসুখ করেছিল তার সমস্ত ফিরিস্তি কয়েক ভাঁজ কাগজ খুলে ডাক্তারের সামনে মেলে ধরলেন। বললেন, এই সব অসুখের জন্যে তাঁকে বার বার ইয়োরোপে আসতে হয়। কবে কোন অসুখ করেছিল, তার তারিখ, ডাক্তারের নাম, কদিন ভুগেছিলেন, কি ওষুধ খেয়েছিলেন, শরীরের উত্তাপ, নাড়ির গতি, রক্তের চাপ, হৃৎপিণ্ডের ফুসফুসের, অবস্থা সব কিছুর রেকর্ড আছে। অদ্ভুত গোছালো মেয়ে এই তনিমা দেবী। ডাক্তার স্বীকার করলেন, এমন আশ্চর্য রোগিণী তিনি এর আগে কখনও দেখেন নি। যাই হোক, ব্যাধির তালিকা দেখে ডাক্তারের চোখ কপালে উঠল। যত রকম সাংঘাতিক রোগ দুনিয়ায় থাকতে পারে সব তনিমা দেবীর হয়েছে। দেহের কত জায়গায় যে অস্ত্রোপচার হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কেমন করে যে রোগিণী বেঁচে আছেন সেইটেই বিস্ময়ের বস্তু।

ডাক্তার চশমা খুলে বললেন—আপনাকে তাহলে ভালো করেই একবার দেখতে হবে। প্রথমেই দরকার ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা-গুলি সেরে ফেলা। বলে ঘস্‌ঘস্‌ করে একটার পর একটা স্লিপ লিখে চললেন। সবগুলো লেখা হয়ে গেলে আমার স্ত্রীকে বললেন—এই নিন। এইটা সমেত রোগীকে নিয়ে অমুক নম্বর ঘরে যাবেন, সেখানে হার্ট পরীক্ষা হবে বিজলী-যন্ত্রে। অমুক নম্বর ঘরে ফুসফুসের এক্স-রে। অমুক ঘরে মুত্র পরীক্ষা। অমুক ঘরে রক্ত পরীক্ষা। অমুক ঘরে মল পরীক্ষা। সব রিপোর্ট আসুক, তারপর আবার রোগী নিয়ে আসবেন।

তনিমা দেবী অথই জলে পড়লেন। শুধু রক্তের চাপ দেখাতে এসেছিলেন তার জায়গায় এত সব হাঙ্গামা? কি দরকার ছিল এ সবের? বললেন—শুধু রক্তের চাপ দেখে শেষ করলে হয় না?

ডাক্তার বললেন—সে কি? এই বললেন, পা ফুলেছে। পা-ফোলা কি সহজ কথা হলো? তার উপর অত সব রোগের ইতিহাস দেখালেন। না, না, ভাল করে আপনাকে পরীক্ষা করা দরকার।

গৃহিণী তনিমা দেবীকে ডাক্তারের ঘর থেকে বার করে এনে বললেন—দেখুন তনিমা দেবী, আপনি নেহাত কেউ কেটা নন। তার উপর এ দেশের মাননীয়া অতিথি। কিছু না দেখে আপনাকে ছেড়ে দেয় এমন সাহস নেই চেক ডাক্তারের। তা ছাড়া ওদের একটা দায়িত্বও তো আছে?

তনিমা দেবী একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন—শরীরের কোথায় কি রোগ লুকিয়ে থাকে সব সময় আমরাই কি আর জানতে পারি? সত্যি!

তনিমা দেবীকে সন্দেহ দোলায় ফেলে আমরা বাড়ি গেলুম। তনিমা দেবীর বক্তৃতা কিছুদিনের জন্যে স্থগিত রইল।

ক-দিন ধরে খুব ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা চলল। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে দৌড়োদৌড়ি। শেষে যেদিন সব পরীক্ষার ফল পাওয়া গেল, তনিমা দেবী আবার গেলেন ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার মুখ গম্ভীর করে বললেন—সবই নর্মাল দেখছি, শুধু এক জায়গায় দোষ। খাড়াইয়ের তুলনায় আপনার দেহের ওজন বেশ খানিকটা বেশী। ওটা কমাতে হবে। অন্তত আধ মণ কমানো দরকার। এই নিন, সারাদিন এর বেশী খাবেন না। বলে এক টুকরো কাগজে খাদ্যের তালিকা লিখে দিলেন। সারাদিনে একখানি ডিম, দুখানি টোস্ট। চা। সামান্য ভাত, কিছু ফল। এক ছিলে সিদ্ধ মাছ বা মাংস। চিনি বাদ, মাখন বাদ, ঘী বাদ, সব রকম সুস্বাদু খাবার বাদ।

তনিমা দেবী মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন। খেতে ভালোবাসেন, জীবনের ঐ একটি মাত্র ব্যসন, তা-ও গেল? তার উপর আধ

মণ ওজন কমাতে হবে? দেশে ফিরে গেলে লোকে বলবে কি? বিলেতে আসে লোকে মোটা হতে—তিনি কি রোগা হয়ে ফিরবেন?

যাই হোক ক-দিন বিশ্রাম করে তনিমা দেবীর উপকার হল।

তনিমা দেবী শেষ অবধি ডাক্তারের নির্দেশ মেনে চলেছিলেন কি না আমাদের জানা নেই। তবে দেহ পরীক্ষার পর খুশী মনে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন এবং সে বক্তৃতাও আমরা শুনেছিলুম। সেই বক্তৃতায় তিনি এত সুন্দরভাবে নানা জায়গায় ভারতীয় নারী-দের রন্ধন কৌশলের প্রশংসা করেছিলেন যে শুনে পরে অনেকে আমাদের বলেছেন যে তাঁদের ভারতবর্ষে যাবার লোভ অনেক বেড়ে গেছে ভারতীয় গৃহলক্ষ্মীদের হাতের রান্না খাবার যদি সুযোগ ঘটে যায় এই ভেবে। আমার অবশ্য মনে হয় ওটা ছিল তনিমা দেবীর চেক ডাক্তারদের নির্দেশিত নিষ্ঠুর খাদ্যতালিকার বিরুদ্ধে এক শেষ চরম আবেদন। যাই হোক দেশে ফিরে গিয়ে তনিমা দেবী যে চেক ডাক্তাদের খুবই প্রশংসা করেছেন এ কথা শুনেছি।

॥ ১১ ॥

প্রাহার অর্থনীতি সংস্থা বিজ্ঞান আকাদেমির তাঁবে। ঐখানে আমার প্রধান কর্মস্থল। শ্বেইনার সায়েব সংস্থার একজন বিজ্ঞান-কর্মী। যে বিভাগে তিনি কাজ করেন তার নাম পুঁজিবাদী দেশের অর্থনীতি। এঁর সঙ্গে আমার ভারতবর্ষেই আলাপ হয়েছিল। শ্বেইনার সে সময় পুঁজিবাদীদের মধ্যেকার অনুন্নত দেশগুলি নিয়ে গবেষণা করছিলেন। অনুন্নত দেশের মধ্যে ভারতবর্ষও পড়ে কারণ যন্ত্রশিল্প এবং অর্থনৈতিক মানে পশ্চিম দেশগুলোর কত পিছনেই তো আমরা পড়ে আছি। শ্বেইনার সায়েব এক বছর ভারতে ছিলেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ভারত পরিসংখ্যান সংস্থা প্রভৃতিতে কাজ করে গেছেন। সেই কাজের ফসলকে থিসিস্

রূপে ফুটিয়ে তুলে অবশেষে তিনি তা দাখিল করেছেন বিজ্ঞান আকাদেমির কাছে ডক্টর উপাধি লাভের অভিলাষে। এদেশে আজকাল ডক্টর শব্দটা ব্যবহার করে না, বলে কাণ্ডিডাট।

শ্বেইনারই আমায় খবরটা দিলেন। বললেন—দেখবেন নাকি আমাদের দেশের ডক্টরেটের পরীক্ষা কেমন? কাজেই গেলুম দেখতে। আমরা যাকে বলি মৌখিক পরীক্ষা, এরা বলে 'অভায়োবা' অর্থাৎ আত্মরক্ষা। পরীক্ষকেরা চতুর্দিক থেকে পরীক্ষার্থীকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করবেন আর পরীক্ষার্থী নিজেকে রক্ষা করে চলবেন সমুচিত উত্তর দানে। এই হল অভায়োবা। এই খণ্ডযুদ্ধ থেকে রক্ষা পেলেন তো ডিগ্রি মিলল, নইলে যান আবার চেষ্টা করুন গে।

পৌঁছতে আমার একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। অর্থনীতি সংস্থারই দোতলার হল-এ পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে দেখলুম। মস্ত ঘর। তার মাঝখানে সরু লম্বা একখানা টেবিল। টেবিলের দুই মাথার এক মাথায় বসেছেন অর্থনীতি সংস্থার প্রধান অধ্যক্ষ ডাঃ কাইগেল আর অপর মাথায় শ্বেইনার। টেবিলের দু-পাশে চারজন চারজন করে আটজন পরীক্ষক, তার মধ্যে দু-জন প্রধান—ডাঃ য়ানাচেক এবং ডাঃ হস্কী। টেবিল ছাড়িয়ে দেয়াল ঘেঁষে এক সারি চেয়ার। সেখানে অন্যান্য দর্শক-শ্রোতৃবৃন্দ। তার মধ্যে আমিও। অর্থনীতি সংস্থার প্রধান অধ্যক্ষ ডাঃ কাইগেলই শ্বেইনারের থিসিস্ পাঠিয়ে দিয়েছেন প্রধান পরীক্ষক-যুগলের কাছে। অন্যান্য পরীক্ষকদেরও তিনিই নিযুক্ত করেছেন। এ ছাড়া বন্ধু, পরিচিত, সহকর্মী এবং জনসাধারণের যে-কেউ এসে এই পরীক্ষা-সভায় যোগ দিতে পারেন এবং পরীক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতে পারেন।

আমি যখন পৌঁছলুম তখন প্রথম পরীক্ষক ডাঃ য়ানাচেক তাঁর বক্তব্য বলে যাচ্ছিলেন। য়ানাচেক একখানি লিখিত রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন শ্বেইনারের থিসিস্ সম্বন্ধে। তার নকল শ্বেইনারকে দেওয়া হয়েছিল আগেই। সেটাই বুঝিয়ে বলছিলেন। রিপোর্টে

শ্বেইনারের কাজের প্রচুর প্রশংসা ছিল। শুধু এক জায়গায় ছিল একটু বিরুদ্ধ কটাক্ষ। শ্বেইনার তাঁর লেখার মধ্যে যে-সব ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান ব্যবহার করেছেন সেগুলি সব সময় খুব নির্ভরশীল নয়। শ্বেইনারের নিশ্চয়ই সে কথা জানা আছে। তৎসত্ত্বেও তিনি পাঠকদের সে কথা পরিষ্কার করে বলেন নি কেন? শ্বেইনারের থিসিস্ ছিল ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে। ভারতবর্ষে তিনি যখন এসেছিলেন তখন এই সব পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু ভারত সরকারের যে-সব পরিসংখ্যান বিভাগ আছে তাদের কাজ কর্ম এবং তার ফলাফল যে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয় তা সুবিদিত। এই বলে থিসিসের নানা জায়গা থেকে ছক প্রভৃতি উদ্বৃত করে দেখাতে শুরু করলেন। এবং শেষে বললেন—অথচ এর চেয়ে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান কোথায় পাওয়া যায় তা-ও আমি জানি না। রিপোর্টে যাই লিখে থাকুন, য়ানাচেকের বক্তৃতা শুনে মনে হল, তিনি যেন থিসিসটা যথেষ্ট উপযুক্ত বলে বিচার করছেন না। য়ানাচেকের বক্তব্য শেষ হল।

কফি খাবার সময় হল। সংস্থার গবেষণা-সহকারিণীরা সবাইকে কফির পেয়ালা দিয়ে গেলেন। ঝি-চাকর তো নেই, এ-সব কাজ সংস্থার কর্মিণীদেরই করতে হয়। তারপর বক্তব্য শুরু হল দ্বিতীয় পরীক্ষক হর্স্কী সায়েবের। ইনি যে লিখিত রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাতে প্রচুর বিরুদ্ধ সমালোচনা ছিল। প্রশংসা ছিল কমই। কিন্তু মজা এই যে তিনি যখন বলতে শুরু করলেন তখন বিরূপ দিকটা মোটেই উল্লেখ করলেন না। থিসিসের যে অংশটা ভালো লেগেছে শুধু সেটার কথা বলে গেলেন। অনেকক্ষণ ধরে বললেন। শ্রোতাদের মনে হল হর্স্কী সায়েবের থিসিসটা খুব পছন্দ হয়েছে। তাঁরও বক্তৃতা শেষ হল।

সভাপতি কাইগেল তখন অন্য পরীক্ষদের একে একে বললেন—আপনারা এবার প্রশ্ন করুন। য়ানাচেক সাহেবের বিরুদ্ধ

সমালোচনার ফলে অনেকের মনেই অনেক কথা জেগেছিল। সকলে শুরু করলেন প্রশ্নবাণ।

শ্বেইনার টুকে নিলেন প্রশ্নের মূল কথাগুলি। সভাপতি অন্যান্য শ্রোতাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। জানতে চাইলেন, তাঁদের কোনো প্রশ্ন আছে কি না? আমাকেও জিজ্ঞেস করলেন। ভারতের কৃষি-মজুর সম্বন্ধে আমার একটা প্রশ্ন ছিল বটে কিন্তু যখন বুঝলুম সবার সুবিধার জন্য প্রশ্ন করা উচিত চেক ভাষায়, তখন আর বৃথা ও পথে গেলুম না।

শ্বেইনার জবাব দিতে শুরু করলেন। বেশ অনেকক্ষণ ধরে একের পর এক সকলের প্রশ্নের যতদূর সম্ভব উত্তর দিলেন। পরে আমি শ্বেইনারকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, তাঁর ঐ অভায়োবা অর্থাৎ আত্মরক্ষার অভিনয় কেমন লেগেছিল? তিনি বলেছিলেন—প্রধান বিচারক য়ানাচেকের কাছ থেকে হঠাৎ ঐ রকম আক্রমণ পেয়ে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলুম। বিশেষত লিখে যিনি থিসিসটার প্রশংসাই করেছেন তিনি একটা ক্ষীণ দুর্বলতাকে নিয়ে এত টেনে টেনে বলছেনই বা কেন? দ্বিতীয় বিচারক অবশ্য অনেকটা আমার পক্ষ নিয়েই বলেছিলেন। কিন্তু আমার পরম সুবিধা হয়ে গেল, যখন অন্য পরীক্ষকেরা নানা দিক থেকে আমায় নানারকম প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। কাণ্ডিডাটের পরীক্ষায় সাধারণত এত লোকে এত রকম প্রশ্ন করে না। নানারকম প্রশ্ন থাকায় নানা জিনিস সম্বন্ধে অনেক কিছু বলবার আমি প্রচুর সুযোগ পেলুম। থিসিসের মধ্যে যে-সব কথা ভালো করে বুঝিয়ে বলিনি, যথেষ্ট বলিনি, হয়তো বলিই নি, সেগুলি বিচারকদের সামনে গুছিয়ে গাছিয়ে উপস্থাপিত করলুম যথাসাধ্য। মোটামুটি শ্বেইনার ভালই বলেছিলেন।

জবাব দেওয়া হয়ে গেলে শ্বেইনারকে এবং শ্রোতৃবৃন্দ আমাদেরকে ঘরের বাইরে বারান্দায় যেতে বলা হল। কাঁচে ঢাকা বারান্দার দেয়ালের গায়ে যেখান দিয়ে গরম জলের পাইপটা

গিয়েছে, সেইখানে ঠেস দিয়ে আমি আরামে উষ্ণতা উপভোগ করতে লাগলুম। বারোজন পরীক্ষক রইলেন ঘরের মধ্যে। তাঁদের মধ্যে ভোট নেওয়া হতে লাগল—হ্যাঁ কি না? ডিগ্রি দেওয়া হবে কি হবে না? একজন বাদে আর সকলেই ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়ার স্বপক্ষে ভোট দিলেন। আমাদের ঘরে ঢোকবার আমন্ত্রণ জানানো হল। সভাপতি ঘোষণা করলেন পরীক্ষকদের সম্মতিক্রমে শ্রী শ্বেইনারকে কাণ্ডিডাট উপাধিতে ভূষিত করা হবে। হাততালি দিলুম আমরা সবাই। শ্বেইনার আমায় একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন—আমার বিশেষ বন্ধুদের আজ "অয়রোপা" রেস্তোরাঁয় খেতে আসতে বলতে যাচ্ছি। আপনিও এলে খুশী হব।

আমাদের বন্ধু শ্বেইনার, কাণ্ডিডাট শ্বেইনার হয়ে গেলেন।

॥ ১২ ॥

রোজ যেমন যাই, সেদিনও অর্থনীতি সংস্থায় গেছি। শ্বেইনারের খোঁজ করতে গিয়ে দেখি, তাদের ঘরের দরজা চাবি দিয়ে বন্ধ। ওদের বিভাগে জন ছয়েক গবেষক। দুখানি ঘর। একটি ঘরে বিভাগীয় কর্তা এবং অন্য ঘরটিতে বাকি সকলে। সকলকে ধরে না বলে পালা করে দু-তিন জন এক-এক দিন আসেন। যাঁরা আসতে পারেন না, তাঁরা বাড়িতেই কাজকর্ম করেন। জায়গার অভাব সারা দেশেই। পালা করে কাজ করবার ব্যবস্থা অনেক রিসার্চ বিভাগেই আছে। এখানে এসে অবধি শুনছি, মানুষের বসবাসের এবং কর্মস্থলের জন্য জায়গার বড় অভাব প্রথমে ভেবেছিলুম, যুদ্ধ-লীলায় যে-সব ইমারত ধ্বংস হয়ে গেছে, তারই বুঝি প্রত্যক্ষ ফল এটা। তারপর ভালো করে খোঁজ করে জানলুম, তা নয়। পোলাণ্ড বা রুশের মতো অমন ভয়ানক ধ্বংসলীলার মধ্যে দিয়ে চেকোস্লোভেকিয়াকে যেতে হয়নি। তবে

এমনটা কেন হল ? কারণটা খুব সহজ। আগেকার দিনে শহরের যে-যে অংশে বাসস্থলের সত্যিই অভাব ছিল, সে জায়গাগুলি আমাদের চোখেই পড়ত না। আয় যাদের নিম্নতম অথবা একেবারেই শূন্য, কারখানার গরিব মজুর, দোকানের দরিদ্র চাকুরে, অভাবী অথবা বেকার লোক, এদেরই এক অপার বাহিনী কোনো রকমে মাথা গুঁজে ছানা-পোনা নিয়ে কোথায় যে দিন কাটাতো কেউ তার খোঁজ রাখত না। নতুন সমাজ ব্যবস্থায় এই অগণিত মানুষ সমাজের উপর স্তরে উঠে এসেছে। তারা আজকাল মানুষের মতই থাকে। কাজেই শহরে যত বাড়ি আছে তার সমগ্র আয়তনও আজকের প্রয়োজনের তুলনায় কম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এমনি চলবে এখন আরো কয়েকটা বছর, যতদিন না লোহা আর কংক্রীট দিয়ে আরো কয়েক লক্ষ বাড়ি এরা গেঁথে তুলতে পারে। বাড়ি-ঘর তৈরির এক বিরাট পরিকল্পনা সামনে রেখে কাজ শুরু করে দিয়েছে এরা। যাই হোক, শ্বেইনারদের বসবার ঘরে যে-কোন দিন অন্তত অর্ধেক কর্মী থাকার কথা। কিন্তু কেউই নেই। একেবারে তালা বন্ধ। আপিসে খোঁজ নিয়ে জানলুম পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিভাগের সব কর্মী গ্রামে গেছেন ব্রিগাডার কাজ করতে। তাঁরা ফিরে এলে অন্যান্য বিভাগের কর্মীরাও একে একে যাবেন। ব্রিগাডার অর্থ স্বয়ংসেবক। মাঠে যখন ফসল পাকে, অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশী ফসল তৈরি হয়ে যায় যে গ্রামের সব চাষীরা মিলেও তুলে উঠতে পারে না। শহর থেকে, কারখানা থেকে তাই লোক ডাকা হয়। সময় মতো যথেষ্ট লোক না পেলে, মাঠের ফসল মাঠেই নষ্ট হতে পারে। তাই প্রতি বছর হেমন্তের সময় স্বয়ংসেবক ব্রিগাডাদের ডাক পড়ে। সারা দেশের লোকে এতে সাড়া দেয়। দেখবার মতো। মাঠের ফসল যে দেশেরই সম্পত্তি, নিজেরই সম্পত্তি এই প্রেরণাই এদের কাজ করায়। শ্বেইনার আর তাঁর সহকর্মী-কর্মিণীরাও তাই নিজেদের পুঁথিপত্র বন্ধ করে বীট তুলতে চলে

গেছেন। এদেশে একরকম মস্ত মস্ত সাদা বীট হয়, তার থেকে এরা চিনি করে। আখের চিনি এদেশে নেই। বীটের চিনি। এত হয় যে বিদেশেও রপ্তানী করে।

সেদিন বাড়ি ফিরে এসে এক বন্ধুর কাছ থেকে চিঠি পেলুম—মোরাভিয়া থেকে লিখেছেন। তিনি জানিয়েছেন, আমার চিঠির উত্তর দিতে দেরি হওয়ার কারণ, উত্তর-মোরাভিয়ায় তিনি গিয়েছিলেন তাঁর আপিসের সহকর্মীদের সঙ্গে আলুর ব্রিগাডা করতে।

পরের দিন ট্রামে উঠেই চোখে পড়ল ট্রামের কাঁচের জানলাগুলির উপর নতুন নতুন ইস্তাহার পড়েছে—মাঠে বীট! মাঠে আলু! যে পারো চলে এসো! দেরি করো না!

লামি সেদিন সন্ধ্যায় তার কলেজ থেকে ফিরে এসে বললে, তাদের কলেজের সব জায়গায় নোটিস লটকে দিয়েছে—হ্রেপা ভোলা! ব্রাম্বরি ভোলা! বীট তোদের ডাকছে! আলু তোদের ডাক দিয়েছে! আয় রে চলে আয়! কলেজ থেকে স্বয়ং-সেবকবাহিনী গড়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে। মাঠের কাজে যদি খুব বেশী ছেলেমেয়ের প্রয়োজন ঘটে তাহলে ক্লাসই বন্ধ হয়ে যাবে দু-এক হপ্তা।

চারিদিক থেকে ব্রিগাডার ডাক আসছে। চাষ করা, বীজ বোনা, জল সেচ এ সব করতে গ্রামে লোকের অভাব হয় না। কলে কাজ হয়। চাষ করা সার দেওয়া সব কিছুরই কল আছে। কলের চাষ আর উৎকৃষ্ট সারের ফলে এদের ফসল ধরেও তেমনি! তার উপর আজকাল ছোট ছোট জমি তো আর নেই। দেশ ভরা শুধু কৃষি সমবায়। বড় বড় জমি বড় বড় ট্রাকটরে চাষ হচ্ছে। উৎপাদন আরো বেড়ে গেছে। ফসলে মাঠ একেবারে ভরে যায়। সেই সময়েই মুশকিল। ফসল কাটারও অবশ্য নানারকম কল আছে। কিন্তু তাতেও কুলোয় না। বাইরে থেকে লোক না এলে শুধু গ্রামের লোকে আপ্রাণ খাটলেও মাঠের সব ফসল

সমবায়ের ঘরে তুলে উঠতে পারে না। তাই ব্রিগাডা লাগে। হেমন্তের সময় সাজ-সাজ রব পড়ে যায় চারিদিকে।

আমরা তাই ঠিক করলুম, আমরাও যাবো। এদেশে এসেছি, এদেশের ব্রিগাডা করব না? শুনছি এত, মাঠে গিয়ে দেখে আসি একবার ব্যাপারখানা। হাতেকলমে কাজ করে আসা যাক। ছুটলুম আমরা কৃষি-বিভাগের দপ্তরে। বললুম—দেখুন, আমরা ভারত থেকে এসেছি। শুনছি আপনাদের ব্রিগাডার লোক দরকার। আমরা যেতে রাজী।

তাঁরা শুনে গলে পড়লেন।—কি বললেন? ভারতবর্ষ থেকে এদেশে এসে আপনারা ব্রিগাডা করবেন? আমরা যে ধন্য হয়ে যাবো।

আমরা বললুম—মোটেই না। আমাদের আপনাদেরই লোক বলে গণ্য করবেন। পৃথক ভাববেন না। স্বয়ংসেবক সবাই সমান।

টেলিফোন করে তাঁরা খবর নিলেন, দু-এক জায়গায় প্রচুর বীট মাঠে পড়ে আছে। যে-কোন দিন ইচ্ছে করলেই আমরা যেতে পারি।

কিন্তু আমরা আগে থেকেই ঠিক করে এসেছিলুম যে আমরা আলুর ব্রিগাডা করব। আলুটা কেমন যেন আমাদের ঘরের জিনিস। আলু যেমন মাটি খুঁড়লেই লাফিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়ে, বীট কি হয় জানি না। আলুর ক্ষেতেই মজা। স্বয়ংসেবক হব কিন্তু মজা ছেড়ে দেব, এ আমাদের মনঃপুত নয়। আমরা বললুম—আজ্ঞে আমরা আলুর ব্রিগাডা করতে চাই। তার কোনো ব্যবস্থা হয় না?

—অ্যাঁ আলু? আলু তো প্রায় সবই তোলা হয়ে গেছে। এত দেরিতে কি আলু থাকে?

—দেখুন না তবু খোঁজ নিয়ে—যদি কোথাও পড়ে থাকে! আলুই আমাদের বেশী পছন্দ। বীটটা বিদেশী। আলু আমাদের দেশে হয়।

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে

রইলেন। তারপর বললেন—ঠিক বলেছেন। আলু যখন ভারতবর্ষে হয় তখন আমাদের উচিত আলুর ক্ষেতেই আপনাদের পাঠানো। দাঁড়ান দেখছি।

আবার টেলিফোন শুরু হল। যেখানে টেলিফোন করেন সেখান থেকেই খবর আসে আলু শেষ হয়ে গেছে। বীটই বরং বাকি! অবশেষে প্রাহার পশ্চিম আঞ্চলিক দপ্তর থেকে খবর পাওয়া গেল যে ঐ দিকের পাহাড়ের উপর ছু-একটা গ্রামে এখনও আলুর ব্রিগাডা হচ্ছে।

ঠিক হয়ে গেল যে আমরা তার পরদিনই আলুর ব্রিগাডায় যাবো।

প্রাহা থেকে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ কিলোমিটার পথ। যে ভল্‌টাভা নদীর ছুধারে প্রাহা শহর গড়ে উঠেছে সেই নদী যে-সব পর্বত-গাত্র দিয়ে নেমে এসেছে তার ঐ একটি পাহাড়ের কোলে গ্রামখানি। গ্রামের নাম ব্রাত্রিনভ্।

ট্রেনে করে যাবো ঠিক ছিল। সন্ধ্যেবেলায় একটা টেলিফোন পেলুম পশ্চিমাঞ্চলিক কৃষিদপ্তর থেকে। তাঁরা জানাচ্ছেন, কাল সকালে তাঁদের একখানি গাড়ি ব্রাত্রিনভ যাচ্ছে। আমরা যদি সাড়ে আটটার মধ্যে তাঁদের আপিসে চলে আসতে পারি তাহলে সেই গাড়ি করেই ব্রাত্রিনভে যেতে পারব।

ছুটলুম সকালে। আঞ্চলিক কৃষিদপ্তরের আপিসের দরজা ঠেলে ঢুকতেই এক অচেনা ভদ্রলোক উঠে এসে আমাদের অভিবাদন জানালেন এবং এক অচেনা মহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন—ইনিও যাচ্ছেন ব্রাত্রিনভ। আপনাদের দেখিয়ে দেবেন জায়গাটা।

গাড়িতে উঠে মহিলাকে জিজ্ঞেস করলুম—আপনিও কি আলুর ব্রিগাডায়?

তিনি বললেন—না, আমি যাচ্ছি ব্রিগাডার তদারকে। আমাদের টেকনিক্যাল কলেজ থেকে চার-পাঁচ-শ ছেলেমেয়ে ঐ অঞ্চলের নানা

জায়গায় ব্রিগাডার কাজে এসেছে। কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে, কোনখানে কতজন স্বয়ংসেবক প্রয়োজন দেখতে চলেছি।

—আপনি বুঝি কলেজে শিক্ষকতা করেন ?

—না আমি পড়াই না। কলেজের আপিসে, কাজ করি। আমার উপর ভার পড়েছে আমাদের স্বয়ংসেবক বাহিনীকে গঠন এবং নিয়োগ করার।

—আচ্ছা বলুন তো, ফসল কাটার সময় স্বয়ংসেবক যখন কম পড়ে তখন আপনারা কি করেন ?

—কম তো পড়তে দেখিনি কখনো। খবরের কাগজে, ট্রামে, বাসে, কারখানায়, কলেজে ইস্তাহারেই কাজ হয়ে যায়। তা ছাড়া এই দেখুন না, সুদূর ভারত থেকেই আপনারা ব্রিগাডা করতে চলে এলেন। লোক কম 'পড়বে কি করে ?

আমাদের গাড়ি এসে ব্রাত্রিনভে পৌঁছল। ব্রাত্রিনভের আশপাশের সাতখানি গ্রাম নিয়ে কৃষি সমবায়টি গঠিত। সেই সমবায়ের আপিস এই গ্রামে। কৃষি সমবায়ের আপিস মানে একখানি খামার বাড়ি। দেখলেই বোঝা যায় আগে কোনো অবস্থাপন্ন কৃষকেরই খামার বাড়ি ছিল এটা। ড্রাইভার গেল সমবায়ের সভাপতিকে খবর দিতে আমাদের আগমনের কথা। তিনি বলে পাঠালেন, এখনই যেন আমাদের মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি মিটিং শেষ করে মাঠে আসবেন 'আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। সুফলা গ্রাম। রাস্তার দু' পাশে বিরাট বিরাট ক্ষেত। আলু সর্ষে বীজ আর রেপ বীজ ডাইনে বাঁয়ে। গম কাটা হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন আগেই। এক জায়গায় দেখলুম তারই খড় বোঝাই করা রয়েছে পাহাড়ের মতো। এই সবের মধ্যে দিয়ে অবশেষে আমাদের গাড়ি প্রকাণ্ড এক আলুর ক্ষেতের মধ্যে এসে হাজির হল। যতদূর চোখ চলে শুধু সমান্তরাল উঁচু করা মাটির পাড়। আলুর পাড়—একটু ধাক্কা দিলেই হুড়হুড় করে আলু বেরিয়ে পড়বে। একখানাই ক্ষেত। অত বড়

জায়গা নিয়ে সমবায়ের একটি ক্ষেত। এমনি আরো কত ক্ষেত সাত গ্রামে ছড়িয়ে আছে কে জানে? আমাদের নামিয়ে দিয়ে তদারকী মহিলাকে নিয়ে গাড়ি চলে গেল মাঠে মাঠে ঘুরতে। যাবার সময় ড্রাইভার বললেন, বিকেলের দিকে তাঁকে প্রাহা থেকে এদিকে আবার আসতে হবে, সে সময় তিনি আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।

মাঠে আমরা পৌঁছতেই কাছেই দেখলুম একখানা 'ভ্যান' এসে লাগল। ব্রিগাডাদের ভ্যান। ভ্যানের পিছনের দরজা খুলে টপটপ লাফিয়ে নেমে পড়ল একদল ছেলে। ছেলেরা নেমে পড়তে ভ্যানের দরজা বন্ধ করে স্বয়ংসেবিকারা কাপড় ছেড়ে চোগা পরতে শুরু করে দিলেন। মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখলুম একটা কল চালানো হচ্ছে। কলের পিছন দিয়ে হুড়হুড় করে মাটির সঙ্গে আলু উঠে পড়ছে ক্ষেত থেকে। মোটা মোটা গোল আলু। গড়াচ্ছে, লাফাচ্ছে, নাচছে, মনে হচ্ছে যেন জ্যান্ত কি সব মাটির মধ্যে থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে আসছে। কাছে যেতে ড্রাইভার তাঁর ট্রাকটর থামালেন। সীট থেকে নেমে এসে একখানা সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কোথাকার লোক আমরা, কতদিন এসেছি, ইত্যাদি। কল দিয়ে কেমন করে মাটি খুঁড়ে আলু বের করা হয় বুঝিয়ে দিলেন। ভ্যানে করে যে ব্রিগাডার দল এসেছিলেন, দেখলুম তাঁরা সব বালতি হাতে আলু কুড়োতে এগিয়ে আসছেন।

ড্রাইভারকে আমরা বললুম—আপনি চালান আপনার কল। বার করুন কত আলু বার করতে পারেন। আমরাও হাত লাগাই। দেখুন সব আলু কুড়িয়ে ফেলতে পারি কি না!

ড্রাইভার বললেন—বেশ আপনারা বালতি এনে আলু তুলুন খানিকক্ষণ, কিন্তু আরও মজার কল দেখাব আপনাদের। এ ট্রাকটরের কাজ আজকের মত আমার প্রায় শেষ হয়ে এল। ঐ দেখুন ঐ দিকে—ঐটাকে চালাবো এর পর।

কিছু দূরে ক্ষেতের মাঝখানে দেখলুম আর একটা মস্ত কল দাঁড়িয়ে আছে।

—ওটাকে আমরা বলি কমবাইন। ওটা চালালে মাটি থেকে আর আলু কুড়োতে হয় না। আলু আপনি কলের উপর উঠে আসে। গ্রামের বুড়ীরা এসে পড়ল বলে। ওরা এলেই চালাবো। তখন যাবেন।

বালতি হাতে নিয়ে লেগে গেলুম কাজে। ট্রাকটর যেখান দিয়ে চলে গেছে সেখানেই মাটির সঙ্গে আলুর মাখামাখি। হাতে করে তুলে নিলেই হয়। বালতির মধ্যে টুং টাং করে আলু ফেলতে লাগলুম। কত আলু রে বাবা! পাঁচ দশ পা যেতে না যেতেই বালতি ভরে যায়। ভরা বালতি ঝুলিয়ে তখন চলো বস্তাওয়ালার কাছে। মাঠের এক জায়গায় কেতা কেতা খালি বস্তা সাজিয়ে ওজনের কল আর বাটখারা নিয়ে একজন টুলের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ইনিই হচ্ছেন বস্তাওয়ালা। টুল শুধু আছেই। টুলে বসবার এঁর সময় নেই। বস্তার মুখ এঁর সব সময় খোলা। সহকারী এক পাশে ধরেছেন আর ইনি নিজে এক পাশে ধরেছেন আর বালতিওয়ালারা অনবরত বস্তার মধ্যে আলু ঢেলে যাচ্ছেন। বস্তা ভর-ভর হয়ে এলেই দুজনে মিলে ওজন-দাঁড়ির উপর তুলে দেখছেন পঞ্চাশ কিলোগ্রাম হল কি না। হলেই তার মুখ বেঁধে হেঁইও করে একপাশে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মাটি থেকে আর একটা বস্তা তুলে নিয়ে দুজনে মিলে খুলে ধরছেন তার মুখ।

পনের কুড়ি বালতি আলু তোলার পরই শুনি কমবাইনের ঝক্‌ঝক্ শব্দ। জানান দিচ্ছে এইবার চলবে। মাঠের এক পাশ দিয়ে গ্রামের দিক থেকে দেখি বগলে ঝুড়ি নিয়ে কয়েকটি বুড়ি গুটি গুটি আমাদের দিকে আসছে। কমবাইনের ড্রাইভার হাত তুলে আমাদের ডাকলেন। আমরা বালতি ছেড়ে কমবাইনের কাছে এগিয়ে গেলুম। মাঠের এক অংশে একখানা খালি লরি দাঁড়িয়ে ছিল, সেটাও এগিয়ে

এসে কমবাইনের পাশে সমান্তরাল হয়ে দাঁড়াল। ছ-জন বুড়ী, কমবাইনের ড্রাইভার আর লরির ড্রাইভার এই হল কমবাইনের টীম্। আটজন হলেই কমবাইন চলে। আজকে আমরা দুজন বাড়তি হাত। দু-পাশের দুই সিঁড়ি বেয়ে কমবাইনের উপর উঠে গিয়ে আমরা দাঁড়ালুম। এক পাশে তিনজন বুড়ী আর আমি। অন্য পাশে আমাদের মুখোমুখি অপর তিনজন বুড়ী আর আমার গৃহিণী। আমরা উঠে দাঁড়াতেই কমবাইন চলতে শুরু করল। ঝক্ঝক্ ঝক্ঝক্ ডিজেলের ইঞ্জিন। আলুর সমান্তরাল পাড়গুলির পরস্পরের মধ্যে যেটুকু ফাঁক তা একেবারে গজে মাপা। সেইরকম পাশাপাশি দুটি ফাঁকে কমবাইনের চাকা দুটি বসাতে হয়। ফাঁকের মাঝে যে উঁচু জমিটি অর্থাৎ যার মধ্যে আলু জন্মেছে সেটি এসে পড়ে কলের ঘুরন্ত ফালের খর্পরে। ট্রাকটর চলতে আরম্ভ করলেই সেই ঘুরন্ত ফালে মাটি খোঁড়া হয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে আলু আর মাটির ঢেলা সিঁড়ি বেয়ে কমবাইনের পাটাতনের উপর উঠে পড়তে থাকে। একেবারে আলু বৃষ্টি। আমাদের ঠিক সামনে কোমরের সমান উচ্চতায় চওড়া একখানা রবারের ফিতে ছোট ছোট চাকার উপর দিয়ে ঘুরে চলেছে। সেই চওড়া ফিতের উপর যেই আলু আর মাটির ঢেলা এসে পড়ছে অমনি ঐ বুড়ীদের কাজ হচ্ছে আলুগুলিকে মাটির ঢেলা থেকে আলাদা করে ফেলা। চটপট হাত চলে বুড়ীদের। অনেক দিনের অভ্যেস। ফিতেটা যে-দিকে ঘুরছে তার মাথা বরাবর মাঝামাঝি একটা বেড়া। বেড়ার সামনে এসে পৌঁছবার আগেই ফিতের একদিকে আলু অপরদিকে মাটি এই করে ফেলতে হবে। দেখলুম বুড়িরা অতি দক্ষভাবে তা করছে। আলুগুলি ফিতের অর্ধেক অংশ বেয়ে একটি চলন্ত সিঁড়ির উপর এসে পড়ছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আলুগুলি একটি চোঙার মুখ দিয়ে লরির উপর এসে ঝরে পড়ছে টপাটপ। আর ফিতের অন্য অর্ধাংশ বেয়ে মাটির ঢেলাগুলি গড়িয়ে পড়ছে মাটির কোলে। ধীর গতিতে চলেছে আমাদের কমবাইন।

ঠিক একই গতিতে তাল রেখে চলেছে লরিখানা আমাদের পাশাপাশি চোঙার মধ্যেকার আলু গ্রহণ করতে করতে। বাছাইয়ের কাজটা বিশেষ শক্ত নয়। একটু দেখেই লেগে গেলুম আমরাও আলু আর মাটি বাছতে। এক এক দিকে চার-জোড়া করে হাত কিন্তু কারুর হাতের বা চোখের বিরাম নেই। ক্ষেতের সব জায়গায় তো সমান আলু হয়নি। কোনো জায়গায় বেশী, কোনো জায়গায় কম। যেখানে খুব বেশী আলু হয়েছে কমবাইনের ফলা সেখানে এসে পড়লেই হঠাৎ এত আলু ফিতের উপর উঠে পড়ে যে আলুর তোড় সামলানো যায় না। তখন দাঁতে দাঁত চেপে প্রাণপণে হাত চালাতে হয়। তবু আট-জোড়া হাত ফস্কে কত আলু যে মাটির ঢেলার সঙ্গে গড়াতে গড়াতে জমিতে পড়ে গেল তার ঠিক নেই। দুঃখ হয় তখন। যাই হোক, পরে আবার বালতি নিয়ে ঐ আলুগুলিকেই কুড়োতে হবে। প্রকাণ্ড মাঠ। একখানা আলুর ফাল ধরে মাঠের এক মুড়ো থেকে আর এক মুড়োয় পৌঁছতে কুড়ি মিনিট। এমনি ভাবে মাঠটাকে আড়াইবার যাওয়া আসা করাতেই লরি বোঝাই হয়ে গেল আলুতে। এক পাহাড় আলু।

আর একখানা খালি লরি দাঁড়িয়ে ছিল। এটাকে সরিয়ে দিয়ে সেটাকে টেনে আনা হল। দেখতে দেখতে সেটাকেও আমরা বোঝাই করে ফেললুম। তখন দুপুর বাজছে। খাবার সময়।

কমবাইন থেকে সবাই নেমে পড়লুম। আর যে-সব স্বয়ংসেবক-সেবিকা বালতি নিয়ে আলু কুড়োচ্ছিল তারাও বালতি নামিয়ে রাখল।

আমরা জিজ্ঞেস করলুম—গ্রামে কি খাবার জায়গা আছে?

—নিশ্চয়। চলুন আপনাদের সরাইখানায় পৌঁছে দিই। ওই ভ্যানে করে ব্রিগাডারা সবাই যাচ্ছেন। উঠুন ওতে।

—বুড়ীরা?

—বুড়ীরা তো গ্রামের লোক। কৃষি সমবায়ের স্বত্বাধিকারী।

ওঁরা চাল চিঁড়ে বেঁধে মাঠে এসেছেন। এখানেই আহার সারবেন। যান আপনারা খেয়ে আসুন। তারপর আবার সব কাজ আরম্ভ করা যাবে।

মাঠের স্বত্বাধিকারিণীদের পিছনে ফেলে আমরা ভ্যানে করে গ্রামের সরাইখানায় গিয়ে উপস্থিত হলুম। হাত পা গলা ঘাড় জামা কাপড় আলুর ক্ষেতের ধূলোয় ভরে গিয়েছিল। সরাইয়ের উঠোনে গিয়ে একটা হুক-এ কোট টাঙিয়ে ঠাণ্ডা জলে গা হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নিলুম। তারপর সরাইখানার টেবিলে গিয়ে বসতেই গরম সূপ আর খাবার ধরে দিল। আমাদের টেবিলে আরও পাঁচ-ছজন ব্রিগাডা বসে খাচ্ছিলেন। সবাই দেখলুম খুব ছেলেমানুষ। জিজ্ঞেস করলুম—আপনারা সব ছাত্র নাকি?

—না, কারখানায় কাজ করি।

—কারখানায়? চাকরি ছেড়ে ব্রিগাডা করতে এসেছেন?

—তা এসেছি বই কি।

—আজকের দিনের মাইনে কারখানা থেকে দেবে, না কাটা যাবে?

—কাজ না করলে আর মাইনে পাবো কি করে? কারখানা তো আমাদের অমনি পয়সা দেবে না। অবশ্য এই ব্রিগাডা করার জন্যে কৃষি সমবায় থেকে আমাদের সামান্য কিছু দেবে। কিন্তু সে কারখানার আয়ের তুলনায় নগণ্য। এ লোকসান আমাদের সইতেই হয়। ব্রিগাডা না এলে এত ফসল সময় মতো কখনই ঘরে তোলা যাবে না। সব নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা তাই কারখানা থেকে পালা করে এক এক বিভাগের মজুর এক এক দিন আসছি।

খাওয়া শেষ করে দাম দিতে যাবো, সরাইয়ের কর্তা এসে বললেন—দাম আবার কি? খাটলেন খুটলেন, খাওয়াবো না?

—সে কি, আপনি খাওয়াবেন কেন?

—আমি নয় অবশ্য। কৃষি সমবায়ের কাজ করে দিচ্ছেন আপনারা, কৃষি সমবায় আপনাদের যত্ন করবে না?

আমরা ধন্যবাদ জানালুম। তখন বললেন—এবার কি পান করবেন বলুন। বীয়ার দেব না লেমনেড?

—তাহলে দিন আর একটা লেমনেড।

ঠাণ্ডা লেমনেড খেয়ে আবার ভ্যানে গিয়ে উঠলুম। ব্রিগাডার দল এসে পৌঁছতেই ভ্যান ছেড়ে দিল। মাঠে পৌঁছে দেখি বুড়ীরা খেয়ে দেয়ে হাত মুছে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। আমরা আসতেই আলু তোলার কাজ শুরু হয়ে গেল।

কয়েকবার মাঠের এদিক ওদিক আনাগোনা করতেই প্রায় চারটে বেজে গেল। সেই সময় সমবায়ের সভাপতি এসে হাজির ভারতবাসী ব্রিগাডাদের সঙ্গে দেখা করতে। কুশলাদি প্রশ্ন সারবার পর আমরা জিজ্ঞেস করলুম—আচ্ছা বলুন তো, এই সপ্তগ্রামের সমবায়ে এই রকম আলুর ক্ষেত কটা আছে?

—এগারখানা।

—এই ক্ষেতটার পরিমাপ কত?

—বারো হেকটেয়ার। অর্থাৎ প্রায় সত্তর বিঘে।

—কত দিন আগে আলুর বীজ লাগিয়েছেন?

—এপ্রিল মাসে।

—সে সময় স্বয়ংসেবক দরকার হয়েছিল এখনকার মতো?

—না, বোনবার সময় অত লোক লাগে না। গ্রামে সমবায়ের যে চাষী আছে তাতেই কাজ হয়।

—আপনাদের কটা আলুর কমবাইন যন্ত্র আছে?

—এই একটাই। তবে ট্রাক্টর আছে অনেকগুলি। জানেন, এই কমবাইন পোলাণ্ডে তৈরি।

—তাই নাকি? কেন, চেকোস্লোভেকিয়া এত রকম কল করে আর আলুর কমবাইন তৈরি করতে পারে না?

—পারবে না কেন? করছে না আজকাল। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে পরস্পর এই ব্যবস্থা হয়েছে যে এক একটা দেশ

নিজের ক্ষমতানুযায়ী এক এক ধরনের যন্ত্র গড়বে। চেকোস্লোভেকিয়া শুধু বৃহৎ-যন্ত্রের দিকেই মন দিচ্ছে আজকাল। কৃষি যন্ত্রের অনেক কিছুই তৈরি করবার ভার পোলাণ্ডকে দেওয়া হয়েছে। সবাই সব জিনিস উৎপাদন করার চেয়ে এক একজন এক একরকম জিনিসের উৎপাদনের ভার নিলে ব্যয় সংকোচ হয়, মানেন নিশ্চয়। আন্তর্জাতিক 'ডিভিশান' অফ-লেবার-এর নাম শুনেছেন তো, এ হচ্ছে তাই। সমাজতান্ত্রিক জাতিগুলি বন্ধুসদৃশ সুসংবদ্ধ পরিবারের মতো উৎপাদনের ক্ষেত্রে এইভাবেই মেলামেশা করে কাজ করছে। দেখবেন, এই উপায়ে পৃথিবীর এই অংশ কলহমান পুঁজিবাদী দেশগুলির উৎপাদনের সীমা খুব শীগ্‌গিরই ছাড়িয়ে যাবে।

—আরো কমবাইন আনান না কেন আপনাদের সমবায়ের জন্যে ?

—আনাবো তো বটেই, কিন্তু এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না। কম পড়ে যাচ্ছে। সারা দেশে ট্রাকটর ও অন্যান্য কৃষিযন্ত্রের এত চাহিদা যে অত যন্ত্র এখনও জন্মাচ্ছে না। আমেরিকা, ইংলণ্ড, এক-শ বছর আগে নেমেছে যন্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে, কিন্তু ওরা তো আমাদের যন্ত্র ধার দেবে না। সোশালিস্ট দেশের সঙ্গে কারবার করতে ওরা অনিচ্ছুক। আমরা এই সবে নামলুম। কিন্তু তবু দেখবেন, ওদের আমরা ছাড়িয়ে যাবো।

—আচ্ছা, একটা কমবাইনে দৈনিক কত আলু তোলেন ?

—আড়াই শ হাণ্ড্রেড ওয়েট। প্রায় সাড়ে তিনশ মণ।

—একটা কমবাইন কজন লোকের কাজ করে ?

—আজ আপনারা দশজন মিলে কমবাইনে চড়ে যা কাজ করলেন তা হচ্ছে চারশ লোকের কাজের সমান।

সভাপতি চলে যেতে ভ্যান থেকে আবার আমাদের জন্যে খাবার নিয়ে এল। রুটি, মাংস, লেমনেড।

—এত খাটলেন, জিরোন, খান একটুখানি।

দেখি অন্যান্য ব্রিগাডারাও বালতি নামিয়ে মাঠের মাঝেই খেতে

বসে গেছে। ভ্যান থেকে তাদেরও জন্মে খাবার আসছে। বুড়ীরাও তাদের ঝুড়ি থেকে খাবার বার করে নিয়ে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিল। ড্রাইভার দুজনও নেমে এল তাদের সীট থেকে। রুটির থলি খুলে বসে গেল আমাদের পাশে। গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েদের ততক্ষণ স্কুলের ছুটি হয়ে গেছে। তারা সব মাঠে আলু কুড়োনো দেখতে আসছে চোখে পড়ল। কমবাইন ড্রাইভারের মেয়ে বোধ হয় স্কুলে থাকতেই খবর পেয়েছিল যে তার বাবার গাড়িতে দু-জন ভারতীয় চড়েছে আজ; সে তার বক্স ক্যামেরা নিয়ে এসে হাজির। আমাদের ছবি তুলবে। খাওয়া দাওয়া শেষ করে কমবাইনে উঠতেই আমাদের ছবি উঠে গেল। তারপর আবার ঝক্‌ঝক্ করে শুরু হয়ে গেল কাজ।

কতক্ষণ এক মনে কাজ করেছি খেয়াল নেই, হঠাৎ দেখি মাঠ শূনশান হয়ে গেছে। ব্রিগাডারা আর কেউ নেই। তাদের ভ্যানও অদৃশ্য। শুধু দূরে দূরে গ্রামের সমবায়ের চাষীরা আলু ভরা ভারি ভারি থলিগুলো তুলে তুলে এক জায়গায় জড় করছেন। আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বলে গিয়েছিল যে গাড়িখানা তার কোথাও কোনো চিহ্ন নেই। ভাবলুম, তাহলে হয়তো কোনো কারণে গাড়ির দেরি হচ্ছে; বরং আরো কিছুক্ষণ কাজ করা যাক। বুড়ীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আবার আলু বাছা শুরু করলুম। খানিক পরে আমাদের লরি আলুতে ভর্তি হয়ে গেল। আজকের মতো কমবাইনের কাজ শেষ। বেশ কয়েক শ মণ আলু তোলা হল। আমরা নেমে এলুম কমবাইন থেকে, কিন্তু তখনও গাড়ির কোনো পাত্তা নেই। বুঝলুম, কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। গাড়ির আশা আজ ছাড়াই ভালো।

গা থেকে ধুলো ঝেড়ে গায়ে কোট চড়িয়ে আমরা যাবার উদ্যোগ করছি দেখে এক বুড়ী বললেন—কি? আপনারা আজ পায়ে হেঁটেই প্রাহা চললেন না কি?

আমরা বললুম—ঠাট্টা রাখুন—ট্রেনের টাইম কি বলুন তো? স্টেশানই বা এখান থেকে কত দূর?

মাঠের সব চাষানী তখন এক জায়গায় এসে জড় হয়েছেন। জন কুড়ি পঁচিশ। তাঁদের মধ্যে দ্রুত পরামর্শ চলল। শেষে তাঁরা রায় দিলেন, একটা ভালো এক্সপ্রেস ট্রেন এইমাত্র চলে গেছে। এর পরের ভালো ট্রেন রাত সাড়ে আটটায়।

—চলুন এখন গ্রামে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে খাওয়া দাওয়া করুন, তারপর আপনাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব। প্রাহায় পৌঁছবেন সাড়ে নটায়। বাড়ি পৌঁছে যাবেন দশটায়।

গৃহিণী আঁতকে উঠে বললেন—সে কি? রাত দশটা? আমাদের ছোট্ট ছেলে রয়েছে একা বাড়িতে তার দিদির কাছে। দিদি তাকে সামলাতেই পারে না। কি করবে সে এতক্ষণ? তার শরীরও ভালো নয়।

—আঁা, বলেন কি? ছোট ছেলে বাড়িতে? শরীর ভালো নয়? দিদি তাকে সামলাতে পারে না?

আবার পরামর্শ চলল, শেষে ঠিক হল, নাঃ এই মহামান্য অতিথিদের ট্রেনে করে পাঠানো চলবে না। এক্ষুণি গ্রামে গিয়ে দেখ, অমুক লোকের গাড়িটা পাওয়া যায় কি না। গাড়ি করে এঁদের অন্তত প্রাহার প্রান্তসীমায় 'ব্রানিক' পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে।

—উঠুন আপনারা ঐ গাড়িতে। গ্রামে আপনাদের এখনই পৌঁছে দিয়ে আসুক।

দেখলুম আমাদের সামনে একখানা নামে গাড়ি কিন্তু কী যেন এক বস্তু দাঁড়িয়ে ভট্‌ভট্ করছে। পিছনের চাকা দুটো বিরাট, সামনের দুটো ছোট। সামনে একটা শক্তিশালী ইঞ্জিন আছে কিন্তু পিছনে যেখানে একটা 'বডি' থাকবার কথা সেখানে প্রায় কিছুই নেই। ড্রাইভার সাইকেলের সীটের মত একখানি সীটে কোনরকমে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে পারে। ড্রাইভারের পিছনে সরু দুখানা কাঠের

টুল, তাতেও কোনোরকমে পা ঝুলিয়ে বসা যায়। এতক্ষণে মনে পড়ল, আমাদের আলুর লরির সামনে এই যন্ত্রটাই আটকানো ছিল। লরির নিজের কোনো ইঞ্জিন ছিল না। এরই সাহায্যে চলছিল। এরই সাহায্যে আলুর লরি বীটের লরি টেনে নিয়ে যায় এরা মাঠ থেকে গ্রামে। আলুর লরি পড়ে রইল, আমাদের নিয়ে ছুটল যন্ত্র গ্রামের দিকে।

বুড়ীরা চেঁচিয়ে বললেন—ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসবেন আবার।

গ্রামে পৌঁছে মোটার পাওয়া গেল। যাঁর গাড়ি তিনি গন্তব্য-স্থলে যাবার আগে সরাইয়ে ঢুকেছিলেন এক পাত্র ঠাণ্ডা বীয়ার খেতে। তাতেই ধরা পড়ে গেলেন। গ্রামের লোকেরা তাঁকে ছাড়ল না। তাঁর যাবার কথা প্রাহার ঠিক উল্টোদিকে, কিন্তু গ্রামের বাসিন্দারা তাঁকে বোঝালো যে গ্রামে যখন এহেন অতিথিরা এসেছেন তখন তাঁদের সুখ সুবিধা দেখাই গ্রামের প্রধান কর্তব্য। কাজেই অন্যদিক আজ থাক—এঁদের বাড়িতে ছোট ছেলে, তার আবার অসুখ। সব কাজ ছেড়ে এঁদেরই বাড়ি পৌঁছে দেওয়া উচিত।

ভদ্রলোক সম্যক বুঝলেন। বীয়ারের গ্লাসটা চোঁ করে শেষ করে দিয়েই গাড়ির দরজা খুলে আমাদের আহ্বান করলেন, গাড়িতে দয়া করে উঠতে। বললেন—প্রাহা শহরের পশ্চিম সীমানা ছাড়িয়ে যেখান থেকে ট্রামের লাইনের আরম্ভ সেইখানে আমাদের নামিয়ে দেবেন। বাকি পথটুকু আমরা অনায়াসে ট্রামে করে যেতে পারব। গাড়িতে যখন স্টার্ট দেওয়া হচ্ছে তখন আবার এক কোলাহল।

—আরে আরে দাঁড়াও। এঁরা এত খাটলেন, এঁদের বাড়ি ফেরার এত অসুবিধে হল। এঁদের তো কিছু দেওয়া হল না। লে-আও গাড়ি ভাঁড়ারে।

গাড়ি পিছু হটে আলুর গুদোমে ঢুকতেই সমবায়ের কর্তারা হেঁইও করে একটা পঞ্চাশ-সেরী আলুর বস্তা শূন্যে তুলিয়ে গাড়ির পিছনে তুলে দিলেন।

—এই সামান্য কিছু আলু দিলুম। নিয়ে যান।

আমরা আপত্তি জানাতে গেলুম। এ কি পকেটে করে নিয়ে যাবার মত সামান্য উপহার? দেড়মণি বস্তা আমরা দুজনে মিলেও তুলতে পারব না ঘরে। কিন্তু কে শোনে কার কথা?

—ছেলেমেয়েদের আনবেন একদিন। ধন্যবাদ। নমস্কার। শুভরাত্রি। ভগবান আপনাদের সহায় হোন। স্বাস্থ্য ভাল থাকুক। পুনর্দর্শনায়। পুনর্দর্শনায় করতে করতে গাড়ি ছেড়ে দিল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা ব্রানিক স্টেশানে এসে পৌঁছলুম। এখান থেকে ট্রামে করে আমাদের বাড়ি যাওয়া যায়। কিন্তু আলু নিয়ে আমরা কি করব? আলু নিয়ে যাবো কি করে?

ভদ্রলোক আগেই ভেবে রেখেছিলেন। বললেন—দেখুন, আজই তো আপনারা আলুসিদ্ধ, আলুপোড়া বা আলুভাজা খাচ্ছেন না?

আমরা বললুম—না।

—তবে এ বস্তা আজ আমার গাড়িতেই থাক। পরশু সকালে আমি আপনাদের পাড়ায় রেডিওর দোকানে টেলিভিশান সেট্ কিনতে যাচ্ছি। সেই সময়ে আপনাদের বাড়িতে আলু নামিয়ে দিয়ে গাড়িতে টেলিভিশান সেট তুলে ফিরে যাবো।

সুব্যবস্থা। আমরা ট্রামে করে বাড়ি ফিরে এলুম। এসে দেখলুম মিতু আর লামি উভয়েই আমাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় এবং আমাদের অ্যাডভেঞ্চার শোনবার জন্যে বসে আছে।

॥ ১৩ ॥

আলুর বস্তা পাওয়া গেল দু দিন পরে। ভদ্রলোক নিজেই তুলে দিয়ে গেলেন ঘাড়ে করে আমাদের ভাঁড়ার ঘর পর্যন্ত। হিসেব করে দেখলুম, সারা শীতকাল ধরে খেলেও এ আলু আমরা শেষ করতে পারব না। একদিনের ব্রিগাডার ফল।

লামি আর মিতু আমাদের গল্প শুনে মহা উত্তেজিত। বললে—তা হলে আমাদের একদিন নিয়ে চল।

নেমন্তন্ন তো রয়েইছে, কাজেই সে সপ্তাহের রবিবার বিজ্ঞান আকাদেমির কাছ থেকে একখানা গাড়ি চেয়ে নিলুম আমরা। দুপুরের খাওয়ার পর সেই গাড়ি করে বেরিয়ে পড়লুম ব্রাত্রিনভের পথে।

খবর দিয়ে যাইনি। নিতান্ত দরকার না পড়লে রবিবার ওখানে মাঠের কাজ হয় না। ব্রিগাডারাও কেউ যায় না। এটা অবশ্য আমরা জানতুম না। তাই ব্রাত্রিনভের সরাইখানায় গিয়ে যখন ঢুকলুম, দেখলুম সবাই আড্ডা দিচ্ছে। সরাইয়ের বাইরে একখানা মোটার বাইক। তার গায়ে হেলান দিয়ে কাঁধে বন্দুক নিয়ে কমবাইনের ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি শিকার করতে চলেছেন। ইনি কৃষি সমবায়ের একজন হোমরা চোমরা ব্যক্তি। আমাদের দেখতে পেয়ে বন্দুকটা ঠেস দিয়ে রেখে এগিয়ে এসে বললেন—বড়ই দুঃখিত, আপনারা আজ আসবেন তা তো আগে জানতুম না। আমায় হরিণ শিকারে যেতে হচ্ছে। সব ব্যবস্থা আগে থেকে করা ছিল। তবে চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। আপনারা যখন এসেই পড়েছেন তখন রবিবারই হোক আর যে বারই হোক কমবাইন আজ চলবেই। এঁরা রইলেন। ড্রাইভারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সব হয়ে যাবে। আমায় আজ ক্ষমা করবেন।

এই বলে তিনি মোটার বাইকে স্টার্ট দিয়ে বললেন—কপালে থাকে তো আজ আপনাদের একটা গোটা হরিণই উপহার দেব। নিদেন পক্ষে আধখানা। বলেই উধাও।

বলে কি লোকটা? এদের দেশের হরিণগুলো তো একেকটা টাট্টু ঘোড়ার মতো। সত্যি যদি মেরে আনে একটা তার আধখানা আমাদের তাতরা গাড়িতে উঠবে? এরা তো এ সব বিষয়ে ঠাট্টা করে কথা বলে না। সত্যি যদি দিয়ে দেয়, অত বড় একটা হরিণের

আধখানা নিয়ে আমরা কি করব? আমাদের মহা ভাবনা হল। লামি চটে গেল। বললে—কখ্‌খনো আমি হরিণ মারতে দেব না। আমরা বললুম—তুমি না দেবার কে? ঐ তো চলে গেল বন্দুক উঁচিয়ে বনের মধ্যে। কোথায় পাবে তুমি এখন ওকে?

হরিণ মারার এই নিরানন্দ ব্যাপার নিয়ে আমরা যখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছি ততক্ষণে আর সবাই গ্রামের ঘরে ঘরে লোক যোগাড় করতে বেরিয়ে পড়েছে। রবিবারই বা কি ছুটিই বা কি? গ্রামে যখন বিদেশী অতিথি এসেছেন ব্রিগাডা করতে, তা-ও আবার সঙ্গে ছেলেপুলে নিয়ে, তখন এঁদের জন্যে মাঠে কমবাইন বার করতেই হবে।

দেখতে দেখতে লরির ড্রাইভার কমবাইনের ড্রাইভার আর ছ-জন বুড়ি যোগাড় হয়ে গেল। ছুটির দিন হওয়ায় গ্রামের ছেলেমেয়েরা বললে—আমরাও মাঠে যাবো। আলু পোড়াবো। একখানা লরিতে ছালা বিছিয়ে আমরা সব বসে পড়লুম। যে কজন ছেলেমেয়ে ধরল তারাও উঠে এল। বাকি ছেলেমেয়েরা চললো হেঁটে। টহর টহর করে লরি চলতে শুরু করতেই লামি গান ধরল—আমরা চাষ করি আনন্দে।

সেদিন ছ জন বুড়ি আর আমাদের চারজনকে নিয়ে দশ জোড়া হাত হল। লামি আর মিতু আলু বৃষ্টির কথা মুখেই শুনেছিল, চোখে দেখে একেবারে থ। দু-হাতে করে টপাটপ আলু বেছে আর শেষ করেই উঠতে পারে না। দুজনের সে কী ফূর্তি! বলে, এ রকম একটা কল আমাদের দেশে নিয়ে গেলে বড় ভালো হয়।

সত্তর বিঘে মাঠের আলু ক-দিনের মধ্যে এরা প্রায় শেষ করে এনেছে। আমরা যদি আর দু-তিন দিন পরে আসতুম মাঠ শূন্য দেখতুম। যাই হোক, দেখতে দেখতে এক লরি আলু ভর্তি হয়ে গেল।

মাঠের মাঝখানে এক জায়গায় গ্রামের ছেলে-মেয়েরা আলুগাছের

শুকনো পাতা জড় করে প্রকাণ্ড আগুন করেছিল। তার মধ্যে গাদা গাদা আলু ফেলে দিয়েছিল পোড়াতে। কমবাইন থামতেই গ্রামের ছেলেমেয়েরা কাগজের ঠোঙায় করে আলু পোড়া এনে আমাদের হাতে ধরে দিলে। নুন আনতেও ভোলেনি। বিকেলের দিকে তখন একটা ঠাণ্ডা হাওয়া উঠেছে। শীত শীত করছে। শীতের মধ্যে হাতে গরম-গরম আলু পোড়া নিয়ে তাতে কামড় দিয়ে কী আরাম যে পেলুম তা আর কী বলব !

সেদিন ঐ এক লরির বেশী আর আলু তোলা হল না। আলু বোঝাই লরির উপর সবাই মিলে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আমরা চললুম ফিরে গ্রামের দিকে। আমাদের টেনে নিয়ে চললো সেদিনের সেই ডিজেলে চলা যন্ত্রটা। লামি আবার গান ধরল—আমরা চাষ করি আনন্দে। মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধ্যে ! যেই না বলা 'সন্ধ্যে' অমনি সঙ্গে সঙ্গে লামির গান বন্ধ হয়ে গেল। একেবারে চুপ। হঠাৎ দেখি লামি এক দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। কি ব্যাপার ? তাকিয়ে দেখি দূরে আলের উপর চারটে হরিণ। কাটা ক্ষেতের মধ্যে বোধ হয় লুকিয়ে ছিল, আমাদের লরির শব্দ শুনে ছুটে পালাচ্ছে। তাদের পিছনে দেখা গেল আরো দুটো হরিণ। সবাই ছুটছে বনের দিকে। বুড়িরা বললে, ঐ বনের মধ্যে শিকারী গিয়েছিলেন বন্দুক নিয়ে। কিন্তু মনে হচ্ছে শিকারীর গন্ধ পেয়েই হরিণরা ক্ষেতে পালিয়ে এসেছে। এখন এদিক থেকে আমাদের তাড়া খেয়ে বনে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু বিপদ আর নেই। শিকারী এতক্ষণে বন থেকে গ্রামে রওনা হয়েছেন। যাক হরিণগুলো তাহলে বেঁচে গেছে। লামি তো শুনে খুব খুশী।

আমাদের লরি যে রাস্তা দিয়ে গ্রামে এসে পৌঁছল ঠিক তার উল্টো রাস্তা দিয়ে শিকারীও ফিরলেন তাঁর বন্দুক আর মোটার বাইক নিয়ে। হাত খালি। হরিণ মেলে নি।

আমরা শিকারীর কাছে হরিণগুলোর বুদ্ধির খুব তারিফ করলুম।

তিনি শুনে হাসলেন। তারপর আমরা যখন গাড়িতে উঠতে যাবো, ছুটে এসে বললেন—হরিণ পেলেন না বলে কি খালি হাতে যেতে হয় না কি? কিছু আলু নিয়ে যান।

—এই তো সেদিন এক বস্তা নিয়ে গেলুম। ওই খেয়ে শেষ করে উঠতে পারব না।

—আহা সব তো রোগা রোগা চেহারা। আলু খেয়ে মোটা হন। বলে আরো আধ বস্তা আলু আমাদের গাড়ির সামনের দিকে তুলে দিলেন।

ব্রাত্রিনভ গ্রামের সঙ্গে এইভাবে আমাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় হল। গ্রামের নামই হল ব্রাত্রি কিনা ভ্রাতৃ তার আবার নভ্। নভ্ কোন প্রত্যয় কে জানে?

॥ ১৪ ॥

গৃহিণীর আমন্ত্রণ আসছিল নানা জায়গা থেকে রবীন্দ্র জন্মশত-বার্ষিকী উপলক্ষে বক্তৃতা দেবার জন্যে। সবচেয়ে বেশী আসছিল তাঁর জন্মস্থান মোরাভিয়া থেকে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর বড় উৎসব প্রাহায় হয়ে গিয়েছিল আগেই, তখন আমরা কেউই চেকোস্লো-ভেকিয়ায় এসে পৌঁছই নি। তারপর ক্রমে ছোট ছোট শহরে গ্রামে শতবার্ষিকী উৎসব ছড়িয়ে পড়েছে।

তাই একদিন গৃহিণী চলে গেলেন তাঁর জন্মস্থান প্রেরভ শহরে, মোরাভিয়ায়। প্রেরভের আশেপাশে কয়েকটি জায়গায় তাঁর বক্তৃতার আয়োজন হয়েছিল। সেই সব জায়গা সেরে কয়েক দিনের মধ্যে তাঁর ফিরে আসবার কথা প্রেরভ শহরের মানুষদের কাছে বাংলা দেশের কবি এবং বাংলা দেশ সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্যে। ঠিক হল সেদিন আমিও গিয়ে প্রেরভে হাজির হব। ছেলেমেয়েরা

অবশ্য আমাদের প্রাহার বাড়িতে একাই থাকবে। তারা ততদিনে বেশ খানিকটা স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছিল, কাজেই আমাদের কোনো ভাবনা ছিল না।

আশ্চর্য লাগে। কোথায় প্রেরভ আর কোথায় রবীন্দ্রনাথের বাংলা দেশ! কিন্তু তবু লোকের জানবার কী উৎসাহ! চেক দেশের যে দু-একজন মনীষী রবীন্দ্রনাথের লেখা পাঠ করে তা চেক দেশের অধিবাসীদের কাছে পরিবেশন করেছিলেন তার ফল ফলতে আরম্ভ করেছে। এ দেশবাসীরা, এ দেশের সাধারণ লোকেরা রবীন্দ্রনাথ তথা বাংলাদেশ সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু জানতে চায়। নানা স্থান থেকে যে-ভাবে শতবার্ষিকী সভার পরিচয় পত্র এবং রিপোর্ট আসতে লাগল তাতে মনে হল এদের জ্ঞান-পিপাসা আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি, আগের সঙ্গে আর তুলনাই চলে না। আগেকার দিনে যে মনের প্রসার, জ্ঞান-লিপ্সার যে প্রখরতা, বহির্জগতকে জানবার যে উন্মুখতা শুধু জ্ঞানী গুণী এবং সমাজের উপর তলার শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল তা আজ খোলা পেয়ে সমাজের সমস্ত স্তরে চারিয়ে গেছে। এতকাল যারা নিম্নস্তরে মুখ বুজে, চোখ বুজে, মন মুদে বিচরণ করত তারা আজ জেগে উঠেছে। তাদের সংখ্যা তো বড় কম নয়। জনসংখ্যার বেশীর ভাগটাই হচ্ছে আগেকার দিনের নিম্নস্তরের মানুষ। এই অপার জনসমুদ্র আজ উন্মুখ উদ্বেল। তারা সব জানতে চায়—কোথায় রবীন্দ্রনাথ, কোথায় বাংলা দেশ, কিছু বাদ দেবে না। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই নতুন জাগরণ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো সমস্ত জাতিকে আলোড়িত করে তুলেছে।

বেরিয়ে পড়লুম সুটকেস গুছিয়ে প্রেরভের পথে। ট্রেনে সেদিন বেজায় ভিড়। সুটকেসটাকে কোনোরকমে একটা কামরার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলুম বটে, কিন্তু নিজের জন্যে কোনো জায়গা পেলুম না। অনেকটা পথ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে হল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

বিরক্ত হয়ে পকেট থেকে একটা ন্যাসপাতি বার করে চিবোচ্ছি সেই সময় কনুইয়ে এক মৃদু টান অনুভব করলুম।

—ভিতরে আসুন, জায়গা হয়েছে।

একখানা সীট খালি হয়ে গেছে দেখে বসে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নবাণ।—কোন দেশের লোক? বয়েস কত? কেন জানিনা, এরা আমাদের দেশের লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বয়সের আন্দাজ করতে পারে না। তাই লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞেস করে বসে। বয়েস বললুম। তখন প্রশ্ন—চললেন কোথা? প্রেরভের নাম করতেই দুই ভদ্রলোক এবং এক মহিলা এক সঙ্গে বলে উঠলেন—তবে কি আপনি 'পান্' গাঙ্গুলি নাকি? পান্ মানে শ্রী। স্বীকার করতে ছাপা কাগজ বার করে বললেন—এই দেখুন, শ্রী ও শ্রীমতী গাঙ্গুলি প্রেরভে আজ সন্ধ্যায় বক্তৃতা দেবেন। আমরা প্রেরভের লোক—শুনতে চলেছি। মহিলাটি তারপর সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে বসলেন—আপনি যাচ্ছেন, শ্রীমতী কোথায়? আমি বললুম—শ্রীমতী প্রেরভের মেয়ে। তিনি ক'দিন আগেই প্রেরভে গিয়ে বসে আছেন।

—অ্যাঁ, বলেন কি? প্রেরভের মেয়ে? বিশ্বাসই হয় না যে। তারপর শুরু হল আমার ঘর সংসার সম্বন্ধে যত রকম ব্যক্তিগত এবং অন্তরঙ্গ প্রশ্ন। এদের কৌতূহল একবার জাগ্রত হলে রোধ করে কার সাধ্য।

প্রেরভ স্টেশানের প্ল্যাটফর্মে গৃহিণী দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি নামতেই বললেন—কাণ্ড শুনেছ? সারা শহরে পোস্টার তো দিয়েইছে তার উপর রেডিওতে জানিয়ে দিয়েছে তুমি আর আমি আজ সশরীরে টাউন হলে আবির্ভূত হচ্ছি।

আমি বললুম, বেশ তো, বিখ্যাত হয়ে যাওয়া গেল। দেশে তো আর এ সুযোগ হয়নি।

গৃহিণী বললেন—রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনতে চায় এরা তোমার মুখে বাংলা উচ্চারণে। পারবে কিছু বলতে?

এ জিনিসটা আমি আগেই আঁচ করে এসেছিলুম। বললুম—ভয় নেই, পকেটেই কবিতার বই আছে।

কুটুম বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম করতে বসা গেল। সন্ধ্যার সময় আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ি এসে হাজির। বেজায় শীত পড়ে গেছে। কিন্তু উপায় কি? বাংলাদেশের প্রতিনিধি, কাজেই অতি সাধারণ বাঙালী পোশাকে, ফিনফিনে ধুতি, শাড়ি আর চটি পরেই যেতে হল। ঐ পোশাকে আমরা যখন গাড়ি থেকে টাউন হলের দরজায় নামলুম তখন সেখানকার অধ্যক্ষা এমনই অভিভূত হয়ে পড়লেন যে মাটিতে প্রায় মাথা লুটিয়ে ফেলেন আর কি। আবেগে গলার স্বর কম্পিত। আমাদের নিয়ে এমন করতে লাগলেন যে মনে হল টাউন হলের প্রবেশ দ্বারই খুঁজে পাচ্ছেন না। শেষে গলা কাঁপিয়ে বললেন—আজকে হলে লোক দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত থাকবে না।

আমরা ভিতরে ঢুকে স্টেজের পিছনে গিয়ে উঠলুম। বুঝলুম সাধারণ বক্তৃতা মঞ্চ নয়—স্টেজের উপরে গিয়ে আমাদের আবির্ভূত হতে হবে। স্টেজের পর্দা ফেলা। মঞ্চের ডান পাশে তিনখানি চেয়ার, ছোট একটি টুলের উপর কাঁচের পাত্রে এক পাত্র ঠাণ্ডা লেমনেড ও তুটি ছোট্ট গেলাস। তার ধারে মাইক। সমস্ত ঘর অন্ধকার করে দেওয়া হল। অধ্যক্ষা আমাদের নিয়ে এগোলেন। বললেন, আপনারা চেয়ারে বসলেই আলো জেলে পর্দা তুলে দেওয়া হবে।

গৃহিণী শাড়ীর নীচে থেকে একখানি রেকর্ড বার করে অধ্যক্ষার হাতে দিয়ে বললেন—তবে এক কাজ করুন। পর্দা তোলবার আগে এই রেকর্ডটি বাজান।

সুচিত্রা মিত্রের গাওয়া রবীন্দ্র সঙ্গীত।

পর্দার পিছন থেকেই বেশ বুঝতে পারছিলুম প্রকাণ্ড হল্‌এ লোক গিস্‌গিস্‌ করছে। হয়তো তিল ধারণের স্থান নেই। তাদের ফিস্‌ফিস্‌

কথাবার্তা, কাপড়ের খসখস শব্দে মনে হচ্ছে ঘরের সমস্ত ফাঁকটা যেন এক অধীর গুঞ্জনে সজীব হয়ে রয়েছে। গ্রামোফোনে সুচিত্রার গলা ধ্বনিত হতেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। একটু নিঃশ্বাসের শব্দও আর কানে এল না। প্রেরভের টাউন হলের মধ্যে বাংলা গানের সুর যেমন উঠতে পড়তে লাগল, মনে হতে থাকল যেন হলের শীতলতার মধ্যে এক মোলায়েম ইষতুষ্ণ আমেজ ছড়িয়ে পড়ছে।

গান থেমে যেতে সে কী চটাপট হাততালি ধ্বনি! থামতে চায় না। মনে হল অমন সঙ্গীত ওরা জীবনে কখনও শোনে নি।

মঞ্চের পর্দা উঠে যেতে আমরা দৃশ্যমান হলুম। তারপর পরিচয়, পুষ্পোপহার, গ্রন্থোপহার, অভিনন্দন, বক্তৃতা এই সব শুরু হয়ে গেল। প্রমাণ পেতে থাকলুম স্থানীয় বিদ্বজ্জনেরা ইতিমধ্যে কি রকম রবীন্দ্র ভক্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁরা কবিগুরুর বাংলা কবিতার চেক অনুবাদ পাঠ করতে থাকলেন। অবাক হয়ে শুনতে থাকল সকলে। কয়েক বছর আগেও এমনটি দেখিনি। সংস্কৃতি জিনিসটা উপর তলার মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। কাব্য পাঠ, সাহিত্য চর্চা, বিশেষ করে বিদেশী শিল্প সাহিত্য এ নিয়ে আপামর জনসাধারণ কবে মাথা ঘামিয়েছে? কিন্তু এবারকার এদের সমাজের চেহারা একেবারে আলাদা। হাটের মানুষ মাঠের মানুষ পর্যন্ত জাগ্রত উদ্বেল। সবাই খুঁজে পেয়েছে, রসের উৎস। শিখে ফেলেছে কেমন করে জীবনকে পূর্ণতরভাবে উপভোগ করা যায় তারই রহস্য।

বাগ্মীদের কাব্য পাঠ ও বক্তৃতা শেষ হবার পর আমি আবৃত্তি করলুম ও ভাষণ দিলুম। তারপর গৃহিণী তাঁর মুখ খোলবার সুযোগ পেলেন। লোকেরা অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে বসে ছিল। গৃহিণীর বক্তৃতা শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল প্রশ্নবাণ। কত কি যে এরা জানতে চায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, বাংলা দেশ

সম্বন্ধে, প্রশ্নের আর শেষ নেই। প্রশ্ন করে যেন চেখে চেখে দেখতে চায় অজানা রহস্যভরা দেশটাকে। ভারত সম্বন্ধে, ভারতের মহাকবি সম্বন্ধে এই যে তীব্র আগ্রহ এটা এসেছে সমাজের নব-জাগ্রত নিম্নতলের মানুষদের তরফ থেকে। আগে এদের ঔৎসুক্য ছিল ইংলণ্ড সম্বন্ধে, আমেরিকা সম্বন্ধে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতো পশ্চিমের আধুনিক দেশগুলোর ঐশ্বর্যের পানে। ওটাই এদের টানত। এখন টানে অন্য জিনিস। ধন ঐশ্বর্যের চটক চোখ থেকে মুছে গেছে। এখন খোঁজে প্রাণের ঐশ্বর্য। নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন ইঙ্গিত, নতুন আলো ভরা নতুন পথ এদের টানছে। এদিকে কিন্তু এই টানাটানির মধ্যে পড়ে আমাদের প্রাণ যায়। প্রশ্ন শেষ হতে না হতেই নতুন প্রশ্ন। উৎসাহের অন্ত নেই। রাত বেড়ে চলে, তবু রেহাই দেবে না। শেষে এগারটা বাজল। তখন অধ্যক্ষার সানুনয় অনুরোধে বেশ খানিকটা অনিচ্ছার সঙ্গেই আমাদের ক্ষান্ত দিলে।

স্টেজ থেকে বেরিয়ে হল্এ প্রবেশ করতেই দেখি বুড়ো-মত একজন লোক বই হাতে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। কাছে আসতে দেখি তাঁর হাতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের একখানা ছোটদের কবিতার বই 'কুমির ! কুমির !'

—কি ব্যাপার ? এ বাংলা বই আপনি কোথায় পেলেন ?

—আজ্ঞে আপনিই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমায় আজ প্রায় ন বছর আগে। আমি টাইখ্মান।

তখন মনে পড়ল। নিজে হাতে বই বাঁধাবার শখ আমার চিরকালের। পুরোনো ভালো বই যা ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছে তাদের যত্ন করে গেঁথে সেলাই করে মলাট দিয়ে নতুন করে দিতে আমার বড় ভালো লাগে, তা সে যার বই-ই হোক না। বই-এর মলাটের জন্যে, পুস্তুনির জন্যে ভালো কাপড় কাগজ দেখলে কিনে রেখে দিই। কাঠের ছাপ দিয়ে নিজে ছেপে নিই মলাটের কাগজ বা

কাপড়। জানতুম চিত্র-বিচিত্র মজবুত কাগজের জন্যে চেকো-স্লোভেকিয়ার খ্যাতি ছিল। তাই সেবারে যখন চেকোস্লোভেকিয়ায় এসেছিলুম, মনিহারী দোকান দেখলেই ঢুকে পড়তুম মলাটের কাগজের খোঁজে। কিন্তু যুদ্ধের ঠিক পরে দেশের এমনই অবস্থা যে কোনো শৌখিন জিনিসই খাওয়া যায় না তো রংদার বইএর মলাট। বেশীর ভাগ দোকানেই বলত নেই। তবু দু-একটা যা পেতুম তারই লোভে ঘুরতুম এখানে-ওখানে। কেমন করে যেন খবরটা রটে যায় যে আমি বই খাতার মলাট খুঁজে বেড়াচ্ছি। বিলেতে এসে লোকে ঘড়ি কেনে, ক্যামেরা কেনে, কলম কেনে, স্যুট কেনে, টাই কেনে, বইয়ের মলাট আবার কেনে কে? যাই হোক, সহানুভূতিপূর্ণ চেকরা যখন দেখল বিদেশী লোকটা মলাট খুঁজে বেড়াচ্ছে কিন্তু পাচ্ছে না, তখন কে যেন টাইখমানের কাছে সংবাদটা পৌঁছে দেয়। পৃথিবীতে শখ করে নিজে হাতে বই বাঁধায় এমন লোকের সংখ্যা খুব কম। প্রেরভে বোধ হয় ঐ একজনই—টাইখমান। বন্ধুরা দুই দপ্তরী পাগলের মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন আমি গিয়ে হাজির হয়েছিলুম টাইখমানের চারতলার ফ্ল্যাটে। তখন তাঁর বয়েস তেষট্টি। ভদ্রলোক পরের বই হাতের কাছে পেলে বাঁধিয়ে তো দিতেনই, এ ছাড়া তাঁর নিজের একটি লাইব্রেরির প্রত্যেকটি বই তাঁর নিজের হাতে বাঁধানো। বড় বা ভারি ভারি যন্ত্র কিছুই নেই। বাজারের দপ্তরীরা সাধারণত হাতে-চালানো যে সব যন্ত্র ব্যবহার করে তাই দিয়েই তিনি সারাদিন খুট খুট করে কাজ করতেন। আমাকে দেখে ভারি খুশী। এত দূর-দেশের শখের দপ্তরী—কোথায় আমায় বসাবেন ভেবেই পান না। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব কিছু দেখালেন। শেষে নিজের হাতের তৈরী মলাটের কিছু কাগজ আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন—এগুলি নিয়ে যান। আমি বললুম—না, না, এ আমি কি করে নিই? আপনাদের দেশে এখন মলাটের কাগজের যে রকম অভাব, আপনার চলবে কি করে?

টাইখ্‌মান বললেন—নিয়ে যান এগুলি স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। আমার আবার হবে। আমি জিজ্ঞেস করলুম—আপনাকে এর বদলে কি দিতে পারি? তিনি বলেছিলেন—আপনাদের দেশের বাঁধানো বই আমি কখনও দেখিনি। সুযোগ হলে তাই একটা পাঠিয়ে দেবেন। আপনার নিজের হাতে বাঁধাই বই চাইতে আমার সাহস হয় না। আমি বলে গিয়েছিলুম—বেশ পাঠিয়ে দেব নিশ্চয়ই। তার পরদিনই আমি চলে গিয়েছিলুম প্রেরভ থেকে। টাইখ্‌মানের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। আমার স্যুটকেসে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কুমির কুমির' বইখানা ছিল। সেটা কার হাত দিয়ে যেন টাইখ্‌মানের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। দেশে ফিরে গিয়ে টাইখ্‌মানের কথা মনেও পড়েনি, আমার নিজের হাতে বাঁধানো বই বা খাতা তাঁকে পাঠানোও হয়নি।

এই সেই টাইখ্‌মান। কুমির কুমির হাতে আমার সামনে দাঁড়িয়ে ন বছর বাদে প্রেরভ শহরের টাউন হলে। আমি প্রায় অভিভূত হয়ে বললুম—চিনেছি। এ বই আপনি এত দিন রেখে দিয়েছেন?

টাইখ্‌মান মাথা নীচু করে একটু হেসে বললেন—এতে কিছু লিখে বাংলায় সই করে দিন।

বইখানি তুলে নিয়ে আমি সাগ্রহে লিখলুম—বই বাঁধানোর শখ নিয়ে জন্মেছে পৃথিবীতে এমন লোক খুব বিরল। টাইখ্‌মান এঁদের মধ্যে অন্যতম। নিজে হাতে বই বাঁধানোয় যে কি বিশুদ্ধ আনন্দ তা যারা জানে তারাই জানে। ইত্যাদি। ইত্যাদি।

টাইখ্‌মানের কাছ থেকে ছাড়া পেতেই এক বুড়ি এগিয়ে এসে আমার পাঞ্জাবির হাতায় হাত বুলিয়ে দিল। বললে—এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলুম তোমায় কাছ থেকে দেখব বলে। তোমার বউটি গেল কোথায়? এখনও বেরচ্ছে না কেন?

আমি বললুম—অনেক রাত হল। এত রাতে কি আলাপন হয়?

বুড়ি বললে—শুধু কাছ থেকে একবার দেখব ঐ যে গায়ে কেমন করে পরেছে তোমাদের দেশের ঐ পোশাকটা ?

—শাড়ি ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ সাব্রি, সারি। কি চমৎকার জিনিস। অমন পোশাক হয় না।

বুড়িকে পাশ কাটিয়ে আরো খানিকটা ভিড় ঠেলে আমার পুরোনো বন্ধুদের খোঁজে এগোলুম। তাঁদের অনেকেই আসবেন শুনেছিলুম। দেখি এক জায়গায় দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে অটা। সঙ্গে তার স্ত্রী এবং শ্যালিকাবৃন্দ। অটাকে বললুম—ভাই, শীগগির কফি খাওয়াও, নইলে আর দাঁড়াতে পারছি না।

টাউন হলের নীচের কফিখানায় গিয়ে বসলুম সবাই মিলে। খানিক পরে বুড়ো-বুড়িদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে গৃহিণী এসে আমাদের দলে যোগ দিলেন। অধ্যক্ষা এসে বললেন—আপনাদের বড়ই কষ্ট দিলুম। কিন্তু এ রকম ঘটনা প্রেরভ শহরে খুব কমই ঘটেছে। আমরা বললুম—শহরের মানুষদের উৎসাহের ফলেই এই সফলতা। নইলে কি আর এমনটা হত ? কষ্ট আবার কি ? আনন্দ পেলুম আমরা ; আনন্দ করলুম সবাই মিলে।

অধ্যক্ষা অন্তর্হিতা হলেন। আমরা কফি পান শেষ করে অটা এবং অন্যান্য বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাত বারোটায় বাড়ি ফিরে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লুম।

॥ ১৫ ॥

পরদিন গৃহিণীর বক্তৃতা দিতে যাবার কথা ছিল 'স্টেনবার্গ' নামে পাহাড়তলির এক ছোট্ট শহরে। প্রেরভ থেকে এক ঘণ্টার পথ। স্থির হল, আমিও যাব। তবে ধুতি-চাদর পরে আর নয়। যা শীত পড়েছে, বেশী বাড়াবাড়ি করতে গেলে শেষটা হাসপাতালে

ছুটতে হবে। স্টের্নবার্গ শহরটি সীমান্তের কাছে। শহর ভরা ছিল সুডেটেন জার্মান। এখন আর একটিও নেই। সব চলে গেছে জার্মানীতে। চারিপাশের যত গ্রাম তা-ও ছিল সুডেটেন জার্মানদের। খালি হয়ে গিয়েছিল একেবারে। এখন ধীরে ধীরে চেক অধিবাসী দিয়ে ভরা হচ্ছে। স্টের্নবার্গে মস্ত এক ঘড়ির কারখানা আছে। সেইখানেই আমাদের নিমন্ত্রণ এবং অধিবেশন। এখন যেখানে ঘড়ির কারখানা, আগে সেখানে ছিল মস্ত এক সিগারেটের কারখানা। স্থানীয় বড়লোকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কারখানার মজুর মজুরানীরা বেতন পেত নিম্নতম হারে। অতি দরিদ্র অবস্থা ছিল তাদের। যুদ্ধের পর কারখানা বাজেয়াপ্ত হয়। শহর গ্রামের অধিবাসীরা চলে যাবার পর কারখানা আর খোলা হয়নি। শহরের জীবন যখন আবার চালু হল তখন সিগারেটের কারখানা নিয়ে কি করা যায় এই প্রশ্ন উঠল। দেশে যত সিগারেটের কারখানা আর তাদের যা উৎপাদন তা দেশের পক্ষে যথেষ্ট। এখন আবার নতুন কারখানা খোলা মানে জাতীয় মূলধন নষ্ট করা। তার চেয়ে দেশে ঘড়ির যখন অভাব, ঘড়ির কারখানা খোলা হোক। লোক কোথায় পাওয়া যায়? আগেকার দিনে শহরের মধ্যে বস্তি ছিল, সেখানে মজুররা থাকত। মজুর সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল হাতের কাছেই। সে সব বস্তি ভেঙে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছে। আজকাল এই সমাজতান্ত্রিক যুগে কোনো কারখানার মজুরই বস্তিতে থাকে না। কাজেই কারখানা থেকে বড় বড় বাস নিযুক্ত করা হল আশপাশের গ্রাম থেকে মজুর এবং মজুরানীদের যাওয়া আসার সুবিধা করে দেওয়ার জন্য। কারখানা চলেছে খুবই ভালো। নতুন উৎসাহ নিয়ে সবাই খাটছে। কারখানা তো নিজেদের— খাটবেই বা না কেন? উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভাল কাজ দেখিয়ে এ বছর কি একটা জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। তাই নিয়ে ওদের ভারি গর্ব। এই কারখানার মজুররা আমাদের নিমন্ত্রণ

করে নিয়ে চলেছে রবীন্দ্রনাথ তথা বাংলা দেশ সম্বন্ধে কিছু শোনবার জন্যে।

বিকেলে চা খাবার পর রওনা হলুম স্টের্নবার্গের পথে। আজকের রাতটা স্টের্নবার্গেই কাটাতে হবে। ট্রেনে উঠে একটা কোণ বেছে নিয়ে বসলুম। বিশেষ ভিড় ছিল না। ধীরে ধীরে চলেছে প্যাসেঞ্জার ট্রেন। ঝাঁকুনিতে ঘুম পেয়ে আসছে। যেই একটু ঝিমুনি এসেছে অমনি শুনি পাশের বেঞ্চি থেকে এক ভদ্রলোকের চড়া গলা। কি একটা উত্তেজনাকর বিষয় নিয়ে জোর আলোচনা চলেছে। কানে আসতে থাকল কথাগুলো। গৃহিণীও দেখলুম সজাগ হয়ে উঠেছেন। বললেন—আমাদের সম্বন্ধে কথাবার্তা হচ্ছে।

আমি বললুম—সর্বনাশ, এরা আমাদের চিনতে পেরেছে না কি?

—না, চিনতে পারেনি এখনও। আমাদের দিকে লক্ষ্য করেনি। তুমি বরং মাথার টুপিটা টেনে দিয়ে বোসো।

কালকের রাতের সভা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

একজন বৃদ্ধ হাত-পা নেড়ে বলছিলেন—আমার ছেলে তো স্কুলে রুশ ভাষা পড়ায়, তারই কাছে শুনেছি একটা ভাষা থেকে আর এক ভাষায় বিশুদ্ধ তর্জমা করা মোটেই সহজ নয়।

যে দুজন শুনছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন বললেন—ঠিক বলেছেন।

—ইণ্ডিয়ার কবির কবিতাগুলো কী চমৎকার চেক ভাষায় বলে গেল আমাদের প্রেরভের অমুক। কী অনুবাদই করেছে! বোঝো তাহলে দুটো ভাষারই উপর কি রকম তার দখল।

আমরা শিউরে উঠলুম! ডাঃ লেস্‌নি আর ডাঃ জ্‌বাভিটেলের বাংলা থেকে চেক তর্জমা দিব্যি ঐ ভদ্রলোকের করা অনুবাদ হিসেবে চলে গেল দেখে।

—ঠিক বলেছেন। অনুবাদের কথা ছেড়ে দিন। আমাদের

নিজেদের ভাষা বেশ ভাল করে বলতে পারে এমন লোকই বা কটা আছে বলুন তো ?

—আরে কাল তো আপনারা টাউন হলের উৎসবে এলেন না। এলে ভালো করতেন।

—কি হল বলুন তো ?

—ঐ সিকোরাদের বাড়ির মেয়ে—কটা ভাষা জানে খবর রাখেন ?

এইবার গৃহিণী এলেন আলোচনার মধ্যে। আমরা আরো গুঁড়ি মেরে বসলুম।

—কোন সিকোরা ?

—আহা ত্রাভনিক রাস্তার ক্লিমেণ্ট সিকোরা।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি বটে ক্লিমেণ্ট সিকোরার বড় মেয়ের কথা।

—সেই মেয়ে ছেলেবেলাতেই চলে গেল ইংলণ্ডে পড়তে। তারপর থেকে বিদেশেই ঘুরছে। অ্যাদ্দিন পরে দেশে এল। কাল দারুণ বক্তৃতা দিয়েছে টাউন হলে। কটা ভাষায় কথা কইতে পারে জানেন ? আটাশটা।

এবারে একেবারে ইলেকট্রিক শক্। আমি প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলুম। কোনো রকমে সামলে নিলুম নিজেকে। গৃহিণী মাতৃভাষা ছাড়া ইংরিজী আর জার্মানটা জানেন। বাংলা তো জানেনই। এই হল আটাশ।

—বলেন কি ? প্রেরভের মেয়ে, এতগুলো ভাষা ?

—বুঝতেন কাল গেলে।

—তা বক্তৃতা কি রকম হল ? চেক ভাষাতেই বললেন তো তিনি ?

—তা তো বটেই। চেক ছাড়া আর কি বলবেন ? মাতৃভাষা। আর আমাদের তো বোঝা চাই। কিন্তু যখন যে ভাষায় বলুন অনুবাদ করে দিতে পারেন।

—তা, কি বিষয়ে বললেন? কেমন হল বক্তৃতা?

—ইণ্ডিয়ার সাহিত্য নিয়ে বক্তৃতা হল আর কি। যেটা বললেন সেটা আমার তেমন কিছু ভালো লাগেনি, কিন্তু তার পর! প্রশ্নের যখন উত্তর দিতে শুরু করলেন সে একটা শোনবার মত। আপনারা না এসে খুব ভুল করেছেন।

—অ্যাঁ, বলেন কি? গেলে হত তাহলে। সিকোরাদের মেয়ে তো? বিয়ে করেছেন?

—বিয়ে করেছে বই কি। এই তো সেদিন তার মেয়ে প্রেরভের রাস্তায় ঘুরছিল। বেশ মেয়েটি।

—বাপকে দেখেছেন নাকি?

—হ্যাঁ মশায়। কালই তো তিনি ইণ্ডিয়া থেকে এরোপ্লেনে করে প্রেরভে এসে পৌঁছলেন। একেবারে খাস ইণ্ডিয়ার পোশাক পরে সোজা চলে এলেন টাউন হলে।

—কি রকম পোশাক বলুন তো?

—পোশাকটা ঠিক বুঝতে পারলুম না।

ধুতি চাদর পরে উদিত হওয়ার ফলে প্রেরভের মানুষের মনে কি ভাবের আবির্ভাব হয়েছে তার খানিকটা পরিচয় পেলুম।

পরের স্টেশানে দুজন নেমে যেতে আবার ট্রেন চুপচাপ হয়ে গেল। আমরা হাসি চাপতে পথ পাই না।

স্টের্নবার্গে পৌঁছলুম সন্ধ্যের মুখে। স্টেশানে নামতেই এক অচেনা ভদ্রলোক এসে বললেন—আপনারাই গাঙ্গুলি? আসুন, গাড়ি এনেছি।

আমরা ধন্যবাদ জানাতে বললেন—আপনাদের হোটেলে পৌঁছে দিই আগে। হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নিন কিছু। সাতটার সময় গাড়ি আবার যাবে আপনাদের আনতে।

গাড়িতে উঠে জিজ্ঞেস করলুম—কোথায় হবে আজকের জলসা?

—কেন, আমাদের ট্রেড ইউনিয়ানের আপিস বাড়িতে।

—ট্রেড ইউনিয়ানের আপিস? সেখানে বড় হল আছে তো?

—চলুন না দেখবেন। শুধু হল কেন, অনেক কিছুই আছে। থিয়েটারের ব্যবস্থা, সিনেমার ব্যবস্থা, বক্তৃতার ব্যবস্থা, নাচ গানের ব্যবস্থা, ভোজের ব্যবস্থা, কি নেই?

এই এদের এক মস্ত সুবিধে। আমাদের দেশের কারখানার মজুরদের ট্রেড ইউনিয়ান তো নয় যে একখানা এঁদোপড়া ঘর নিয়ে দরজার বাইরে 'অমুক কোম্পানী ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশান' নোটিস টাঙিয়ে কর্তৃপক্ষের রোষ এড়িয়ে কোনরকমে টিঁকে থাকবে। এখানে কর্তৃপক্ষ আর কর্মী-পক্ষ সম-আসনে স্থাপিত। কারখানার লাভের সবটাই কর্মী-পক্ষে অর্শায়, তাই কর্মীদের ইউনিয়ানের টাকার অভাব নেই। শ্রমিকদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচুর ব্যবস্থা তাই এরা করতে পারে। কাজেই ইউনিয়ানের আপিস শুধু একটা ঘর নয়, রীতিমত একটা বাড়ি। বড় কারখানার ইউনিয়ান হলে প্রাসাদ। এরাই আবার শ্রমিকদের ছুটির সময় দেশের নানা স্থানে, দেশের বাইরে নানা স্থানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে। যেহেতু চেকো-স্লোভেকিয়ার সহস্র সহস্র কিলোমিটার সীমান্তের মধ্যে আধ-কিলোমিটারও সমুদ্রের ধারে পড়ে না, তাই প্রতি চেক বাসিন্দার জীবনের সাধ—অন্তত একবার সমুদ্র দেখবে। প্রতি বছর গ্রীষ্মের সময় তাই দলে দলে চেক কারখানার শ্রমিকেরা নিজেদের ইউনিয়ানের বড় বড় বাসে চড়ে বেড়িয়ে পড়ে উত্তর জার্মানী বা উত্তর পোলাণ্ডের সমুদ্র দেখতে। কেউ কেউ চলে যায় সোভিয়েটের কৃষ্ণসাগর তীরে। হলেই বা বদ্ধ সাগর, তবু সাগর তো।

হোটেলে এসে পৌঁছলুম। শহরের ঠিক মাঝখানে হোটেল। এই একখানিই ফার্স্ট ক্লাস হোটেল শহরে আছে। আমাদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরো একদল অতিথি এসে হোটেলে পৌঁছলেন। তাঁদের সঙ্গে নানারকম বাদ্য যন্ত্র। শুনলুম আজ শহরে ছুটি

বিখ্যাত কনসার্টের দল এসে পৌঁচেছে। শহরের দুটি কনসার্ট হলে আজ শহরের লোক ভেঙে পড়বে।

গৃহিণীকে বললুম—তবেই হয়েছে। আজ তোমার বক্তৃতায় লোক হয় কি না দেখ। ভালো ভালো কনসার্ট ছেড়ে কে আর রবীন্দ্র-বিষয়ক বক্তৃতা শুনতে আসবে? গৃহিণীও দেখলুম একটু ভাবনায় পড়লেন।

জিরিয়ে নিয়ে হোটেলে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা গিয়ে হাজির হলুম ঘড়ি-কারখানার ট্রেড ইউনিয়ান আপিসে। প্রেরভের টাউন হলের তুলনায় কিছুই নয়, কিন্তু বেশ মস্ত ঘর। সুন্দর করে সাজানো। ঘরের এক দিকে 'সিনে' প্রোজেকটার, অপর দিকে একটি রূপোলী পর্দা তৈরি। গৃহিণী ভারত রাজদূতের দপ্তর থেকে একখানা বাংলা দেশের ফিল্ম ধার করে এনেছিলেন। তাই দেখানো হবে।

আমরা যখন ঢুকি তখন বিশেষ লোক ছিল না। কিন্তু দেখতে দেখতে ঘর ভরে গেল। এদের উৎসাহের অন্ত নেই। ঐটুকু তো শহর। কারখানাও এমন কিছু বড় নয়। তবু মনে হয় শহরে তিনটে কেন, দশটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও যদি এক সঙ্গে হয় কোনোটাতে দর্শক এবং শ্রোতার অভাব হবে না। অবকাশকে কেমন করে উপভোগ করতে হয় এরা জানে।

গৃহিণীর বক্তৃতার ফল এবারেও আগের মতো। শ্রোতাদের মনে জেগে উঠল নানা রকম প্রশ্ন। প্রশ্ন করতে এরা শিখেছে। প্রশ্ন করতে এরা জানে। প্রশ্নের উত্তর আদায় করে তবে ছাড়ে। শিক্ষা এবং সংস্কৃতির এই নব-উন্মেষ মনকে নাড়া দিয়ে যায়।

সেদিন বক্তৃতা শেষ হবার পর আমরা বললুম—এলুম, আপনাদের কারখানা দেখে যাবো না?

ওঁরা বললেন—এ অতি উত্তম কথা। তাহলে কালকের দুপুরটা কাটিয়ে যান। ভাল করে কারখানা দেখিয়ে দিই আপনাদের।

কিন্তু দুপুর কাটানো আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। দুপুরের ট্রেনেই ফিরতে হবে প্রাহায়। সে কথা তাঁদের বললুম। হিসেব করে দেখা গেল, সকালের ট্রেনে যদি আমাদের প্রেরভে ফিরে প্রাহার ট্রেন ধরতে হয়, তাহলে বড় জোর আধ ঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে কারখানা দেখবার।

বললুম—নেই মামার চেয়ে কানা মামাই ভালো।

পরদিন সকালে উঠে বাক্স পেঁটরা বেঁধে হোটেলের খাবার ঘরে বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিলুম। হোটেলের অন্য অতিথিরা তখনও কেউ ওঠেন নি—হয়তো রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে অবসন্ন। আমাদেরই শুধু তাড়া সকাল সকাল ঘড়ির কারখানা দেখে বাড়ি ফেরার—তাই ভোর ভোর উঠেছি। খাবার ঘর একেবারেই খালি। বাইরেকার দরজা ঠেলে একজন ভদ্রলোক ঢুকলেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে সোজা আমাদের টেবিলের কাছে এসে বললেন—ঘড়ির কারখানায় আপনাদের নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ি নিয়ে এসেছি।

আমরা বললুম—বেশ তবে আমাদের সুটকেসটা স্টেশানে পাঠিয়ে দিয়ে আপনার গাড়িতে এসে আমরা উঠছি। একটু বসুন।

তিনি বললেন—সুটকেস স্টেশানে পাঠাতে হবে না। আমার গাড়িতে তুলে দিতে বলুন। কারখানা দেখিয়ে আপনাদের আমি প্রেরভে পৌঁছে দেব আমার গাড়ি করে। এতে অনেকখানি সময় বাঁচবে। আপনারা ভালো করে কারখানা দেখতে পাবেন।

কারখানার ফটকের সামনে প্রহরী কাঠের ডাণ্ডা আড়াআড়িভাবে ফেলে দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা আসতেই ডাণ্ডা উঠিয়ে নিলে। আমরা ভিতরে প্রবেশ করলুম। কর্তা-ব্যক্তি একজন এসে আমাদের খাতির করে বাড়ির মধ্যে টেনে নিয়ে গেলেন।

নীচের তলায় যে ঘরে আমরা ঢুকলুম সেখানে শুধু মেয়েরা কাজ করে। বেশীর ভাগই কমবয়সী মেয়ে—আঠারো থেকে পঁচিশ বছরের। কিছু কিছু আছেন ত্রিশ থেকে চল্লিশ। আমরা আসব,

সুপারভাইজার গিন্নী বোধ হয় জানতেন। আমরা ঢুকতেই তিনি এগিয়ে এসে আলাপ করলেন, তারপর চেঁচিয়ে বললেন—মেয়েরা কাজ বন্ধ কর। কলের সুইচ নিভিয়ে দাও। সুদূর ভারত থেকে অতিথি এসেছেন। এস মেয়েরা, দেখে যাও!

প্রত্যেকটি যন্ত্রের নীচে বসে একটি তুটি করে মেয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজ করছিল। কলের ঘর্ঘর শব্দে সমস্ত ঘর মুখরিত। আমাদের প্রবেশ তারা কেউই বোধ হয় লক্ষ্য করেনি। সুপারভাইজারের আহ্বানে এবং বিজলী বন্ধ করার ফলে সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা সবাই টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘিরে এল আমাদের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে টুকিটাকি প্রশ্ন।

যিনি আমাদের নিয়ে ঘুরছিলেন, গৃহিণী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—এঁরা কি কাল আমাদের বক্তৃতায় যাননি?

ভদ্রলোক বললেন—কারখানার সব বিভাগকে বললে কাল আর হলএ জায়গা হত না। তাই কিছু কিছু বিভাগকে বাদ দিতে হয়েছে। তাদের খবরও দিই নি। আজকে এরা শুনে এবং আপনারা আসবেন জেনে অবধি সকাল থেকে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে আপনাদের দেখবে বলে। তাই এই ঘরেই প্রথম আপনাদের নিয়ে এলুম।

হঠাৎ ফ্ল্যাশ! আমাদের ছবি উঠে গেল। মেয়েরা হাত ধরে টানে—বলে—আমার কলের সামনে আসুন; আমার কলের সামনে আসুন। একটা যন্ত্রের সামনে দাঁড়াই আর একটা করে ফ্ল্যাশ।

দু তিন মিনিটের মধ্যে গোটা দশ বারো ছবি তোলা হয়ে গেল। তখন মেয়েরা আবার গিয়ে বসল যে যার টুলে। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম কে কি কাজ করছে।

একখানা ঘড়ির মধ্যে অনেকগুলি অংশ—ঘড়িখানাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করলেই বোঝা যায় কতগুলি। এর প্রত্যেকটি অংশ

কলে তৈরি হয়। এক একটা ছোট ছোট অংশের জন্যে এক একটা বড় বড় যন্ত্র। প্রত্যেক যন্ত্রের সামনে একটি করে মেয়ে। ছোট্ট খুদে একখানি জিনিস নিয়ে হাতে করে বসাচ্ছে কলের ঠিক মাঝখানে। পা দিয়ে টিপছে একটা পা-দানি। বিজলী শক্তি এসে ঢুকছে কলের মধ্যে আর উপর থেকে কি একটা নেমে এসে হয় কুট করে কেটে দিচ্ছে, নয় খুট করে জুড়ে দিচ্ছে। প্রত্যেক কলেই এই—হয় কাটা নয় জোড়া। কলেই হচ্ছে, মেয়েরা শুধু হাতে করে বসিয়ে দিচ্ছে আর পায়ে করে টিপছে।

জিজ্ঞেস করলুম—এই যে মেয়েরা কাজ করছে, এদের কতদিনের ট্রেনিং?

—কতদিনের আবার? স্কুল থেকে বেরিয়ে এখানে আসে। একমাস দেড়মাসের মধ্যেই কল চালাতে শিখে যায়।

দেখলুম সত্যি কলই সব কাজ করে। মেয়েদের কাজ শুধু হাত দিয়ে যোগান দেওয়া আর পা দিয়ে কল টেপা। এমনি আরো অনেকগুলি ঘর আছে সেগুলিতে আমরা গেলুম না, ঢুকলুম গিয়ে কণ্ট্রোলের ঘরে। ঘড়ির টুকরো অংশগুলি সব যন্ত্র থেকে বেরিয়ে এসে এই ঘরে জমা হয়। এদের প্রত্যেকটি টুকরো অতি সূক্ষ্মভাবে মাপবার ব্যবস্থা এই কণ্ট্রোল ঘরে আছে। কারুর দৈর্ঘ্য, কারুর প্রস্থ, কারুর ওজন কারুর বা সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মাপা হচ্ছে। এক চুল এদিক-ওদিক হলেই বাতিল। এইভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বেছে বেছে শুধু খাঁটি টুকরোগুলিকে এক পাশে জমা করা হচ্ছে। শুধু এইগুলিই ব্যবহার হবে ঘড়ি তৈরির কাজে।

মেয়েরা সবাই মাইনে পায় পীস্ রেটে। যে যত টুকরো জিনিস তৈরি করবে সে তদনুপাতে টাকা পাবে। বেশী উৎপাদন করলে বেশী রোজগার, কম উৎপাদন করলে কম। উৎপাদনের ও আয়ের হার এমনইভাবে বাঁধা যে যারা খুব চটপটে নয় তারাও বেশ স্বচ্ছল ধরনের উপায় করতে পারে। আমাদের দেশে এই পীস রেট নিয়ে

কত মারামারি। শ্রমিকেরা সাধারণতঃ পীস্ রেট পছন্দ করে না। কর্তৃপক্ষ সব সময় পীস্ রেট চাপানোর পক্ষপাতী। শ্রমিকের সব সময় সন্দেহ কর্তৃপক্ষ এমনইভাবে রেট বেঁধে দেবেন যে শ্রমিকদের মুখের রক্ত উঠিয়ে উৎপাদন বাড়িয়ে গেলেও তাদের রোজগার বাড়বে না। এ দেশে কিন্তু পীস্ রেট নিয়ে কোনো কথা ওঠে না। সবাই এই পদ্ধতিতে খুশী। তার কারণ রেট বাঁধবার সময় শ্রমিকদের পরামর্শ নেওয়া হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সব দিক থেকে বিচার করে শ্রমিকেরা নিজেরাই নিজেদের রেট বেঁধে দিয়েছে। তাই এ নিয়ে কোনো বিরোধ হয় না। যে কাজে যেমন আয় হওয়া উচিত তেমনই হয়।

অবশেষে আমরা অ্যাসেম্বলি কারখানায় ঢুকলুম। ঘড়ির সব কটা অংশ এইখানে এসে জমা হচ্ছে এবং সেই বিভিন্ন অংশগুলি একের সঙ্গে এক জুড়ে এক একটি সম্পূর্ণ ঘড়ি হয়ে বেরিয়ে আসছে।

সেদিন অ্যাসেম্বলি কারখানায় তৈরি হচ্ছে একটি সবুজ রঙের হালকা টেবিল ঘড়ি। আনকোরা নতুন ডিজাইন। চমৎকার দেখতে। শুনলুম এ ঘড়ি এখনও চেকোস্লোভেকিয়ার বাজারে ছাড়া হয়নি। শুধু রপ্তানির জন্যে বানানো হচ্ছে। ঘরে আমরা যেমন আট-পৌরে কাপড় পরি আর বাইরে বেরতে গেলে শাল দোশালা চাপাই, তেমনি চেকোস্লোভেকিয়ার ব্যবসায় নীতিতে বলে—ঘরের জন্যে যেমন-তেমন মাল কিন্তু বিদেশে রপ্তানির জন্যে সবসেরা জিনিস। যেমন সরু তেমনি লম্বা ঘরখানা। ঘরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে একটা চওড়া ঘুরন্ত ফিতে। 'কনভেয়ার বেল্ট'। এই বেল্ট ঘুরে চলেছে সমস্তক্ষণ। তারই পাশে টুলের উপর সারি বেঁধে বসে আছে একজনের পিছনে আর একজন, ছত্রিশটি মেয়ে। ঘড়ির অংশগুলি জোড়া লাগতে লাগতে এগিয়ে আসছে একজনের কাছ থেকে আর একজনের কাছে ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ ঘড়ির রূপ পেতে পেতে। বেল্টের প্রারম্ভে শুধু একখানি অংশ—লোহার

কি একটা—বোঝাই যায় না ঘড়ির কিছু। তার সামনের মেয়েটির কাছে পৌঁছতেই কি একটা তার সঙ্গে জুড়ে গেল। তারপর আরও একটা। তারপর আরও একটা। এইভাবে ছত্রিশটা অংশ। বেল্টের ধার দিয়ে চলতে চলতে আমরা দেখতে লাগলুম কেমন করে আস্তে আস্তে ঘড়িটা আকৃতি লাভ করছে। আধপথ চলে হঠাৎ শুনি টুক্‌টাক্ শব্দ। কি ব্যাপার ? সে টেবিলে দেখি ঘড়িতে প্রাণ দেওয়া হচ্ছে। একটুখানি স্প্রিং গুটিয়ে জুড়ে দিলেই ঘড়ির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। বাস, চললো তার ধুকপুকুনি জীবনের শেষ পর্যন্ত। কনভেয়ার বেল্টের এক প্রান্ত থেকে শেষ প্রান্তে পৌঁছতে আধ মিনিট মাত্র সময় লাগছে। তার মানেই মিনিটে দুখানা করে ঘড়ি তৈরি হচ্ছে।

অ্যাসেম্বলি কারখানার সুপারভাইজার এগিয়ে এসে গৃহিণীকে বললেন—কাল আপনার বক্তৃতা শুনে বড়ই উপকৃত হয়েছি। তার বিনিময়ে সামান্য স্মৃতিচিহ্নরূপে এই ঘড়িখানি আপনাকে দিচ্ছি।

বলে শো কেস থেকে প্রকাণ্ড একখানা হাল-ফ্যাশানের দেয়াল ঘড়ি টেনে বার করলেন।

গৃহিণী হাঁ হাঁ করে বলে উঠলেন—করেন কি ? করেন কি ? এত বড় ঘড়ি নিয়ে আমরা করব কি ? এ যে রাজপ্রাসাদে রাখবার মত জিনিস। তা ছাড়া আমরা করলুমই বা কি যে তার জন্যে এমন দামী উপহার আমাদের দিচ্ছেন ?

যে ভদ্রলোক আমাদের নিয়ে ঘুরছিলেন তিনি সুপারভাইজারকে বললেন—ওটা এখন রেখে দিন। অত বড় ঘড়ি ওঁদের নিয়ে যাওয়ার অসুবিধে হবে। ওঁদের জন্যে আমি এই ঘড়িটা রেখেছি।

বলে পকেট থেকে যে সবুজ ঘড়ি মিনিটে দুখানা করে তৈরি হচ্ছিল তারই একখানা বার করে দেখালেন।

—রেখে দিন এটা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। ফিরিয়ে দেবেন না।

এটাকেও প্রত্যাখ্যান করা আমাদের পক্ষে শক্ত হল। সৌহার্দ্য

চিহ্ন হিসেবে ঘড়িটা আমরা গ্রহণ করলুম। স্টের্নবার্গ কারখানার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ সে ঘড়ি আজও আমাদের কাছে আছে।

॥ ১৬ ॥

প্রাহায় ফিরে এসে আবার কাজের মধ্যে ডুবে গেলুম। অবসর সময়ে প্রাহার পথে পথে ঘুরে বেড়াই, দোকানে নতুন কি জিনিস উঠল কাঁচের জানলায় উঁকি মেরে দেখি। একদিন চোখে পড়ল 'ভজিচ্ কোভা' রাস্তায় একটি মস্ত বাড়ি, তার গায়ে লেখা রয়েছে 'ডায়েট আকাদেমি'। বিজ্ঞান আকাদেমিও নয়, শিল্প আকাদেমিও নয়—খাবার আকাদেমি। বিশ্বাস না হয় ভজিচ্ কোভায় গিয়ে দেখে আসুন। ডায়েট আকাদেমির প্রকাণ্ড এক খাবার হল—আকাদেমির উপযুক্ত বটে। দেখেই আমার জিভে জল ঝরতে আরম্ভ করেছে। মানুষের শরীর-গ্রাহ্য রসনা-গ্রাহ্য খাবার নিয়ে গবেষণা করছে এরা, সুতরাং না জানি কি চমকপ্রদ খাবারই সব তৈরি করে ফেলেছে। কম্পিত পদে আকাদেমির খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। ঢুকে দেখি এক তাজ্জব ব্যাপার। দেয়ালে দেয়ালে নোটিশ ঝুলছে। প্রত্যেক নোটিশের তলায় কতকগুলি করে টেবিল আর চেয়ার। কোনো নোটিশে লেখা—এখানে পেটের অসুখের খাবার। কোনো নোটিশে লেখা—এখানে যকৃতের অসুখের খাবার। অথবা পক্ষপাত অসুখের খাবার। কোথাও ব্লাড প্রেশারের, কোথাও বাতব্যাধির, কোথাও হাঁপানির। ঘরের একটা বড় অংশে মোটা হবার খাবার। শক্ত শক্ত চেক ভাষায় লেখা—বোঝাই মুশকিল। এক জায়গায় মনে হল রোগা হবার খাবারও আছে। তনিমা দেবী থাকলে তাঁর কাজে লাগত! নানারকম অসুখে-ভোগা লোক এখানে আসে ডায়েট খাবার জন্যে। ডায়েট খেয়ে খেয়ে অসুখ সারায়। কোন অসুখের পর কোন ডায়েট খেতে হবে এ সব এরা জানে। এসব নিয়ে এরা চর্চা করে।

ভয়ে ভয়ে খাবার ঘরে ঢুকেছি। কোন অসুখ আমার সারাবো তা-ও জানি না। কত বছর আগে ম্যালেরিয়া হয়েছিল, বেরি বেরি হয়েছিল, কবে সেরে গেছে তার ঠিক নেই। প্রাণপণে ভাববার চেষ্টা করতে লাগলুম, একটা কোনো অসুখের কোনো রেশ বা কোনো লক্ষণ কি নেই আমার দেহে, যার বলে এই দেবরাজ্যে আমি প্রবেশাধিকার পাই? কিন্তু কিছুই খুঁজে পেলুম না। ঘরে যাঁরা প্রবেশ করছেন তাঁদের মুখের দিকে তাকালুম যদি কিছু ইঙ্গিত পাই। কারুর মুখের রং রক্তহীন, কারুর সবজেটে, কারুর গাল বসে গেছে, কেউ ঝুঁকে পড়েছেন, কারুর দৃষ্টি ক্ষীণ, কেউ লাঠি ধরে হাঁটছেন আবার তারই মধ্যে অনেকে দিব্যি সুস্থ চেহারার। কে যে কোন অসুখে ভুগে উঠেছেন কিচ্ছু বোঝবার উপায় নেই। এমনও হতে পারে যে যাঁদের চেহারার মধ্যে জরা লক্ষিত হচ্ছে, তাঁদের এমন কিছুই হয়নি। আবার যাঁদের বেশ তালেবর চেহারা তাঁরাই টি বি প্রকৃতি ভয়ঙ্কর রোগে ভুগছেন। কিচ্ছু বলা যায় না। কি করি ভাবছি, ঢুকে যখন পড়েছি, বেরিয়ে তো আসা যায় না, কাজেই এগিয়ে গেলুম যেখানে খাবারের টিকিট বিক্রি হচ্ছে সেই দিকে। ভয় হতে লাগল, এই বুঝি কেউ এসে হঠাৎ নাড়ি টিপে জিজ্ঞেস করে বসে—দেখি কি অসুখ করেছে আপনার? কিন্তু সে রকম কিছুই হল না। কাল্পনিক সব বিপদ কাটিয়ে টিকিট-গিন্নীর সামনে এসে পড়লুম।

—কি টিকিট চাই বলুন?

সর্বনাশ! এইবার তো একটা অসুখের নাম না করলে আর চলে না। কিন্তু কিসের যে নাম করি কিচ্ছু মাথায় এল না। এমন ঘুলিয়ে গেল যে মনুষ্যদেহের হাজার ব্যাধির সম্পূর্ণ তালিকাটাই আমার মনের পর্দা থেকে বেবাক মুছে গেল। আমি ধরা গলায় বললুম—আমার কোনো অসুখই নেই। বলে দরজার দিকে একবার তাকালুম এবং প্রস্তুত হয়ে রইলুম মহিলা অঙ্গুলি উত্তোলন করলেই

লম্বা লম্বা পা ফেলে সেই দিকে অন্তর্ধান হব। আর এ মুখো হব না।

কিন্তু মহিলা সামান্য একটু অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটি ছোট্ট টিকিট এগিয়ে দিয়ে বললেন—সাড়ে সাত ক্রাউন।

আমি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সাড়ে সাত ক্রাউন বার করে দিলুম। ছোট্ট টিকিটটা দু আঙুল দিয়ে তুলে নিতেই মহিলা হাত তুলে দেখিয়ে দিলেন—ঐখানে ব স্থন গিয়ে

সবাই দেখলুম, মাঝখানের বড় একটা টেবিল থেকে প্লেট, চামচ, কাঁটা, ছুরি আর কাগজের ন্যাপকিন তুলে নিয়ে খাবার টেবিলে নিজের নিজের জায়গায় এনে সাজাচ্ছেন। এ সব নিজে হাতেই করতে হয়। কাজেই আমিও ছুরি কাঁটা ইত্যাদি তুলে নিয়ে মহিলার নির্দেশিত টেবিলগুলির মধ্যে থেকে একটি বেছে নিয়ে গিয়ে বসলুম। প্লেট ছুরি সাজিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখি যে যে -নোটিসটি ঝুলছে তাতে লেখা রয়েছে—'মোটা হবার ডায়েট'। হুঁ, সাধারণ চেক্‌দের তুলনায় আমার দেহের যা অনুপাত তা এক নজরে দেখেই বোধ হয় মহিলার মনে কোনো দ্বিধারই অবকাশ ঘটেনি যে কোন টেবিলে আমায় পাঠাবেন। আশপাশের চেক্‌দের সঙ্গে আমার দৈহিক গঠনের তুলনা করে দেখছি মনে মনে, সেই সময় কে একজন ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে টিকিটটা নিয়ে প্লেট-ভরা চমৎকার সুগন্ধী খাবার সামনে রেখে চলে গেলেন। আমি তুলনা-বিচার ত্যাগ করে খাওয়ায় মনোনিয়োগ করলুম। দু এক টুকরো মুখ-গহ্বরে প্রবেশ করতেই একেবারে নিমগ্ন হয়ে গেলুম ভোজনরসে। এমন সরেশ রান্না চেকোস্লোভেকিয়ায় এসে খুব কমই খেয়েছি। আকাদেমির বাহাদুরী আছে। সেই থেকে অনেক বন্ধুকে বলে বেড়িয়েছি—প্রাহায় যদি যায় তো ভজিচ্‌কোভা রাস্তার ডায়েট আকাদেমির খাবার যেন একবার চেখে দেখে—মোটা হবার ডায়েট।

রোগা হবার ডায়েট কেমন এখনও খেয়ে দেখিনি। তনিমা দেবীর সঙ্গে যদি আর একবার দেখা হয় তো তাঁকেই বলব চেখে দেখতে।

॥ ১৭ ॥

প্রাহার রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে একটি দারুণ বিদ্যে শিখলুম—লাইন দেওয়া। বিষম ব্যস্ত এখানকার মানুষ। ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠে। ছটার মধ্যে তৈরি হয়ে নিয়ে সাতটায় আপিসে কারখানায় হাজিরা দেয়। শীতের সময় তো সাতটায় ঘোর অন্ধকার আর হাড়-কাঁপানো শীত। তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই। যেমন কারখানা আপিস, তেমনি কলেজ। স্কুলগুলোও তেমনি। দুধের বাচ্চারা সব শীতের সময় কাঁপতে কাঁপতে পৌনে আটটার মধ্যে স্কুলে হাজিরা দেয়। রাস্তা দিয়ে লোক হাঁটে ঘোড়দৌড়ের মতো। যেন সবারই ট্রেন ফেল হয়ে গেল। যাতে ধাক্কাধাক্কি না হয়, তাই নিয়ম করে নিয়েছে, ঐ সরু ফুটপাতেই যারা যাচ্ছে আর যারা আসছে, প্রত্যেকেই নিজের ডান দিক দিয়ে হাঁটবে। বেলা দুটোর মধ্যে এদের আপিস কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর জিরোবার কথা। কিন্তু জিরোতে এরা কি জানে? আপিস শেষ করেই ছুটলো সব বাজার করতে। বাপরে, সে সময় দোকানে যা ভিড়—ঢোকে কার সাধ্য! আয় বেড়ে গেছে সবার। বিশেষ করে বাড়ির মেয়েরাও আজকাল সমানে রোজগার করছে, তাতে করে পরিবারের সাশ্রয় হয়েছে কত! গরীব মানুষরা আগেকার দিনে কীই-বা বাজার করতো? হপ্তায় মাংস খেত একদিন। আরো গরীব হলে মাসে একদিন। কেনবার প্রধান উপকরণ ছিল পাঁউরুটি আর মার্জারিন। এই হয়ে গেল বাজার। এরাই ছিল জনসংখ্যার প্রধানতম অংশ। অথচ বাজারে এরা চোখেই পড়ত না। আর আজকে পকেট ভারি করে এরাই বাজার মাত করে রেখেছে। এদের স্ত্রীরাও কম যায়

না। দোকানের সংখ্যা বাড়িয়ে বাড়িয়েও এদের চাহিদা মেটানো যাচ্ছে না। আরও মুশকিল—দোকান হয় তো দোকানী কই? যা এ দেশের বিরাট উৎপাদনের পরিকল্পনা—কারখানাতেই মজুর জোটে না তো দোকান চালাবার দোকানী! বাজার ভেঙে পড়ে ক্রেতায়। দিনের পর দিন এর আর কমতি নেই। জিনিসপত্র হু হু করে বিক্রি হয়ে যায়। বাজার করা শেষ হলো তো খেয়ে দেয়ে ছুটলো সবাই সিনেমায়, থিয়েটারে, অপেরায়, নাচঘরে, কনসার্টে। হাড়-ভাঙা খাটুনির পর একটু আনন্দ চাই তো?

এই এত ব্যস্তবাগীশ জীবনস্রোতের যেখানে সবচেয়ে বড় ব্যতিক্রম, ব্যতিক্রম বলি কেন, যেটা সবচেয়ে বড় স্বস্তি, সেটা হচ্ছে লাইন দেওয়া। হঠাৎ যদি দেখা যায়, কোনো এক জায়গায় পাঁচজন দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা লাইনে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে আর সবাই সব কাজ ফেলে সেইখানে একজনের পর একজন দাঁড়িয়ে পড়বে। বড়দিন আসন্ন হতেই দেখতে দেখতে লাইন দেওয়া বেড়ে গেল। বড়দিনে অনেক কিছু নতুন জিনিস ওঠে বাজারে। সঙ্গে সঙ্গে এরা লাইন দিয়ে তা কিনে নেয়। সারা বছর ধরে এরা পয়সা জমায় বড়দিনের সময় ভালো-মন্দ কিনবে বলে। প্রত্যেকে প্রত্যেককে উপহার দেয়। তাই বড়দিনের সময়ই বাজারে এত ভিড় এবং সেই কারণেই বড়দিনের সময় দোকানে দোকানে লেগে যায় লাইন। লাইন বা কিউকে এরা বলে 'ফ্রস্তা'। জন কুড়ি পঁচিশ দাঁড়ালে শুধু ফ্রস্তা-ই বলে। আর যেখানে শ-খানেক লোক দাঁড়িয়ে গেছে, তাকে বলে স্ত্রাস্না ফ্রস্তা। অর্থাৎ ত্রাসজনক বা ভয়ঙ্কর লাইন। বড়দিন আসন্ন হতে আমিও লাইন দেওয়া শিখে নিলুম আর বলতে শুরু করলুম—

যেখানে দেখিবে লাই
দাঁড়াইয়া পড় ভাই।

কেন লাইন দিচ্ছি জানি না। লাইন দেখি তো দাঁড়িয়ে পড়ি। হাতে সময় থাকে তো কথাই নেই। সময় যদি নাও থাকে, কাজের

তাড়া থাকে, তা হলে কাজ রইল পড়ে, লাইন দেওয়াই হল প্রধান কর্ম।

লামি একবার লাইন দিয়েছিল বাসের জন্যে। প্রাহা থেকে যাবে 'তেপ্‌লিৎসে' বলে একটা জায়গায়—তিন ঘণ্টার পথ। বাসে খুব ভিড় হবে—তাড়াতাড়ি করে বাসে উঠতে পারলে তবেই বসবার জায়গা পাওয়া যাবে—নইলে যাও দাঁড়িয়ে। লামি বেশ সকাল সকালই বেরিয়েছিল, কিন্তু বাস-স্টপের কাছে এসে দেখে প্রকাণ্ড এক লাইন। একেবারে স্ত্রাস্‌না ফ্রন্তা। ভাবলে, এ বাসে আর জায়গা পেয়েছে! যাই হোক, তবু দাঁড়িয়ে পড়ল লামি। লাইনের সঙ্গে কিছুদূর এগিয়েছে, তখন লামির ঠিক পিছনে যে মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর কি রকম সন্দেহ হয়েছে। লামির পিঠে রুকস্যাক। তেপ্‌লিৎসে যাবে বলে কাপড়-চোপড় ভরে নিয়েছে—তাই দেখেই সন্দেহ। তিনি বললেন—স্লেচ্‌না, আপনি ঠিক ফ্রন্তায় দাঁড়িয়েছেন তো? এটা কিন্তু তরকারির ফ্রন্তা। নতুন তরকারি উঠল আজ বাজারে, তাই এত বড় লাইন।

লামি বললে—সে কি? আমি যে তেপ্‌লিৎসের বাস ধরবার জন্যে লাইন দিয়েছি।

—আরে যান যান, ঐ তো ছোট্ট ফ্রন্তা, ঐখানে—দেখতে পাচ্ছেন না? বলে মহিলা লামিকে তরকারির ফ্রন্তা থেকে বার করে দিলেন।

বাসের ছোট্ট লাইনটি তরকারির অফুরন্ত লাইনে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। মহিলাটি ছিলেন বলে সেদিন লামি বাস পায়।

বড়দিনের বাজারে এবার বড় বড় লাইন। পরিবারের সকলে মিলে এ সময় আনন্দ করে, ভালো-মন্দ খায়। কত নতুন জিনিস বাজারে ওঠে, কত নতুন ফ্যাশান দেখা যায়। আমাদের পূজোর বাজারের মতো এদের বড়দিনের বাজার। পূজোর সময় আমরা নাড়ুর জন্যে, চন্দ্রপুলির জন্যে নারকেল কিনি, এরা কেনে আপেল। এ বছর

কিন্তু ভারি এক মুশকিল হয়েছে। আবহাওয়ার দোষে এ বছর চেক দেশে আপেল জন্মেছে কম। আপেলের ফুল আসবার পরই হঠাৎ এমন ঠাণ্ডা পড়ে যায় যে, মৌমাছিরা কেউই ঘর ছেড়ে বেরতে পারেনি। ফুলে এসে পৌঁছতে পারেনি; ফলেরও তাই গুটি বাঁধেনি। বড়দিনের সময় আপেলের যা চাহিদা, তার কিছুই এ বছর মিটছে না। আপেল এদের জাতীয় ফল, সেরা ফল। সেই ফল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হচ্ছে এবার—না হলে যে বড়দিনের উৎসব মাটি হবে। বড়দিনের আগের দিন সন্ধ্যায় এরা ঘরের মধ্যে ছোট একটা পাইন গাছ বসিয়ে গাছকে সাজায় রাংতা দিয়ে, জগ্‌জগা দিয়ে, রূপোলি মালা ঝুলিয়ে, গোল গোল সোনালী রূপোলী বল বসিয়ে আর মোমবাতি জ্বেলে। গাছের তলায় সাজানো থাকে থরে থরে উপহার। এদের প্রিয় যীশু সকলকেই কিছু কিছু উপহার পাঠিয়ে দিয়েছেন রঙিন কাগজে মুড়ে—কারুরই কথা ভোলেননি—প্রত্যেকের নাম লেখা রঙিন কাগজের উপর। বিশেষ করে ছেলে-পিলেরা এই উপহারের জন্যে পাগল। উপহার যত সামান্যই হোক না, রঙিন কাগজে মোড়া মোড়ক বড়দিনের সাজানো গাছের তলায় ঝিলমিলে বাতির আলোর নীচে পাওয়া, এর তুলনা নেই। ছেলে-পিলেরা যখন কাগজ খুলে উপহার বার করে দেখতে থাকে, তখন তাদের মা বাতির আলোয় বসে এক-একটি সন্তানের কথা ভাবতে ভাবতে এক একটি করে আপেল তুলে নিয়ে ঠিক পেটের কাছ থেকে আড়া-আড়িভাবে আধখানা করে কেটে ফেলেন। আপেল যদি হৃষ্টপুষ্ট হয়, তা হলে অমনি করে কাটলে একটি পরিষ্কার তারা বেরিয়ে পড়বে। যার নামে মা আপেল কাটেন, তার আপেলের তারাটা যদি গোটা থাকে, তা হলে মা বোঝেন, এ বছরটা তার ভালো যাবে। আর যদি দেখেন, আপেলের ভিতরে পচা বেরল, কি পোকায় খাওয়া, তা হলে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মনে মনে ভাবেন, এই ছেলেটার কি এই মেয়েটার এ বছর ভালো যাবে না। তারপর

সেই সব আপেলের খোসা ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে সবাইকে খেতে দেন। প্রচুর আপেল খাওয়া হয়, মিষ্টি খাওয়া হয়। আপেল না হলে বড়দিন হবে না। আপেল সবার চাই-ই।

তাই ফলের দোকানে বড় বড় লাইন। একদিন লাইন দেখে দাঁড়িয়ে পড়লুম। কিসের দোকান—ফলের কি আর কিছুর লক্ষ্যই করিনি। লাইন তো লাইনই—যেখানে দেখিবে লাই! দাঁড়াতেই হবে, বড়দিন যখন এসে গেছে। দোকানদারের সামনে এসে দেখি মাছ-ভাজা তেল দিচ্ছে। সবাই তাই কিনছে। আমিও কিনলুম। কি কাজে লাগবে জানি না। বাড়ি এসে চীনা প্রতিবেশীদের দিলুম। তারা তো পেয়ে মহা খুশী—মাছ খেতে ভালবাসে আমাদেরই মতো। তাদের মাছ-ভাজা তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল—কোথাও পাচ্ছিল না।

একদিন লাইব্রেরীতে যাবো বলে বেরিয়েছি—সেখানে গিয়ে ঘণ্টা তিনেক পড়াশুনো করবার কথা—হাতে অনেক পড়ার কাজ জমেছে—পথে দেখি লাইন। প্রকাণ্ড লাইন। যত বড় লাইন, তত তার আকর্ষণ। লাইব্রেরী চুলোয় গেল, পড়লুম দাঁড়িয়ে। দোকানটা ফলের—দোকানের উপর লেখা রয়েছে, 'ওভোৎসে জেলেনিনা' অর্থাৎ ফল ও তরকারি। নির্ঘাত আপেল দিচ্ছে। মিনিট কুড়ি দাঁড়িয়ে, ও মশায়, যখন সামনে এসে পৌঁছলুম, হাতে তুলে দিল এক থলি কমলালেবু। এ দেশে কমলালেবু হয় না। বিদেশ থেকে আসে, তা-ও খুব কম। বড়দিনের জন্যে আমদানি করতে শুরু করেছে। বড়দিনের গাছের তলায় সাজিয়ে দেবে—যে ক'টা জোটে সবাই মিলে ভাগ করে খাবে। সহজে মেলে না—তাই এত আদর, তাই এত লম্বা ফ্রন্টা। আমরাও দেশ ছাড়বার পর কমলালেবু খাইনি। তাই কিনে ফেললুম এক তাড়া।

হঠাৎ এই সময় প্রাহায় পেঁয়াজ ফুরিয়ে গেল। আজ আসছে, কাল আসছে করে পেঁয়াজ আর আসে না। আমাদের দেশে যখন

থেকে-থেকে বাজার থেকে চিনি উবে যেত, তখন সকলেই সন্দেহ করত যে, সরবরাহ লাইনের কেউ না কেউ সমস্ত চিনি লুকিয়ে ফেলছে। কারণ, খোলা বাজারে না পাওয়া গেলেও কালোবাজারে বেশী দাম দিয়ে চিনি পাওয়া যেত। এবং কিছুদিন পরেই দেখা যেত, চিনি আবার বাজারে আত্মপ্রকাশ করেছে নতুন বর্ধিত মূল্যে। কাগজে পড়ছিলুম, লণ্ডনের বাজারে হঠাৎ পেঁয়াজ নাকি দুর্লভ হয়ে পড়েছিল এবং তার ফলে পেঁয়াজের দর ছ-পেনি থেকে আড়াই শিলিং-এ উঠে গিয়েছিল। এখানে কিন্তু সবাই জানে যে, বাজারে পেঁয়াজ কম পড়লেও কালো-বাজারে পেঁয়াজ পাওয়া যাবে না। কোনো কারণে আমদানী কম বলেই পেঁয়াজের ঘাটতি ঘটেছে; কালো-বাজারে লুকিয়ে ফেলার জন্মে নয়। এবং এটাও সবাই জানে যে, পেঁয়াজ ও অন্যান্য সব দ্রব্যেরই মূল্য যা বাঁধা হয়ে গেছে, পাঁচ বছরের মধ্যে তার কোনো নড়চড় হবার উপায় নেই। দীর্ঘ সময়ের জন্মে ক্রেতব্য সমস্ত বস্তুর দাম এইভাবে বাঁধা হয়ে যাওয়া যে কত বড় স্বস্তি, তা এ দেশে এসে চোখে না দেখলে হৃদয়ঙ্গম করাই মুশকিল।

যাই হোক, সকলে মিলে একদিন মুরগীর দো-পেঁয়াজি রাঁধবো বলে ঠিক করে রেখেছিলুম, কিন্তু পেঁয়াজের অভাবে রান্না হয়ে উঠছিল না। সেই সময় একদিন দেখি, পাড়ায় পেঁয়াজের দোকানে লাইন পড়েছে। প্রকাণ্ড লাইন। হবেই তো; এতদিন বাদে পেঁয়াজ এসেছে—স্ত্রাস্না ফ্রস্তা তো হবেই। টপ্ করে দাঁড়িয়ে পড়লুম। কাজকর্ম চুলোয় গেল। ধীরে ধীরে লাইন এগোতে লাগল। আধ ঘণ্টা পরে যখন সম্মুখভাগে এসে পৌঁচেছি, দেখি পেঁয়াজ কই, আপেল দিচ্ছে। সুন্দর গোল গোল লাল লাল আপেল—সবে বুলগেরিয়া থেকে এসে পৌঁচেছে। পেঁয়াজ হল না, আপেলই হোক। কিনে ফেললুম বড়দিনের আপেল।

আর একদিন দাঁড়িয়ে পড়েছি লাইনে। সামনের দিকে তো

দেখা যায় না, জানি না কি দিচ্ছে। কিন্তু লম্বা লাইন পড়েছে যখন, নিশ্চয় দেবে কিছু ভালো জিনিস, তাই নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। একজন পথচারী এসে আমার কোমরে তাঁর কনুয়ের খোঁচা মেরে জিজ্ঞেস করে গেলেন—৲স মায়ী ? ' অর্থাৎ, কি আছে ওদের ? আমি বললুম—নে ভিম্। অর্থাৎ জানি না তো। পথচারী বিভ্রান্ত হয়ে লাইনের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। আমার ধারণা, সে সময়টায় ঐ বড়দিনের হিড়িকে লাইনে-দাঁড়ানো-লোকের আট আনাই জানত না যে, কি পাবার জন্যে তারা ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দোকানদারনীর কাছে গিয়ে যখন পৌঁছলুম, দেখি চিনেবাদাম দিচ্ছে। এত কাণ্ড করার পর শেষে চিনেবাদাম ? কি আর করি, চিনেবাদাম চিনেবাদামই সই। কিনে ফেললুম। বড়দিনে খাওয়া যাবে।

যত বড়দিন এগিয়ে এল, লাইনের সংখ্যা এবং দৈর্ঘ্যও ততই বাড়তে লাগল। কোনো দোকান বাদ পড়ল না। ছেলেমেয়ের জন্যে খেলনা কিনতে গিয়েছিলুম একদিন খেলনার দোকানে। গিয়ে দেখি এক লাইন—বাপ্ রে স্ত্রাস্না ফ্রন্তার চেয়েও দীর্ঘ। হাল ছেড়ে দিলুম। ছেলেমেয়েদের বলে দিলুম—এবার বড়দিনে তোরা কেক-টেক খা ; খেলনা পরে হবে।

বড়দিন কেটে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে লাইনও মুছে গেল প্রাহার রাস্তা থেকে। আবার যেমন ছিল তেমনি হল। একজন চেক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলুম—বড়দিনের সময় তোমাদের এই যে সাংঘাতিক কেনার হিড়িক লাগে, এত কি না কিনলে চলে না ? এত জিনিস নিয়ে তোমরা করই বা কি ?

তিনি বলেছিলেন—দেখো, আজকাল আমরা টাকা জমাতে ভালবাসি না। টাকা জমাবার কোনো প্রয়োজনই হয় না তো জমিয়ে কি করব ? জীবন-যুদ্ধের অনিশ্চয়তা তো কেটেই গেছে

—সম্বল বাড়িয়ে কি হবে? তাই খরচ করার মজাটা উপভোগ করি আমরা এই বড়দিনের সময়। লাগাম খুলে দিয়ে সে সময় আমরা খরচা করি। সরকার বাহাদুর পর্যন্ত হিমসিম খেয়ে যান আমাদের চাহিদা মেটাতে। বড়দিনের বাজার করা এখন জাতীয় নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে—ওর কোনো ওষুধ নেই।

॥ ১৮ ॥

চেকোস্লোভেকিয়ায় চকোলেটের দাম বড় বেশী। মন ভরে যে চকোলেট খাবো তার উপায় নেই। কয়েক স্ল্যাব চকোলেট কিনলেই পকেট খালি হয়ে যাবে! অথচ চেক্‌রা চকোলেট তৈরী করতে এমন ওস্তাদ যে যে একবার খেয়েছে সে-ই পস্তেছে—মুখে লেগে থাকে স্বাদ। তার উপর, দোকানের কাঁচের জানলার পিছনে থরে থরে এমন ভাবে বাহারি রং-দার কাগজে মুড়ে চকোলেট-গুলোকে সাজিয়ে রাখে এরা, যে প্রায় পাগল করে দেয়।

এই কারণেই সেবারে আমরা লোহার কারখানা দেখবার নিমন্ত্রণ বার-বার পেয়েও শেষটা চকোলেটের কারখানায় গিয়ে হাজির হয়েছিলুম।

ছেলে-মেয়েরা বললে—লোহার কারখানায় আছে কি? লোহা আর লক্কড়! দমাদ্দম হাতুড়ি পেটার আওয়াজ সর্বক্ষণ। তার উপর হয়তো এমন গরম যে মুখই ঝল্‌সে যাবে!

আমরা বললুম—বেশ, বুঝলুম যে তোমরা লোহার কারখানা দেখতে চাও না। কিন্তু এরা আমাদের একটা কিছু দেখাতে চায়, কি দেখবে তা হলে বলো।

মিতু আর লামি যুগপৎ বলে উঠল—চকোলেটের কারখানা।

বুঝলুম মতলবটা আগে থেকেই ভাঁজা ছিল। যাই হোক, প্রস্তাবটা শুনে আমারও জিভে জল এসে গেল। মাথা চুলকে

ভাবতে বসলুম, যাঁরা আমাদের লোহার কারখানা দেখাবার জন্যে এত উৎসুক, কি করে তাঁদের বলা যায় যে চকোলেটের কারখানাই আমাদের বেশী প্রিয়। লোহা, ইস্পাত, রেলের লাইন, কড়ি-বরগা, বড় বড় ইঞ্জিন, বৃহৎ যন্ত্র এই সবের জন্যেই চেকোস্লোভেকিয়ার বিশ্বজোড়া নাম ডাক। এই সব জিনিসই বিদেশীরা তাদের কাছ থেকে কেনে। চকোলেট রপ্তানি করে সুইস্‌রা। বিদেশীরা সুইজারল্যাণ্ডকে চেনে তার চকোলেটের মাধ্যমে, ঘড়ির মাধ্যমে। কাজেই চেক্‌ চকোলেট যতই সুস্বাদু হোক তার জন্যে যে বিদেশীদের কোন মোহ থাকতে পারে এটা চেক্‌দের মাথায় আসবার কথা নয়।

তাই আমি যখন শেষ অবধি বলেই বসলুম যে একখানি চকোলেটের কারখানা দেখতে পেলেই আমরা আনন্দিত হব, তখন যিনি শুনলেন তিনি প্রথমটা অবাক হয়ে গেলেন ; তারপর খুশীতে উপচে পড়ে বললেন—আমাদের চকোলেট আপনারা ভালোবাসেন ? আমার বিশ্বাস ছিল আপনারা শুধু সুইস্‌ চকোলেট খান !

আমরা যে চেক্‌ চকোলেটের কত ভক্ত তা শুনে আশ্বস্ত হয়ে ভদ্রলোক তখনই ছুটে বেরিয়ে গেলেন বন্দোবস্ত করতে। লোহার আর ইস্পাতের কারখানা শিকেয় তোলা রইল।

প্রাহার উপকণ্ঠে মস্ত এক চকোলেটের কারখানা। চেক্‌রা বলে ‘চোকোলাডোভ্‌না’। ঠিক হল সেই চোকোলাডোভনাতেই আমরা যাবো।

—গাড়ি নিয়ে আসবো ঠিক সময়ে। আপনারা তৈরী থাকবেন।

মিতু আর লামি মোটার গাড়ি চড়তে ভালোবাসেনা, ওদের পছন্দ ট্রাম, বাস। ওরা বললে—এই তো কাছেই, বাসে করে যাওয়া যায়না ? মিতু আবার বলে বসল—ইস্‌ প্রাহায় যদি দোতলা বাস্‌ থাকত, দোতলায় উঠে বেশ দেখতে দেখতে যেতুম। আমাদের কলকাতায় কেমন আছে !

ভদ্রলোক শুনে বললেন—এই কথা? বেশ চল তবে তোমায় দোতলা ট্রেনে করে চোকোলাডোভ্‌নায় নিয়ে যাচ্ছি। দোতলা ট্রেন তো আর দেখনি?

মিতু অবাক হয়ে বললে—দোতলা ট্রেন? সে-ও আবার হয় না কি?

—কালই দেখতে পাবে। বলে ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

শহরের উপকণ্ঠে শত শত কারখানার বাঁশী যখন বেজে ওঠে তখন শহরবাসী মজুরদের শহরতলীতে ঠিক সময় পৌঁছবার জন্যে হুড়োহুড়ি লেগে যায়! তাদের যাতায়াতের সুবিধে করে দেবার জন্যেই এই দোতলা ট্রেনের অবতারণা। এইতে চেপে বড় বড় কাঁচের জানলার মধ্যে দিয়ে বহুদূর বিস্তৃত মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা চোকোলাডোভ্‌নার স্টেশানে এসে নামলুম। কারখানা থেকে মোটার গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ম্যানেজার স্টেশানে। তাইতে করে আমরা কারখানার দরজায় এসে হাজির হলুম।

—এ কি ব্যাপার? বাতাসে এমন মিষ্টি গন্ধ আসে কোথা থেকে?

—কোথা থেকে আবার? কারখানার মধ্যে কত মণ মণ মিষ্টি তৈরী হচ্ছে অনবরত, তার গন্ধ ভাসবে না?

—ভারি মজার জায়গা তো। এখানে বসে সাদা জল খেলে মনে হবে শরবৎ খাচ্ছি।

—তা ঠিক। কিন্তু সেদিন কি শুনলুম জানেন? ঐ যে দেখলেন, আমাদের গাড়ি আসতে যে দরোয়ান ফটক খুলে দিল, সে নতুন এসেছে। তার আগে যে দরোয়ান ছিল তার মহা বিপদ হয়েছিল এই মিষ্টি হাওয়ার মধ্যে থাকতে থাকতে। সারাদিন মিষ্টি হাওয়া শুঁকতো বলে বাড়িতে গিয়ে তার অরুচি হত মিষ্টিতে। বৌ নানারকম ক্রীম-কেক চকোলেট-কেক সাজিয়ে দিত রেকাবিতে, দরোয়ান ছুঁতোও না। বৌয়ের ভারি ভাবনা হল। সে বললে

—তুমি মিষ্টি খেতে অত ভালবাসতে, আজকাল আর ছোঁওই না। তোমার হয়েছে কি? অসুখ করেছে? দরোয়ান কিছু বলে না, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। মিষ্টি কেকটা খুঁটে একটু মুখে দেয় তারপর ঠেলে সরিয়ে দেয়। গা বমি-বমি করে। ডাক্তাররা দেখে শুনে ঘাড় নেড়ে বললেন—অ্যালার্জি। সারাদিন ধরে মিষ্টি গন্ধ নাকে সইছে না। সরিয়ে দেওয়া হোক ওকে চকোলেটের কারখানা থেকে। অগত্যা তাকে অন্য কারখানায় বদলি করা হয়েছে।

লামি বলল—কী চমৎকার গন্ধ। এতে আবার কারুর অ্যালার্জি হয়? আমার তো এখানে থেকে যেতে ইচ্ছে করছে।

ভিতরে খবর পাঠিয়ে অপেক্ষা করছিলুম আমরা বিশ্রামাগারে। ভিতরটা গরম জলের পাইপের উত্তাপে উত্তপ্ত। বাইরে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ পড়ছে—বেশ শীত। স্প্রীং লাগানো দরজা ঠেলে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস আর বরফের গুঁড়ো নিয়ে ঘরে ঢুকলেন কুড়ি-বাইশ বছরের একটি মেয়ে।

—চলুন, ম্যানেজার মশায় আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমার নাম আলেনা।

আমরা উঠে পড়লুম।

—পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন আলেনা। উঃ যা শীত পড়েছে।

—এই উঠোনটুকু—খালি। এটুকু পেরলেই কারখানার মধ্যে আবার গরম।

প্রকাণ্ড চারতলা কারখানা বাড়ি। তারই দোতলার এক ঘরে গিয়ে আমরা উপস্থিত হলুম। সেখানে ম্যানেজার বসেছিলেন। আমরা আসতে আপ্যায়ন হল। তারপর ম্যানেজার বললেন— এই আলেংকাই আপনাদের কারখানা দেখাবে। আলেনার হাতে আপনাদের ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। আলেংকা, এঁদের দেখা হয়ে গেলে আমার কাছে একবার আনতে ভুলোনা।

আলেনা প্রথমেই আমাদের নিয়ে গেল তার নিজের ঘরে। সেখানে তার আরও দুজন সহকর্মিণী বসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ হল। তারপর আলেনা তার ডেস্ক থেকে চারখানা চোকোলাডোভ্‌নার ব্যাজ্‌ বার করে আমাদের চারজনের বুকে এঁটে দিলে। চেকোস্লোভেকিয়ার প্রত্যেক কারখানারই ধাতুনির্মিত ছোট ছোট ব্যাজ আছে। মিতু এদেশে এসে অবধি যেখান থেকে পেত নানারকম ব্যাজ জমাতে সুরু করেছিল। স্ট্যাম্প জমানোর মত ব্যাজ জমানোও একরকমের নেশা।

মিতু বললে—আমার আর একটা হল।

আলেনা বললেন—একটু কফি বানিয়ে দিই ?

—দিন।

—ছেলেমেয়েরা কি খাবে ? আমার মা খুব ভালো রাস্পবেরির সিরাপ তৈরী করতে পারেন। আমার আলমারিতে আছে এক শিশি। দেব তারই একটু ?

লামি আর মিতু তো সিরাপ পেলে আর কিছুই চায়না। বিশেষতঃ ঘরে তৈরী সিরাপ। কফি আর রাস্পবেরির রস খেয়ে চললুম আমরা চকোলেটের কল দেখতে।

কারখানার ম্যানেজার, সহকারী ম্যানেজার, হিসাব রক্ষক আর যন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণের ইঞ্জিনীয়াররা—এই ক-জনই হলেন পুরুষ কর্মী ; বাদ বাকি সব মেয়ে। চার-শ মেয়ে এখানে কাজ করেন। তাঁরাই কল চালান, তাঁরাই কল বন্ধ করেন। এত বড় কারখানার তুলনায় কর্মিণীর সংখ্যা খুবই কম ; তার কারণ বেশীর ভাগ কলই স্বয়ংক্রিয়—কলই কাজ করে চলে নিজে থেকে। মেয়েদের ভীড় সবচেয়ে বেশী প্যাকিং বিভাগে—সেখানে হাত ছাড়া উপায় নেই।

চকোলেট তৈরীর প্রথম পাঠ হচ্ছে, কোকো ফলের বীচি পেষাই করা। সে কি আর হাতের জোরে যাঁতায় পেষাই ? বিরাট এক লোহার কল। বিজলীর জোরে ঘুরছে আর প্রচণ্ড বিক্রমে পিষে

চলেছে কোকোর বীচি।—থেঁতো হয়ে কাদা হয়ে যাচ্ছে বীচিগুলো, আর একদিক দিয়ে গল্ গল্ করে বেরিয়ে আসছে তেল।

যিনি কল চালাচ্ছিলেন তিনি বুঝিয়ে দিলেন। এই যে তেল বেরিয়ে আসছে এরই উপর অনেকাংশে নির্ভর করে চকোলেটের সুস্বাদুত্ব। আজকাল কোকোর বীচি থেকে একটু বেশী পরিমানেই তেল বার করে নিচ্ছি আমরা। কলেরই এক জায়গায় দেখালেন পড়া যাচ্ছে কত শতাংশ তেল বেরিয়ে গেল, কত শতাংশ থেকে গেল। এর থেকে আর দশ শতাংশ তেল কম বার করে নিলে আমাদের চকোলেট খেতে আরও সুস্বাদু হত, বুঝলেন?

আমরা বললুম—এখনই যা তাতেই রক্ষে নেই, এর থেকে আরও খেতে ভালো হলে যারা খাবে পাগলই হয়ে যাবে হয়তো। সে যা হোক—কিন্তু অমন ভাবে তেল বার করে ফেলে দেন কেন আপনারা?

—ফেলে দিই কে বললে? কি সর্বনাশ, ও তেল যে মহামূল্য জিনিস। কতরকম ওষুধে কাজে লাগে জানেন? আজকাল ব্রেজিল থেকে আসে আমাদের কোকো-বীজ। খরচ পড়ে সাংঘাতিক। এর কি এক ফোঁটা তেল ফেলে দেওয়া যায়? সমস্ত পাঠিয়ে দিই ওষুধ তৈরীর জন্যে। আর সেই জন্যেই তো চকোলেটে তেল কিছু কম যায়।

কলের চাকা ঘোরা শেষ হচ্ছে আর বড় বড় বারকোশের মতো এক-একটি পেষাই কোকোর চাকি বেরিয়ে আসছে—কাঁঠাল কাঠের মতো খয়েরি, চক্‌চকে। এই হল চকোলেটের মূল রসদ। ঘরের এক কোণে একটার উপর একটা বারকোশ সাজিয়ে রাখা হচ্ছে কড়িকাঠ পর্যন্ত।

আলেনা আমাদের একটার পর একটা ঘরে নিয়ে চললো। কোকোর বারকোশকে গুঁড়ো করা হয় এক জায়গায়। গরম করা হয় আর এক জায়গায়। গরম করার পরই আবার ঠাণ্ডা করা হয়

কলে। সেই ঘরে গিয়ে দেখি কলের এক মুখ দিয়ে চওড়া ফিতের মতো চকোলেট বেরিয়ে আসছে। কিছুদূর গেলেই কলের ছুরি পড়ছে তার উপর চপাৎ চপাৎ। টুকরো হয়ে কেটে স্ল্যাব হয়ে যাচ্ছে চকোলেটের। সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়ছে আবার একটা বরফের মতো ঠাণ্ডা সুড়ঙ্গে। ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে আসছে জমাট ঠাণ্ডা চকোলেট।

যে দুজন বুড়ি কল চালাচ্ছিলেন তাঁরা টপ্ করে দুটো স্ল্যাব তুলে একটা লামির হাতে একটা মিতুর হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন—খেয়ে বল দেখি কেমন ?

লামি মিতু লজ্জায় পড়ে গেল। কিন্তু বুড়িরা নাছোড়বান্দা।

—লাগাও কামড়—দেখি কেমন তোমাদের দাঁতের জোর !

দাঁতের নিন্দে করলে লামি মিতু দুজনেই চটে যায়। কাজেই তারা চটে গিয়ে কটাস্ কটাস্ করে চকোলেটে কামড় বসালো। আর বুড়িদের তাই দেখে ফোকলা দাঁতে সে কী হাসি।

— কোন দেশের লোক গো তোমরা ? এমন দাঁতের জোর !

আলেনা এগিয়ে এসে বললেন—ইণ্ডিয়ার।

—ওরে বাস্‌রে তবে নাও আরো। বলে লামির আর মিতুর পকেটে জোর করে দুটো দুটো স্ল্যাব গুঁজে দিলে।

পাশে আর এক কল ; তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কফি-চকোলেট, অন্য একটা থেকে বাদাম-চকোলেট, আর শেষের কল থেকে তিতো-চকোলেট।

লামি বললে—চকোলেট আবার তেতো হয় নাকি ?

তিতো চকোলেটের বুড়ি একটা স্লাব এগিয়ে দিয়ে বললে—চেখেই দেখ।

লামি বললে—না রে বাবা, তেতো খেতে পারবনা।

—আহা দেখই না।

অগত্যা লামিকে খেতে হল। চমৎকার আস্বাদ। তবে তিতো

বলে কেন? চকোলেটের মিষ্টি জাতের মধ্যে ঐ হল তিতো। খেতে আসলে সবার সেরা।

আলেংকা বললেন—চলুন এবার প্যাকিং ঘরে যাওয়া যাক।

প্যাকিং ঘরে ঢোকবার আগে মিতু আমায় আঙুল দেখিয়ে বললে —আচ্ছা, ও ঘরটায় নতুন রকমের কি যেন দেখা যাচ্ছে?

কথাটা আলেংকার কানে গিয়েছিল। আলেংকা বললেন—ঠিক বলেছ, ও ঘরটা তো ভুলে গিয়েছিলুম। বলে আমাদের নিয়ে ঢুকলেন।

ঘরের মধ্যে গোটা কুড়ি কল। প্রত্যেকটা কলে একটা করে বড় লোহার কড়া। কড়াগুলি কলের একটি ডাণ্ডার সঙ্গে নানারকম কোণ করে বিচিত্র ভাবে পাক খেয়ে চলেছে আর তাদের মধ্যে ছড়ানো মুঠো মুঠো কি সব যেন ঘুরপাক খাচ্ছে অনবরত।

একজন মহিলা এসে মিতুর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন একটি স্থির কড়ার কাছে। কড়া ভর্তি কমলা রঙের ছোট ছোট গোল গোল চকচকে বস্তু। সারা ঘর ভরা কড়ায় কড়ায় বিচিত্র রংএর এই সব দ্রব্য—লাল, সবুজ, হলদে, বেগুনি, নীল, সাদা, খয়েরি।

ঠোঙার মধ্যে এক ঠোঙা সেই লোভনীয় দ্রব্য ভরে মিতুর হাতে তুলে দিলেন মহিলা।

মিতু বললে—লজেঞ্চুস?

—উঁহুঃ, এ হল লেনটিলকি।

লেনটিলকি মানে ডাল। মুসুর ডালেরই মতো দেখতে। শুধু আকৃতিতে বড়। চেপ্টা চেপ্টা মার্বেলের মত। ভিতরে চকোলেট, উপরে শক্ত চক্‌চকে চিনির আস্তরণ, নানা রংয়ে রং করা। মুখে দিলে একটু পরে চিনির আস্তরণ মিলিয়ে যায়—চকোলেটের আস্বাদ এসে জিভে লাগে। ইংলণ্ডে পাঠিয়েছিল এরা কিছু বিক্রীর জন্যে। সেখান থেকে মস্ত অর্ডার এসেছে। সব কলগুলিই ঘুরপাক খাচ্ছে সারাদিন। ঝুড়ি ঝুড়ি তৈরী হচ্ছে লেনটিলকি।

প্যাকিং ঘরে গিয়ে দেখলুম যেন ফুলবাগান। বিচিত্র রংয়ের কাগজ আর রাংতা টেবিলে টেবিলে সাজানো। চকোলেটের আর লেনটিলকির স্তূপ। অনেক মেয়ে এ ঘরে। ক্ষিপ্র হাতে তারা প্যাক করে চলেছে। কিছু কলে প্যাক হচ্ছে, কিছু হাতে। কলের গুলি চোস্ত, কিন্তু হাতের গুলি সুন্দর।

বললে—বড়দিনের আগে এলে একবার দেখতেন। ঘর ভরে গিয়েছিল মেয়ে-প্যাকারে আর চকোলেটে। আশ পাশের যত গ্রাম থেকে, প্রাহার নানা পল্লী থেকে স্বয়ংসেবিকারা এসেছিলেন চকোলেট প্যাক করতে।

বড়দিনের উৎসবের সময় অন্য যে-কোনো মাসের দশগুণ চকোলেট উৎপন্ন করতে হয়। দেশের প্রতিটি ছেলেমেয়ের হাতে চকোলেট পৌঁছনো চাই তো! স্বয়ংসেবিকারা বা ব্রিগাডারা এসে এই বিরাট প্যাকিংএর কাজ সহজ করে দিয়ে যান।

আমরা বললুম—আগে খবর পেলে আমরাই তো চলে আসতুম চকোলেটের ব্রিগাডা হয়ে। অন্ততঃ চার জোড়া বাড়তি হাত আপনারা পেতেন। দেশে গিয়ে আমরা বলতেও পারতুম।

—বেশ তো, এ বছর আসবেন ডিসেম্বারের গোড়ায়।

আমরা গভীর নিশ্বাস ছেড়ে বললুম—হায়, তা আর আমাদের কপালে নেই। শীতের আগেই আমাদের দেশে ফিরতে হবে।

আগামী ঈষ্টার উৎসবের জন্যে চকোলেট দিয়ে তৈরী নানারকম বাহারী ডিম প্যাক হচ্ছিল এক টেবিলে। সেখানকার মেয়েরা রাংতা মোড়া অপূর্ব কতকগুলি ডিম এনে আমাদের হাতে ভরে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক টেবিলে যারা চকোলেটের ভাল্লুকের গায়ে রাংতা জড়াচ্ছিল তারা এনে দিল ভাল্লুক। মানা শুনল না।

প্যাকিং ঘর থেকে বেরিয়ে আলেনাকে জিজ্ঞেস করলুম—কারখানার চকোলেট এমনি ভাবে যাকে তাকে দিয়ে দেওয়া যায় নাকি? কেউ কিছু বলে না?

আলেনা বললেন—ওরা তো নিজের ভাগ দিচ্ছিল—কে কি বলবে ?

—নিজের ভাগ মানে ?

—মেয়েরা বাড়ি যাবার সময় প্রত্যেকে তার নিজের কলের বা টেবিলের একখানা করে চকোলেট বাড়ি নিয়ে যাবার অধিকার পায়। তাই থেকে দিয়েছে।

—আরে ছি ছি। এমন জানলে কি নিই ? চলুন ফেরৎ দিয়ে আসি।

—খবরদার ও কাজ করবেন না। ওদের চেনেন না আপনারা। কেঁদেই ফেলবে হয় তো। চকোলেট ওরা রোজই পাচ্ছে। আপনারা যে নিলেন, এতে ওরা ভারি খুশী হয়েছে।

—আলেংকা, এখানকার কাজ তোমার কেমন লাগে ?

—খুব ভালো লাগে। কিন্তু জানেন, বেশীদিন আমি বোধহয় আর চোকোলাডোভ্‌নায় থাকব না।

—কেন কি হল ?

—আমাদের কারখানায় একটা দল আছে—পুরুষ মেয়ে দুই-ই আছে সে দলে—আমরা মাঝে মাঝে গান-আবৃত্তি-অভিনয় এই সব করি। নিজেদের সখে করি—আমাদের সখ মেটে, সহকর্মীরাও দেখে আনন্দ পান। আমাদের খ্যাতি আজকাল বাইরেও ছড়িয়ে গেছে। বাইরের নানা কারখানা, কৃষি-সমবায় প্রভৃতি থেকে আমাদের আমন্ত্রণ আসে। আমরা প্রায়ই যাই বিচিত্রানুষ্ঠান করতে।

—বাঃ এ তো চমৎকার। এই কারণেই তো তোমার চোকো-লাডোভ্‌নায় থাকা উচিত আলেংকা।

—আমি গান গাই, অভিনয় করি। গান গেয়ে অভিনয় করে যখন ফিরে আসি, মনে হয় ওই আমার জীবনের পথ। অভিনয় করতে গান গাইতে এত ভাল লাগে যে কি বলব। প্রায়ই আজকাল মনে হয় এ সব ছেড়ে ছুড়ে নাট্য-স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়ি।

ভাল অভিনেত্রী হতে ইচ্ছে হয়। এই জন্যেই মনে হয় এ কারখানা বেশী দিন আমায় ধরে রাখতে পারবে না।

আলেংকার মুখের দিকে একবার তাকালুম ভালো করে। একটা স্বপ্ন দেখছে বটে মেয়েটি। রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রী হবার স্বপ্ন। আজ থেকে অনেক বছর পরে আবার যদি আমরা প্রাহায় ফিরে আসি তাহলে হয়তো দেখব আলেংকার স্বপ্ন সফল হয়েছে—চোকোলাডোভ্‌নায় সে আর নেই। পাদপ্রদীপের আলোর সামনে তার নতুন জীবন সুরু হয়ে গেছে।

ম্যানেজারের ঘরে এসে পৌঁছে গিয়েছিলুম। একে তো আমাদের হাত চকোলেটে ভর্তি, তার উপর, বাপ্‌রে, বিরাট বিরাট চারটে প্যাকেট ম্যানেজার মশায় আমাদের চারজনের জন্যে সাজিয়ে রেখেছেন। না বলবার জো নেই। নিতেই হবে।

আলেংকা আমাদের গাড়িতে তুলে দিল। আমরা মুখ বাড়িয়ে বললুম—এর পরের বার প্রাহার কোনো থিয়েটারে তোমায় খুঁজে বার করব। এই কথাই রইল আলেংকা।

আলেনা বলল—ধন্যবাদ।

॥ ১৯ ॥

অনেক দিন থেকে শুনে আসছিলুম, এদের দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের নাকি ভারি আরাম। একখানা বই লিখলেই বছর দুয়ের মতো অন্নসংস্থান হয়ে যায়। আমি একবার আমার একখানা বইয়ের কপিরাইট ষাট টাকায় বিক্রী করেছিলুম—তাতে আমার খান দশেক শার্ট আর কাপ দশেক কফি হয়েছিল। কাজেই চেক লেখকদের আমি হিংসের চোখেই দেখি বরাবর। আমাদের এক বিশেষ বন্ধু প্রাহার এক স্কুলে পড়াতেন। স্কুলের ছেলেদের তিনি বড় ভালবাসতেন। স্কুলের ছেলেরাও তাঁকে ভারি পছন্দ করত।

এবারে প্রাহায় এসে শুনলুম তিনি স্কুল ছেড়ে দিয়েছেন। বই লিখছেন শিশুদের জন্য। নতুন আনকোরা লেখক। তা হলেও হাতে কলম ধরতেই তাঁর মৌলিকতা আর সৃজনী শক্তি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিক্ষক জীবনে বাচ্চাদের নানা খেলায় মাতিয়ে রাখতেন। ঐ দিকটায় ছিল প্রচুর উৎসাহ। খেলার নানারকম মাল-মশলাও সংগ্রহ করতেন। ঐ সব মাল-মশলার উপর ভিত্তি করে তার উপর গাল গল্পে ভরে সুন্দর করে সাজিয়ে তিনি দু খণ্ড খেলার বই লিখেছিলেন। প্রকাশকেরা লুফে নিয়েছিল। সেই বই লিখে এবং ছাপিয়ে ইনি এখন কয়েক বছরের মত নিশ্চিন্ত। লেখার এবং সফলতার নেশায় পেয়ে গেছে। স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। আরো বই লিখছেন।

শিল্পী এবং সাহিত্যিকদের স্থান এদের সমাজে অতি উর্ধ্বে। অন্য দেশের চেয়ে এদের রোজগারই যে শুধু বেশী তা নয়; এদের সৃজনী ক্ষমতার সত্যিকারের স্বীকৃতি এ দেশে আছে। বই ছাপা হলে তা হাজারে হাজারে বিক্রি হয়ে যায়। জনপ্রিয় লেখকের ভালো বই হলে তো কথাই নেই। শিল্পীদের এমনতর শ্রদ্ধার আসনে এরা বসিয়েছে অথচ পশ্চিম দেশে এদের শিল্পীদের যথেষ্ট নিন্দাবাদ শুনেছিলুম। তাই একজনকে জিজ্ঞেস করলুম একদিন।

বললুম—তোমাদের বিরুদ্ধে যেটা নালিশ, সেটা হচ্ছে, তোমরা নাকি তোমাদের লেখকদের শুধু সেই সব বিষয়েই লিখতে বল যা শুধু তোমরাই চাও, লেখকরা না-ও চাইতে পারেন।

তিনি বললেন—এ তো সব দেশেই। এর মধ্যে নতুনত্ব বা দোষের কি আছে?

—দোষের নয়? লেখক চাইছে এক জিনিস লিখবে। আর তোমরা লেখাচ্ছ তাকে দিয়ে আরেক জিনিস। লেখকের তাহলে আর স্বাধীনতা রইল কোথায়?

—লেখকের স্বাধীনতা পাঠকের কাছে বাঁধা। লেখক যা খুশী

নিশ্চয়ই লিখতে পারে, কিন্তু পাঠকের স্বীকৃতির কাছে যত দিন না তা যাচাই হচ্ছে ততদিন তার কোনই মূল্য নেই। আমাদের দেশের বর্তমান যুগের পাঠকরা যা চাইছে তাই লিখছে বর্তমান যুগের লেখকরা। এই চাওয়াটাতেই বোধ হয় পশ্চিম দেশের আপত্তি। কিন্তু কই আমরা তো আপত্তি করি না যখন পশ্চিম দেশের পাঠকরা যৌন, গোলাগুলি আর 'মিলিয়নেয়ার' নিয়ে লেখা আদায় করে নেয় তাদের লেখকদের কাছ থেকে।

—বুঝলুম। কিন্তু শুধু তো পাঠকবর্গ নয়; শোনা যায় তোমাদের রাষ্ট্রই নাকি প্রধানত নির্দেশ দিয়ে দেন তোমাদের লেখকদের কি লিখতে হবে না হবে।

—দেখ, চেকরা বহুদিনের ব্যবসায়ী জাত। আমরা বুঝি, পয়সা খরচ করে শুধু বই ছাপালেই হয় না—সে বই বিক্রি করে খরচ তুলে কিছু লাভের কড়ি ঘরে আনতে হয়। তবেই বই ছাপানো সার্থক। রাষ্ট্রের নির্দেশ নিয়ে বই প্রকাশ করলে এতদিন বইয়ের ব্যবসাই উঠে যেত দেশ থেকে। দেখতে পাও না—একটা বইও পড়ে থাকে আমাদের? ক-মাস লাগে বইয়ের এক-একখানা সংস্করণ শেষ হতে? পাঠক-তুষ্টি ছাড়া বইয়ের ব্যবসায়ে এমন সফলতা জন্মাতে পারে? রাষ্ট্র শুধু দেখে নেয় কোনো বইয়ে রাষ্ট্রদ্রোহী কিছু লেখা বার হচ্ছে কি না; লেখার মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রের ভিতকে আক্রমণ করা হচ্ছে কি না। যেমন ধর নাৎসীবাদের সমর্থন। কিন্তু পশ্চিম দেশের রাষ্ট্রও তো এ বিষয়ে সচেতন। লেখার ভিতর দিয়ে দেশের রাষ্ট্রনীতিকে আক্রমণ কোনো সভ্য দেশ সহ্য করে বলতে পারো?

—না তা করে না।

এইখানেই সেদিন আলোচনা শেষ হয়েছিল। কিন্তু তার পরেই এঁরই সাহায্যে আমি এদের দেশের জাতীয় লেখক সংঘের আপিসে গিয়ে একদিন উপস্থিত হয়েছিলুম। মহাজাতি সড়কের উপর বিজ্ঞান আকাদেমির বাড়ির পাশেই এঁদের বাড়িখানা। মধ্য

জানুয়ারীর বরফে-ছাওয়া রাস্তা পার হয়ে সংঘের বাড়িতে ঢুকতেই বাড়ির ভিতরের মৃদু উত্তাপ পুরোনো বন্ধুর মতো যেন হাত বাড়িয়ে আমায় ডেকে নিল। যিনি আপিসে বসেছিলেন তিনি অকপট হৃদ্যতার সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন। যখন শুনলেন, আমারও এক-আধখানা বই আছে, তাঁর স্বতঃই জানতে ইচ্ছে হল, আমাদের দেশের লেখকসংঘের অবস্থা কি রকম? প্রথমটা আমার মনে হয়েছিল, ঘাড় নীচু করে বলি যে, লেখক-সংঘ আমাদের দেশে নেই—অন্তত বাংলা দেশে নেই; কেরলে হয়তো থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু তার পর কি মনে হল, ঠাট্টার সুরে বললুম—আমাদের দেশের লেখকরা এখনও স্বাধীনভাবেই বিচরণ করে। তারা সংঘবদ্ধ হতে শেখেনি।

—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে খুব খানিকটা হেসে নিয়ে তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন—সত্যি কিন্তু ঠাট্টার কথা নয়। বন্য জীবোচিত যে স্বাধীনতার আপনি ইঙ্গিত করলেন, সত্যিকারের শিল্পীর সেটা কাম্য। কিন্তু চাইলেই কি আর পাওয়া যায়? আপনারা পেয়েছেন?

আমি বললুম—জিজ্ঞেস যখন করছেন, সত্যি কথাই বলি। যত বন্য-স্বভাব নিয়েই আমরা সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করি না, শেষ পর্যন্ত পোষ মেনে যেতে হয়; নইলে টেঁকা অসম্ভব।

—তবে পোষই যদি মানলেন, তা হলে আর সংঘবদ্ধ হতে বাধা কি? অনেক সুবিধে তো তাতে। আর তা নইলে যে আপনাদের পোষ মানাবে, সেই তো আপনাদের ঘাড় ভাঙবে।

বললুম—ঈশপের কাঠি বাঁধার গল্প ছেলেবেলায় পড়েছি। তখন থেকেই বুঝি কাঠির গোছা বেঁধে ফেলতে পারলে সুবিধে কত। কিন্তু দড়ি আর যোগাড় হচ্ছে না। আপনি বরং বলুন, আপনারা কি করে কাঠির গোছা বেঁধেছেন।

এদের লেখক-সংঘের সভ্য সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ-শ। এই পাঁচ-শ

লেখককে এঁরা বাছাই করে নিয়েছেন। প্রত্যেককে অন্তত দুখানা বই পেশ করতে হয়েছে বিচারকদের সামনে, যাঁরা তাদের বিচার করেছেন মৌলিক সৃজন গুণের দিক থেকে। কোনো কোনো অসাধারণ ক্ষেত্রে শুধু একখানা তুলনাহীন বইয়ের বিচারের ফলেই গ্রন্থকর্তাকে সংঘের সভ্যপদে মনোনীত করা হয়েছে। সভ্যদের মধ্যে আছেন লেখক, সমালোচক, নাট্যকার আর উৎকৃষ্ট অনুবাদক।

—চাঁদা কত? এত বড় বাড়ি আপনাদের, চাঁদার হার নিশ্চয় খুব বেশী?

—শুধু চাঁদার জোরে তো আমরা চলিনে। আমাদের নানারকম ব্যবসা-বুদ্ধি আছে। সত্যি কথা বলতে ক, আমাদের আর্থিক অবস্থা খুবই সন্তোষজনক। ফ্রান্সের লেখক-সংঘের কথা যদি ধরেন, তাদের তুলনায় আমরা তো রাজা। শুধু চাঁদা যদি ধরেন, প্রত্যেক সভ্য তাঁর রয়ালটির শতকরা দু-ভাগ ইউনিয়নকে দেন। এ ছাড়া আমাদের আয় হয় আমাদের নিজেদের প্রকাশালয় থেকে। সভ্যদের কোনো কোনো বই আমরা প্রকাশ করি; আমাদের দুখানি মাসিকপত্র আছে এবং দুখানি উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিক। মাসিক-পত্রের প্রত্যেকটি বিক্রি হয় প্রতি মাসে পঁচিশ হাজার কপি। এই সব থেকে আমাদের প্রচুর লাভ।

এদের আরও আয় আছে। পুরোনো ক্লাসিকাল গ্রন্থকারদের যে-সব বইয়ের গ্রন্থস্বত্ব শেষ হয়ে গেছে—যেমন ইংরেজ গ্রন্থকার ডিকেন্স বা শেক্সপীয়ার—তাঁদের কোনো বই যদি চেকোস্লোভেকিয়ায় ছাপা হয়, তা হলে গ্রন্থকর্তা কোনো রয়ালটি পান না বটে কিন্তু এই সব বইয়ের জন্যে প্রকাশককে কিছু রয়ালটি রাষ্ট্রের খাতে দিতে হয়। সেই প্রাপ্য রয়ালটির অর্ধাংশ রাষ্ট্র দান করেন লেখক-সংঘকে। এইভাবে রাষ্ট্রের কাছ থেকেও এরা কিছুটা সাহায্য ও স্বীকৃতি পায়।

এদের চমৎকার একটি ক্লাব-ঘর আছে। আর আছে একটি

খাবার ঘর, যেখানে বসে খেলে মনে হয়, প্রাহার সেরা খাবার খাচ্ছি। রিপাবলিকের মধ্যে তিন জায়গায় তিনটে বাগান-ঘেরা প্রাসাদ এরা কিনে রেখেছে সভ্যদের ব্যবহারের জন্যে। ছবির মতো পরিবেশে এগুলি স্থাপিত। যদি কোনো লেখক শহরের কোলাহল থেকে সরে গিয়ে নির্জন শান্তিময় সুন্দর পরিবেশের মধ্যে বসে লেখার কাজে ব্যস্ত থাকতে চান বা কিছু না করে সময় কাটাতে চান, তা হলে তাঁরা অনায়াসে এই আবাসগুলিতে যেতে পারেন। এমন অনেক সময় হয় যে, কোনো লেখক-সভ্য কারখানায় বা আপিসে কাজ করেন। সে কাজ ছেড়ে দীর্ঘদিনের জন্যে বাইরে চলে গেলে তাঁর আয় হয়ে যাবে শূন্য। সেরকম ক্ষেত্রে ছ থেকে ন মাসের মতো এঁরা অনেক সভ্যকে তাঁর নিয়মিত কর্ম থেকে তুলে এনে স্টাইপেণ্ড দিয়ে আবাসে এনে রাখেন, তাঁকে নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ করবার সুযোগ দিতে।

বিদেশে যে-সব লেখক-সংঘ আছে, তার সভ্যরা এঁদের সংঘের অতিথি হয়ে প্রায়ই আসেন। এঁদের সভ্যরাও তার পরিবর্তে সেই সব দেশে যান।

জিজ্ঞেস করলুম—লিখে টাকা-পয়সা কেমন হয় ?

—প্রচুর। লেখাকেই একমাত্র পেশা করেছেন, এমন সভ্য তো অনেকেই আছেন। এ ছাড়া যাঁদের অন্য রোজগার আছে, তাঁরাও বই বিক্রির রয়ালটি পান। এই সব রয়ালটির উপর রাষ্ট্রীয় আয়করের হার খুব নীচু। এইভাবেও রাষ্ট্র লেখন-পেশাকে উৎসাহ দিয়ে আসছেন। একটা উদাহরণ দিই। ধরুন, কারো আয় মাসে ২০০০ মুদ্রা। তার আয়কর হবে মাসে ৩০০ মুদ্রা, অর্থাৎ শতকরা পনের ভাগ। কিন্তু আমাদের কোনো লেখক যদি ২০০০ মুদ্রা রয়ালটি হিসেবে পান, তা হলে সেই রয়ালটির উপর তাঁর আয়কর ধরা হবে ৬০ মুদ্রা, অর্থাৎ শতকরা মাত্র তিন ভাগ।

এদের খাবার ঘরে গিয়ে একদিন খেয়েছিলুম। দারুণ জমে

সেখানে। জায়গায় জায়গায় আড্ডা বসে যায়। দেখলুম হাত-পা ছুঁড়ে তর্ক করছেন অনেকে। আড্ডার লোভে অন্য শিল্পীরাও ঢুকে পড়েন এখানে। আমি যেদিন বসে খাচ্ছিলুম, হঠাৎ দেখি রীতিমত পরিচিত চেহারার কে একজন ঢুকছেন। ফোটোয় দেখেছি তাঁর চেহারা অনেক জায়গায়। তারপর চিনলুম বিশ্ববিখ্যাত পুতুল-নাচের স্রষ্টা ও আর্টিস্ট ঈরী ত্রংকা! এঁর 'পাপেট' ফিল্ম কত দেখেছি, তার ঠিক নেই। একদল হইহই করে উঠলেন ত্রংকাকে দেখে। টেনে নিয়ে গিয়ে বসালেন তাঁদের টেবিলে। থেকে থেকে উচ্চ হাসির রোল উঠতে লাগল সেই দিক থেকে। এর একটু পরেই দেখি দুজন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে ধীরপদে অতি প্রাচীনা এক মহিলা খাবার ঘুরে ঢুকছেন। পাশ ফিরতেই চিনলুম। এঁর ছবি প্রায়ই ছাপা হয়। চেকোস্লোভেকিয়ার সবচেয়ে বৃদ্ধা লেখিকা মারিয়ে মায়েরোভা। বয়েস বিরাশী। হাঁটতে পারেন না, কিন্তু মনের যৌবন এখনও যায়নি। সতেজ। কাঁধে ভর করে লেখকসঙ্ঘের খাবার ঘরে এসেছেন আড্ডা দেবার জন্যে।

॥ ২০ ॥

এর আগের বারে যখন চেকোস্লোভেকিয়ায় এসেছিলুম তখন দেখে গিয়েছিলুম গ্রামে-গ্রামে কৃষি-সমবায় গঠনের চেষ্টা চলেছে। চাষের জমি যাদের অধিকারে, ছোট হোক বড় হোক, সকলেরই বেশ আপত্তি ছিল জমি-জমা লাঙল গরুর ব্যক্তিগত স্বত্ব ছেড়ে দিয়ে তাকে গ্রামীণ স্বত্বের অন্তর্ভুক্ত করা। বহু দিনের বংশানুক্রমিক অভ্যেস—নিজের জিনিসটি হাত-ছাড়া করে ফেলব—তা সে যতই লোভ দেখানো হোক না কেন—এ প্রাণ চায় না। কর্তৃপক্ষ নানান যুক্তি দিয়ে বোঝাচ্ছিলেন। বলছিলেন স্বত্ব তো আর বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে না, তোমার গ্রামেই থাকছে। পাঁচ কর্তার

এক কর্তা তুমিও। আর এক কর্তা যদি হলে তো এই কমিউনিস্ট আমলে তোমায় কোণ-ঠেসা করে কার সাধ্য। এর উপর অকাট্য যুক্তি ছিল, সব জমি এক করে এক সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে বড় বড় জমি করলেই ভাল সার দেওয়ার সুবিধে হল, যন্ত্র এনে চাষ করার সুবিধে হল, চাষের খরচ কমল, উৎপাদন বাড়ল। এতে লাভ হল বেশী। কিন্তু কে শোনে কার বক্তৃতা? গ্রামের চাষীদের নিজেদের যে কথা সে তো যুক্তির কথা নয়, প্রাণের কথা। প্রাণ চায় না হাতের মুঠোয় যা আছে তা ছেড়ে দিতে। বাপ পিতেমো যখন দেনার দায়ে জমি বেচতে বাধ্য হত তখন তারা নিঃস্বই হত, ধনবান হত না, এই সত্যটাই জেগে আছে সবার মনে। তাই সেবারে বহু যুগের জগদ্দল পাথর সরিয়ে কৃষি সমবায় গঠনকে সফল করার কাজে কর্তৃপক্ষকে হিমসিম খেয়ে যেতে হচ্ছিল। অনেক জায়গায় অযথা চাপ দিতে হচ্ছিল; তার ফলে গ্রামের লোকেরা বিরক্ত হচ্ছিল, কষ্ট পাচ্ছিল, দুঃখ পাচ্ছিল।

এবারে এসে শুনলুম কৃষি সমবায় গঠনের সমস্যা প্রায় বিদূরিত। অসীম ধৈর্য নিয়ে লেগে ছিল এরা। অল্প সংখ্যক যে সব গ্রামের লোক সমবায় গঠনের দিকে এগিয়ে এসেছিল তাদের নিয়েই কাজ শুরু। আশাতীত সাফল্য পরিলক্ষিত হল। দেখতে দেখতে ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে পড়ল সমবায় আন্দোলন গ্রাম থেকে গ্রামে। চেক্ চাষীরা সংরক্ষণশীল হলেও তাদের চোখ দুটো খোলা। কাজকারবার বোঝে। গন্ধ পেয়ে গেল লাভের—স্পষ্টই দেখল সমবায়ের অন্তর্গত গ্রামের কৃষিজ উৎপাদন আগের চেয়ে বেড়ে গেছে এবং নিঃসন্দেহরূপে আরো বেশী হবে। তাই তারা আজ প্রায় সকলেই সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত। স্থানে স্থানে ঢেউ-খেলানো পাহাড়ের নীচে আজও নিজস্ব জমিতে ঘোড়ায় টানা লাঙল ঠেলে চাষী চাষ করছে এমন দৃশ্য দেখা যায়। তবে মোটামুটি ধরতে গেলে দেশের কৃষি-অর্থনীতি আজ সমবায়-ঘটিত উৎপাদনের উপরেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

দেখবার ইচ্ছে ছিল অনেক দিন ধরে। সুযোগ পেয়ে গেলুম হঠাৎ। প্রাহার উত্তরে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে 'লাবে' নদীর উর্বর উপত্যকায় পোলাবি কৃষি সমবায়। লাবে নদীর নামানুসারে পোলাবি। দুখানি পাশাপাশি গ্রামের দুটি কৃষি সমবায় একত্র করে পোলাবি নামে এই যুক্ত কৃষি সমবায়। সম্প্রতি একাধিক গ্রাম-সমবায় একত্র হয়ে যুক্ত-সমবায় গঠনের পালা চলেছে। চেক্ আদ্যক্ষর পাশাপাশি সাজিয়ে এদের বলা হচ্ছে J Z D—য়ে জে ডে। একদিন সকাল বেলা পোলাবির য়ে-জে-ডে-তে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

শুনলুম আজকের দিনে কৃষি-সমবায় গঠনের ভার যাঁদের হাতে তাঁদের একটি প্রধান সমস্যা, কেমন করে গ্রামবাসী তরুণ-তরুণীদের প্ররোচিত করবেন চাষ-বাসকেই পেশা হিসেবে নিতে। আজকাল-কার ছেলেমেয়েরা চাষ করতে চায় না, তারা চায় শহরে গিয়ে শহুরে হতে, কারখানায় কাজ করতে। কারখানায় কাজ করলে সাধারণত মাঠের কাজের চেয়ে বেশী আয় হয়। তবে এরই মধ্যে অনেক কৃষি সমবায় উৎপাদন এবং লাভের পরিমাণ এত বাড়িয়ে ফেলেছে যে তাদের সভ্যদের আয় কারখানার সমতুল্য। অচিরে সারা দেশেই কৃষির আয় বেড়ে গিয়ে শ্রমশিল্পের আয়েরই মত হয়ে দাঁড়াবে বলে এদের বিশ্বাস। কাজেই শহরের আয় আর গ্রামের আয়ের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা সাময়িক এবং সেটা নিয়ে এদের আপাতত ততটা মাথা ব্যথা নেই, যতটা আছে শহুরে জীবন আর গ্রাম্য জীবনের আকর্ষণের তারতম্য নিয়ে। কবিরা যতই বলুন 'বড় ভালো লাগে আমার পাড়াগাঁয়ে বাস' গাঁয়ের মানুষদের বিশেষ করে নবীনদের নজর কিন্তু শহরের নানা লোভের দিকে। শহরের জীবন দ্রুততর, বৈচিত্র্যময়, শহরে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা প্রায় নিরবচ্ছিন্ন। কাঁচা মনকে এ সব টানে। রোজগার করবার বয়েস এলেই গ্রামের চাষীর ছেলেমেয়েরা প্রথমেই চেষ্টা করে দেখে নিকটস্থ শহরে কোনো কাজ

পাওয়া যাবে কিনা। শহরে আজকাল আবার কাজ পাওয়া গেলেও বাসস্থান পাওয়া ভারি মুশকিল। বাড়ি বা ফ্ল্যাটের বড় অভাব। তাই অনেকেই এদের মধ্যে শহরে যেতে পারছে না, গ্রামেই থাকতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু আজ বাদে কাল শহরেও তো যথেষ্ট ফ্ল্যাট-বাড়ি তৈরি হয়ে যাবে, তখন? তাই এখন থেকেই এদের গ্রামের কর্তারা ভাবতে বসেছেন, কেমন করে গ্রামকেও যতটা সম্ভব শহরের রূপ দেওয়া যায়। গ্রামের মধ্যে এঁরা বড় বড় আবাস গড়তে শুরু করে দিয়েছেন, যেখানে প্রচুর আমোদ-প্রমোদ এবং সংস্কৃতির ব্যবস্থা থাকবে। স্কুল, কলেজ, দোকান, হাসপাতাল গড়ার কাজে আগে থেকেই এঁরা এগিয়ে ছিলেন! এই রূপান্তরের ফলে গ্রামের ঐতিহ্যময় বৈশিষ্ট্য খানিকটা নষ্ট হবে এবং গ্রাম অনেকটা শহর-ঘেঁষা চেহারা পাবে বটে কিন্তু গ্রামের ছেলেমেয়েরা অনেকাংশে গ্রামেই বাঁধা পড়ে দেশের যে অতি-গুরুত্বপূর্ণ কাজ খাদ্য-উৎপাদন তাতে সাহায্য করবে। এ না হলে সবল পুরুষ মেয়ে সবাই যদি শহরে আর কারখানায় ভিড় করে যায় তাহলে দেশে খালি যন্ত্রই উৎপাদন হবে, খাদ্য ভাণ্ডার থাকবে খালি।

আমি যখন পোলাবির য়ে-জে-ডে-র আপিসে গিয়ে পৌঁছই তখন সেখানে একটা মিটিং চলছিল। ভেবেছিলুম আমাকে পাশের ঘরে অপেক্ষা করতে বলা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না মিটিং শেষ হয়। কিন্তু অবাক হয়ে গেলুম যখন সভাপতি নিজে এসে আমায় ডেকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন—বসুন। আমাদের কাজ আমরা কেমন করে করি দেখতে আপনার নিশ্চয় খুব খারাপ লাগবে না।

সমবায়ের প্রিসিডিয়ামের মিটিং। প্রিসিডিয়াম মানে সর্বোচ্চ কমিটি—যাঁরা সমবায়ের নীতি পরিচালনা করেন। সমবায় চালনা করবার জন্যে সপ্তাহে একবার করে এঁরা মিলিত হন। তের জন সভ্য। সেদিন এগার জন উপস্থিত ছিলেন—চারজন মহিলা ও

সাতজন পুরুষ। সভাপতি নিজে ছিলেন, ট্রাক্টর চালকেরা ছিলেন, 'সামার হাউস' যাঁর তাঁবে সেই মহিলা ছিলেন, তরকারি ক্ষেতের অধিকর্ত্রী ছিলেন, ইকনমিস্ট এবং অ্যাগ্রনমিস্ট ছিলেন ইত্যাদি। এঁরা সবাই প্রিসিডিয়ামের সভ্য—সাধারণ ভাবে নির্বাচিত। সেদিন ভারি একটা অভিনব বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল। সমবায় গঠনের প্রথম ক-বছর এঁরা আগে থেকে ঠিক করতে পারেননি চাষীদের শ্রমের বিনিময়ে কত টাকা করে দিতে পারবেন। ঠিক করতে পারত বছরের শেষে লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখবার পর। সারা বছর কে কতখানি কাজ করেছে তার হিসেব রাখা হত। পয়েন্ট গুণে গুণে কাজের হিসেব। এক-শ বর্গ মিটার মাটি কোপালে হয় তো দু পয়েন্ট, এক-শ ঝুড়ি মাটি তুললে হয়তো আধ পয়েন্ট, এক মণ বীজ বুনলে হয়তো চার পয়েন্ট, কাটা গমের গোছা বাঁধলে, মাটি থেকে আলু বা বীট তুললে হয়তো ঐ রকম কিছু কিছু পয়েন্ট। এমনি সব। কোন কাজে কত শ্রম লাগে কত সময় লাগে, তা সারা দেশে হিসেব করা আছে। চাষীরা নিজেরাই দেখে শুনে হিসেব করে রেখেছে। শ্রম অনুসারে পয়েন্টের হার আগে থেকেই বাঁধা আছে। সারা বছর ধরে যার খাতায় মোট যত পয়েন্ট জমা হত তাকে সেই অনুপাতে সমবায়ের মোট লাভের অংশ বেঁটে দেওয়া হত। লাভ বেশী হলে সভ্যদের ঘরে টাকা আসত বেশী, লাভ কম হলে কম। যতই লাভ হক, কৃষি-সমবায়ের সভ্যেরা কিন্তু কারখানার কর্মীদের মত আয় করতে পারত না। তারপর হঠাৎ একটা বদল আসে গত বছর। বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের ধারা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল এবং কোন কোন সংযুক্ত কৃষি সমবায় বোধ করতে শুরু করল যে, বছরের শেষে তাদের লাভের কড়ি যা দাঁড়াবে তাতে করে সভ্যদের মাইনে প্রায় কারখানার কর্মীদের সমতুল্য করে ফেলা যেতে পারবে। পোলাবি সংযুক্ত কৃষি সমবায় এদের অন্যতম। পোলাবির যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস জন্মালো যাতে করে তারা বলতে

পারল—আমাদের চাষীদের আয়ের হার বেঁধে দিয়ে হপ্তায় হপ্তায় আমরা তাদের মাইনে দিয়ে যেতে পারব, যেমন কারখানায় দেয়। এতে কোনো অসুবিধা হবে না। গত বছর পোলাবি সমবায় এই ভাবে তার চাষীদের পীস্ রেটে মাইনে দিয়ে এসেছে। বছরের শেষে দেখা গিয়েছিল যে মাইনে হিসেবে যা সভ্য-কর্মীদের দেওয়া হয়েছে তা লাভের শতকরা আশী ভাগ মাত্র। কাজেই বাকি কুড়ি ভাগ বোনাস হিসেবে সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল।

মিটিং-এ আলোচনার বস্তু ছিল গত বছরের পীস্ রেটগুলিকে গত বছরের কাজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কি ভাবে নতুন করে কষে আরো বাড়িয়ে দেওয়া যায়। এরা অনুমান করে, এ বছর লাভ হবে আরও বেশী, কাজেই মাইনের হার বাড়ানো দরকার। তা ছাড়া হারগুলি আর একটু বাড়াতে পারলেই মোটামুটি কারখানার পীস্ রেটগুলির সঙ্গে তুলনীয় হয়ে দাঁড়ায়—তাতে করে চাষীকুল ভারি খুশী হবে। আমি গিয়ে যখন পৌঁচেছি তখন বেশীর ভাগ পীস্ রেটই নতুন হারে বাঁধা হয়ে গেছে। কয়েকটা মাত্র বাকি ছিল। সেগুলি হয়ে যেতেই যে সব কর্মী ট্রাক্টরগুলিকে সারিয়ে-সুরিয়ে কর্মক্ষম করে রাখে তাদের মাইনের কথা উঠল। যন্ত্র দেখাশোনার কাজটা এমনই যে, তার কোনো পীস্ রেট হয় না, কারণ এ কাজ এমন যে, তা কখনও সমান গতিতে চলে না এবং এমন কোনো মাপকাঠি নেই যা দিয়ে মেপে বলা যেতে পারে, এক পীস্ কাজ হল, কি দু পীস্ কাজ হল, কি তিন পীস্ কাজ হল। খানিক আলোচনার পর ঠিক হল যে এই কর্মীদের পীস্‌রেটে মাইনে দেওয়া যাবে না, এদের মাসিক বরাদ্দ ঠিক থাক ১৬০০ মুদ্রা। সামার হাউসের অধিকর্ত্রী বললেন ১৬০০ মুদ্রার চেয়ে আরও কিছু বেশী এদের পাওয়া উচিত এবং সেটা বরঞ্চ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে দেওয়া হোক। সকলের উপরে লক্ষ রাখা হোক কে কেমন কাজ করে। তারই উপর ভিত্তি

করে একটা বোনাস ভাগ করে দেওয়া হোক সকলের মধ্যে। যার কাজ সবার চেয়ে ভালো সে পাবে সবার চেয়ে বেশী।

এই প্রস্তাব গৃহীত হবার পর কিছু কিছু কাজের দরখাস্ত পেশ করা হল। সমবায়ের যে হাঁস-মুরগীর পাল আছে তা এ বছর আরো বাড়ানো হবে। এই বাড়তি হাঁস মুরগীর ভার নেবার জন্যে এক বৃদ্ধা দরখাস্ত করেছেন। কিছু আলোচনার পর দেখা গেল যে যদিও এই ধরনের হালকা কাজ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদেরই দেওয়া উচিত কিন্তু এই বিশেষ বৃদ্ধাটির বিরুদ্ধে কিছু কিছু অভিযোগ আছে। তিনি নাকি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নন। যে বৃদ্ধা মহিলা বর্তমানে হাঁস-মুরগীর দেখাশোনা করেন তাঁর সম্বন্ধে সভ্যদের অনুযোগ আছে। সারা বছরে প্রায় একশটি পাখী কম পড়েছে। কেমন করে কম পড়ল, কবে কটা রোগে মরল অথবা শেয়ালেই নিয়ে গেল কি না তার কোনো নির্ভরযোগ্য হিসেব মহিলাটি দিতে পারেন নি। কাজেই সভ্যেরা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট। বৃদ্ধা বলে তাঁকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়নি বটে কিন্তু ঐ ধরনের আরো একজনকে এ কাজে বহাল করতে অনেকের আপত্তি। কাজেই ঠিক হল আপাতত কাউকে নেওয়াই মুলতুবি থাক। সরকারের কাছ থেকে যখন বাড়তি এক হাজার মুরগী পাওয়া যাবে সেই সময় দেখা যাবে।

এর পর আলোচ্য বিষয়, প্রিসিডিয়ামের যে সব সভ্য হপ্তায় হপ্তায় মিটিং করতে আসেন, তাঁদের কোনো ফী দেওয়া হবে কি না? বিষয়টা আলোচনার জন্যে উঠতেই একজন প্রশ্ন করলেন—সভ্যেরা কি তাঁদের সাধারণ কাজের সময়ের মধ্যেই সভা করেন, না ছুটির সময় করেন? সভাপতি উত্তর দিলেন যে তাঁরা উভয় অবস্থাতেই মিটিং করেন—কখনও কাজের ক্ষতি করে কখনও বা কাজের ক্ষতি না করে—আজকে যেমন প্রায় সকলেই কাজের ক্ষতি করেই সভা করছেন। এই নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ আলোচনা চলল। অন্য কাজের ক্ষতি যাতে না হয় এভাবে মিটিংয়ের সময় নির্ধারণ করা

যায় কি? যায় না—ন-মাসে ছ-মাসে মিটিং হলেও বা হতো। হপ্তায় হপ্তায় মিটিং করতে গেলে কাজের ক্ষতি হবে; তা ছাড়া চাষবাষের নানা কাজের সময় বড় ছড়ানো। সামার হাউসের অধিকর্ত্রী বললেন—আজ এগারো বছর ধরে প্রিসিডিয়ামের সভ্যেরা বিনা ফী-য়ে মিটিং করে এসেছেন, আজ হঠাৎ ফী-য়ের কথা ওঠে কেন? প্রিসিডিয়ামের সভ্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়া একটা মস্ত সম্মানের কথা; সে ক্ষেত্রে ফী গ্রহণ করার কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না। আর একজন বললেন—বর্তমানে প্রিসিডিয়ামের জীবন তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আর গোটা চারেক মিটিং বাকি। এর পর নতুন প্রিসিডিয়াম যখন নির্বাচিত হবে তখন না হয় এই প্রশ্ন আবার তোলা যেতে পারে। সেই সময় ইকনমিস্ট বললেন—ফী দেবার সিদ্ধান্ত আগেকার এক প্লেনারি মিটিংয়েই নেওয়া হয়ে গেছে, সুতরাং ফী নেওয়া হবে কি হবে না এ নিয়ে এখানে আলোচনা করে কি লাভ? আমাদের আলোচ্য বিষয়, যে ফী-টা দেওয়া হবে তার পরিমাণ কত হবে? আসল সিদ্ধান্তের বিষয়টা ইকনমিস্ট মনে করিয়ে দেওয়ার পরেও দেখলুম সকলেরই ফী গ্রহণ করায় দারুণ অনিচ্ছা। নানা কথাবার্তার পর শেষে ঠিক হল ব্যাপারটাকে আগামী বার্ষিক প্লেনারি মিটিংয়ে আবার উত্থাপন করা হোক।

তার পরের প্রশ্ন, পোলাবি সমবায়ের দুই গ্রাম থেকে দু-জন সভ্য একখানি করে 'মস্‌কৃভা' গাড়ির জন্যে দরখাস্ত করেছিলেন, কিন্তু মাত্র একখানি মস্‌কৃভা গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে। কাকে সেটি দেওয়া হবে? মোটার গাড়ি কেনবার মতো অবস্থা এখনও খুব বেশী চাষীর নেই, তা হলেও মোটারের যা চাহিদা তা সব সময় রাষ্ট্র মেটাতে পারে না। মোটার-প্রার্থীদের অপেক্ষমান তালিকা লম্বা হয়েই চলে। তার উপর যারা লোভনীয় রুশ গাড়ি চায় তাদের অপেক্ষা করতে হয় আরো বেশী। দুর্লভ রুশ গাড়ি মস্‌কৃভা একখানি এসেছে। কাকে দেওয়া যায়? খানিক আলোচনার পর ঠিক হল যে, যখন

দু গ্রামের দু জন দরখাস্তকারী তখন বিশেষ সমস্যা নেই। খাতা পরীক্ষা করে দেখা হোক শেষবার কোন গ্রামের লোক গাড়ি পেয়েছে। এবারে অন্য গ্রামের দরখাস্তকারীকে গাড়ি দেওয়া হোক। ইকনমিস্টের উপুর ভার পড়ল এই কাজের।

সভাপতি জিজ্ঞেস করলেন—আর কোনো প্রশ্ন আছে ?

—আছে। সামনের বছরের জন্যে আমাদের নানাবিধ কৃষি যন্ত্রের প্রয়োজন। তার তালিকা দাখিল করা হয়েছে। আগামী বছরে আমাদের উৎপাদনের পরিকল্পনার সবটাই নির্ভর করছে, সেই তালিকা অনুযায়ী যন্ত্র আমরা পাবো কি পাবো না তার উপর। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন না, কী আমাদের দিতে পারবেন।

এদের কৃষিশিল্পের এই সমস্যাটার কথা আমি আগেই শুনেছিলুম। যে কোনো দেশের বর্তমান কৃষি-শিল্পকেই এই সমস্যার সন্মুখীন হতে হয়। অন্য দেশে যে-হেতু কৃষককে নিজের পয়সা দিয়ে যন্ত্র কিনতে হয় এবং সে পয়সা আসে তার অপ্রতুল সঞ্চয় থেকে, সেই কারণে কৃষি-যন্ত্রের চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু এদেশে রাষ্ট্র থেকে বিরাট বিরাট ঋণ দেওয়া হয় কৃষি সমবায়কে যন্ত্রাদি কেনবার জন্যে। উৎপাদন বাড়িয়ে গেলে কয়েক বছরের মধ্যেই তারা সেই ঋণ শোধ করে ফেলে। কিন্তু এই ঋণের অঙ্গীকারের ফলে যন্ত্রের চাহিদা হয়ে দাঁড়ায় এত বেশী যে রাষ্ট্রই শেষে আর যন্ত্র তৈরী করে দিয়ে উঠতে পারে না। কৃষিশিল্পের চমকপ্রদ বৃদ্ধির দ্রুতিতে ভাঁটা এসে পড়ে। এই রকম টানা-পোড়েনের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে এরা। কিন্তু দেখেছি এই চলারও যা গতি তা আমাদের পক্ষে রীতিমত চমকপ্রদ।

চেক্‌রা আজকের দিনে তাদের বৃদ্ধির হার আরও বাড়াতে চায়। যা হচ্ছে, এতেও তারা সন্তুষ্ট নয়। তাই থেকে-থেকে বালক-সুলভ প্রশ্ন ওঠে—ঐ যে আমরা ঐ জিনিসগুলি চেয়েছিলুম, কি হল তার ? কবে পাবো ? না পেলে চলে কি করে ?

সভাপতি বুঝিয়ে বললেন—আপনাদের তালিকা যথাযোগ্য

স্থানে পৌঁচেছে। ধৈর্য ধরুন। আমরা লেগে আছি পিছনে। কতটা আদায় করতে পারি জানতে পারবেন অচিরে।

সভার পর সভাপতি এবং সামার হাউসের অধিকর্ত্রী আমায় নিয়ে বেরলেন তাঁদের ক্ষেত খামার দেখাতে। এই সমবায়ের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য সবজি। তারপর আলু। এ ছাড়া গম বার্লি ইত্যাদি আছে। বারো শ হেকটেয়ার অর্থাৎ আট হাজার পাঁচশ বিঘে জমিতে এরা চাষ করে। মুরগী আর হাঁস মিলে পাঁচশ। গরু এক হাজার, শূয়োর দেড় হাজার। সমবায়ের সভ্য পাঁচশ। এই পাঁচশ সভ্যের ক্ষেত, লাঙল, গরু, বাছুর একত্র করে এই সমবায়। ১৯৫০ সালে এই গ্রামে গ্রাম-কৃষি সমবায় স্থাপিত হয়। তখন সভ্য সংখ্যা ছিল সত্তর। আশ্চর্যের বিষয় সেই সত্তর জনের মধ্যে তেষট্টি জনই ছিলেন মহিলা; বাকি সাতজন পুরুষ। গ্রামের মহিলারা আশ্চর্য উৎসাহে সমবায় গঠনের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। গ্রামে সে সময় কয়েকজন অতীব উৎসাহী মহিলা ছিলেন, যাঁরা এই কাজের নেতৃত্বের ভার নিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে সামার হাউসের বর্তমান অধিকর্ত্রী অন্যতমা। ১৯৫২ সালের মধ্যেই গ্রামের প্রায় সকলেই সমবায়ে যোগদান করেন। তারপর থেকে এদের ঐশ্বর্য বছরের পর বছর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে।

মেঠো পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পেলুম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটো গরুর গোয়াল। ভিতরে ঢুকে দেখলুম গোয়াল ঘরে ময়লা নেই। ময়লা এরা জমতেই দেয় না। সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার। তকতক করছে চারিদিক। প্রত্যেকটি গরু একটুকু ঘেরাওয়ের মধ্যে আলাদা। প্রত্যেকের একটি করে নাম আছে—দেয়ালের গায়ে টাঙানো। কারো সেই দিনই সবে বাচ্ছা হয়েছে। কারো বাছুর এক হপ্তার। কারো দু হপ্তার, কারো তিন হপ্তার, এমনি। নধর গরু সব। আধ মণ পর্যন্ত দুধ পাওয়া যায় এক একটার কাছ থেকে।

গোয়াল পার হয়ে কাঁচে-ঢাকা সামার হাউসে এসে ঢুকলুম।

এগার হাজার বর্গমিটার কাঁচের আবরণের তলায় এই বিরাট ক্ষেত। শীতের দেশ—বাইরে সবজি জন্মায় বছরের মধ্যে বোধ করি তিন মাস কি চার মাস। তাও আবার হঠাৎ শীত পড়ে গেলে ক্ষেত-কে-ক্ষেতের তরকারি মরে যাবে। কাঁচের ঘরে এরা তাই কৃত্রিম উত্তাপ দিয়ে শীত শেষ হবার আগে থেকেই সবজি উৎপাদন শুরু করে দেয়। অসময়ের সবজি বলে এদের ফসলের দারুণ চাহিদা। আমি যখন এদের সমবায়ে গেছি তখন মধ্য-জানুয়ারী। শীতের চূড়ান্ত। একটি ঘাস পর্যন্ত গজাবার কথা নয়। সেই সময় এরা আমায় সেই কাঁচের ঘরে ঢুকিয়ে একেবারে তাজ্জব বানিয়ে দিল। প্রকাণ্ড এক ক্ষেত পেঁয়াজ হচ্ছে। প্রকাণ্ড এক ক্ষেত কপি। ঐ শীতে কোথাওই ফুল হয় না—এরা কাঁচের আচ্ছাদনের তলায় ফুলের গাছের বন লাগিয়ে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস আসন্ন—সেদিন প্রচুর ফুল লাগবে সারা দেশে। এরা প্রাহার ফুলের চাহিদা মেটাবে খানিকটা, তাই এই আয়োজন। তার পরের ঘরটা হল ওলকপির। সবুজের ঢেউ। জানুয়ারী মাসের হাড়-কাঁপানি শীতে এতখানি সবুজ দেখা মস্ত একটা ভাগ্যের কথা। ওলকপি প্রায় তৈরি। একদল মেয়ে ব্রিগাডা করতে এসেছিল ওলকপির ক্ষেতে। ওলকপির চারিদিকের মাটি খুঁড়ে আলগা করে দিচ্ছিল। অধিকর্ত্রীর ইঙ্গিতে তাদের একজন খানকতক ওলকপি মাটি থেকে উপড়ে নিয়ে এল। অধিকর্ত্রী আমায় জিজ্ঞেস করলেন—আপনার ছুরি আছে ?

—ছুরি ? অ্যাঁ ? না ছুরি নেই তো।

চেক্‌রা ছেলে বুড়ো সবাই সব সময় পকেটে করে একখানা চকচকে পেন্সিল-কাটা ছুরি নিয়ে বেড়ায়। পেন্সিল তো কাটেই, তা ছাড়া আপেল কাটা থেকে আরম্ভ করে গাছের ডাল কাটা পর্যন্ত সব কাজেই লাগায়। আমি তো আর চেক্ নই, কাজেই আমি ছুরি কোত্থেকে পাব ? ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

সভাপতি ততক্ষণে জলের কল থেকে ওলকপিগুলি ধুয়ে এনেছেন। বললেন—নিন, আমার ছুরি দিয়ে কেটে দিই। খেয়ে দেখুন একটা।

—ওঃ এই ব্যাপার? দিন দিন, দাঁত দিয়ে কামড়ে খাবো!

বলে হাত থেকে খাবলে ওলকপিটা তুলে নিয়ে দিলুম এক কামড় বসিয়ে। আঃ কি রসাল, কি মিষ্টি ওলকপি। চমৎকার লাগল খেতে।

চেক্‌রা নিজেদের ওলকপি ছুরি দিয়ে কাটতে কাটতে ঘাড় নেড়ে বললেন—হায় রে, আমদেরও যদি ঐরকম দাঁত থাকত!

ওলকপি চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে এলুম। বাড়ি ফেরবার সময় হয়ে এসেছিল। আপিস ঘরের দিকে এগোচ্ছিলুম। সভাপতি বললেন—আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী আমাদের বাৎসরিক সাধারণ সভা। আসুন না সেইদিন। চাষাভুষোরা কেমন করে সভা করে দেখবেন।

আমি বললুম—বাৎসরিক সভায় আমায় ডাকছেন? আমায় কি বক্তৃতা দিতে হবে নাকি?

—আরে না মশায়। খাবেন-দাবেন গান-বাজনা শুনবেন। চান তো নাচবেন। আজকে দেখলেন কাজ; সেদিন দেখবেন কাজের নামে আমরা কেমন ফূর্তি করে নিই।

—কি রকম প্রোগ্রাম শুনি?

—একটার সময় সভা আরম্ভ। গত বছরের কাজের রিপোর্ট পাঠ চলবে এক ঘণ্টা। তারপর এক ঘণ্টা ধরে ভোজ। ভোজের পর আর এক ঘণ্টা আগামী বছরের কাজের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা। তারপর নাচ, গান, নানারকম প্রোগ্রাম। আপনার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সবাইকে নিয়ে আসবেন। ভুলবেন না কিন্তু। ৯ই ফেব্রুয়ারী মনে থাকবে তো?

এই বলে সভাপতি এবং আর সকলে আমায় গাড়িতে তুলে দিলেন। গাড়ির সোফার মধ্যে ডুবে নিজের মনে আমি বললুম—এই হল পোলাবি কৃষি সমবায়। দুই গ্রামের যুক্ত সমবায়।

দুখানি মাত্র গ্রাম—এক গ্রামের লোক সংখ্যা বার শ, অন্য গ্রামটির এক হাজার। আমাদের দেশের যে-কোনো দুটি গ্রামেরই মতো —তাদের থেকে একটুও বড় নয়। নগণ্য গ্রাম—অথচ কতই না করেছে!

॥ ২১ ॥

চেকোস্লোভেকিয়ায় সব রকম দরকারী কাজকেই উপযুক্ত মূল্যে যাচাই করা হয় এটা জেনেছি। তার ফলে আমাদের দেশে যে ধরণের মান পরিমাণে আমরা অভ্যস্ত এখানে প্রায়ই তার উল্টো পাল্টা দেখা যায়। কলম পিষতে পারলে চেয়ারে বসেই আমাদের দেশে হাতুড়ি-পেটা কারিগরের চেয়ে বেশী মাইনে পাওয়া যায়। এখানে তা নয়। হাতুড়ি যারা পেটে, ইঁট যারা গাঁথে তাদের রোজগার অনেক সময় কলম-পেশা কেরানীর চেয়ে বেশী। তারপর ডাক্তার উকিলদের কথা ধরা যাক। নাম করা ডাক্তার, নামকরা উকিল বা ব্যারিস্টার, যাদের চাহিদা বেশী, আমাদের দেশে তাঁরা যত খুশী ফী বাড়িয়ে নিজেদের বাজারকে গরম রাখতে পারেন। প্রচুর বিত্তের অধিকারী হতে পারেন। চেকোস্লোভেকিয়ায় ডাক্তারের মাইনে বাঁধা। কোনো ডাক্তারই, তা তিনি যতই চতুর হোন না কেন, রোগীর কাছ থেকে তাঁর বিদ্যার এবং চাহিদার গুরুত্ব অনুযায়ী ফী আদায় করতে পারবেন না। জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন রাষ্ট্র। রোগীর কাছ থেকে তার চিকিৎসার জন্যে এক পয়সাও খরচ নেওয়া হবে না। রাষ্ট্র উপযুক্ত মাইনে দিয়ে চিকিৎসক নিয়োগ করবেন এবং সেই মাইনের বিনিময়ে ডাক্তার করবেন চিকিৎসা। বলা যেতে পারে ডাক্তারদের জনসেবার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। তা যদি বলা যেতে পারে তাহলে অন্য যারা জন-সেবার কাজে নিযুক্ত, যেমন খনি-মজুর তাদের চেয়ে ডাক্তারদের

মাইনে বেশী হবে কেন? এই হল যুক্তি। এই যুক্তির বলেই জনসেবী ডাক্তারদের মাইনে যে হারে বাঁধা, জনসেবী খনিমজুরের আয়ও সেই হারে বাঁধা। আমাদের দেশে আইনজীবী অনেক—দশজন বন্ধুর মধ্যে দু-একজন আইনজীবী সব সময় বেরিয়ে যায়। এখানেও এক সময় উকিলের সংখ্যা বড় কম ছিল না। ব্যক্তিগত জোত জমি সম্পত্তি যখন প্রচুর ছিল তখন মামলা মোকদ্দমা ছিল সেই অনুপাতে। এখন সম্পত্তি বলতে বড় জোর একখানা মোটার গাড়ি না হলে একখানা "উইক্-এণ্ড হাউস" আর বড় জোর নিজের ফ্ল্যাটখানা। মামলা মোকদ্দমা হবে কোত্থেকে? উকিলদের আর সে দিন নেই। আমাদের দেশ হলে সব বেকার হয়ে যেত। এখানে তো বেকার হবার উপায় নেই। কাজেই সবাই পেশা বদলে ফেলেছে। অনেকেই হয়তো খনিতে কাজ নিয়েছে। এদেশে জনস্বাস্থ্য রক্ষা যেমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ, তেমনি খনিজ সম্পদ মাটির গভীর গহ্বর থেকে তুলে এনে দেশের ঐশ্বর্য বাড়ানো সেই রকমই দরকারী কাজ। এ সত্য শুধু এ দেশে নয়, হয়তো আমাদের দেশে এবং অন্যান্য দেশেও খাটে। কিন্তু কাজের গুরুত্ব দুই ক্ষেত্রে সমান হলেও একমাত্র সোশালিস্ট দেশগুলিতেই বোধ হয় দুই কাজের পারিশ্রমিক সমহারে দেওয়া হয়। অন্যান্য দেশে হয় না!

আমার বন্ধু শান্তিপ্রিয় বসু যখন ওয়েল্‌সের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছিলেন সেই সময় তার ওয়েল্‌সের একটি খনি-মজুরের ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়। ওয়েল্‌সের নানা দিকে ছড়ানো বহু কয়লার খনি। বেশীর ভাগই জমিদারের সম্পত্তি—তাঁরা সব মস্ত বড় লোক। খনি-মজুরের ছেলেটির ভারি ইচ্ছে শান্তিপ্রিয়কে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে একদিন খাওয়ায়। সে জানালো সে কথা শান্তিপ্রিয়কে। জানিয়ে বলল, তুমি যদি আমায় আড়াই শিলিং দাও তাহলেই আমার পক্ষে তোমাকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো সম্ভব। শান্তিপ্রিয় অবশ্য খুশী হয়েই আড়াই শিলিং দিয়েছিলেন, নিমন্ত্রণ খেয়ে

এবং পরম আপ্যায়নে তুষ্টও হয়েছিলেন। তবু সমস্ত ঘটনাটার মধ্যে একটা দুঃখের খোঁচা থেকে গেছে, সেটা হচ্ছে—কেন এই অবিচার? যারা আর সবারই মতো ওয়েল্‌সের সমৃদ্ধি গড়ার সাহায্য করছে তারা কেন এমন ভাবে বঞ্চিত থেকে যাবে?

এদের দেশে এই ধরনের অবিচারের অবসান ঘটেছে এবং খনি-মজুরদের ক্ষেত্রেই না কি সেটা সব চেয়ে প্রতীয়মান। অনেকদিন থেকে একটা খনি দেখবার ইচ্ছে ছিল। জুটেও গেল সুযোগ। প্রাহার দক্ষিণ-পশ্চিমে ষাট কিলোমিটার দূরে প্রিব্রাম নামে একটি খুব পুরোনো ঐতিহাসিক শহর। আজ থেকে ছ'শ বছর পূর্বে এই শহর তৈরি হয়েছিল একখানি রূপোর খনিকে ঘিরে। শহরের যে গির্জে এবং মঠ তার সন্ন্যাসী এবং যাজকেরাই ছিলেন এই খনির স্বত্বাধিকারী। রূপো উঠত খনি থেকে—প্রচুর লাভ হত তাই। পরে আশে পাশে আরো অনেক রকম খনি আবিষ্কৃত হতে থাকে। সেই সব খনি থেকে প্রথম দিকে রূপোই পাওয়া যেত বেশী; পরে তামা, লোহা, সিসে এবং শেষে আধুনিককালে ইউরেনিয়াম পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

ডাঃ ইলিক্‌ এই শহরে তাঁর গাড়ি করে আমায় খনি দেখাতে নিয়ে চললেন। জানুয়ারির শেষ। রাত্রে টাটকা বরফ পড়ে গেছে প্রচুর। কিন্তু সকাল বেলা রোদ একেবারে ঝলোমলো। বরফের উপর সেই রোদ পড়ায় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। ভারি মনোহর শীতের সকাল। বরফে ঢাকা রোদে ভরা বনের মধ্যে দিয়ে পথ। সেই পথ পার হয়ে বেলা এগারটার সময় আমরা প্রিব্রামে এসে পৌঁছলুম। ইউরেনিয়ামের খনিতে বাইরের লোকের প্রবেশ নিষেধ। কাজেই আমরা হাজির হলুম অন্য একটি খনির দরজায়।

আগে থেকে খবর দেওয়া হয়েছিল, তাই দ্বারে উপস্থিত ছিলেন খনির ম্যানেজার। বয়স বোধ করি ত্রিশের নিচেই। আজকালকার চেকোস্লোভেকিয়ায় কমবয়সী যোগ্য ব্যক্তিদের শীর্ষ স্থানে বসিয়ে

সংগঠন চালানোর পরীক্ষা চলেছে খুব। শুনছি এদের তাতে বিশেষ কিছু অসুবিধা হচ্ছে না। বরং সুবিধেই হচ্ছে। এ খনিটি প্রথম যখন খুঁড়তে আরম্ভ করা হয় তখন পাওয়া যায় রূপো। রূপো শেষ হয়ে যাবার পর তার নিচের স্তরে পাওয়া যায় লোহা। তার নিচে তামা, তার নিচে আবার লোহা এবং কিছু কিছু সিসে। এখন শুধু সিসেই বেরোচ্ছে। এর নিচের স্তরে আরো খনিজ পদার্থ আছে। কি আছে তা এখনও ঠিক মত জানা যায়নি। ম্যানেজার তাঁর আপিস ঘরে নিয়ে গিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করলেন—কি দেখবার ইচ্ছে আপনার বলুন?

আমি বললুম—আমার ইচ্ছে মাটির নিচে নেমে খনির কাজ দেখা।

ম্যানেজার বললেন—বেশ, তারই ব্যবস্থা করছি তা হলে। কিন্তু নিচে এখন দেয়ালের গায়ে ডিনামাইট লাগানো হচ্ছে—আধ ঘণ্টার মধ্যে ফাটানো শুরু হবে। ফাটানোর কাজ শেষ হয়ে গেলে পরে নিচে নামতে পারেন। তার আগে বরং চলুন আমাদের অন্যান্য ব্যবস্থাগুলি দেখাই।

যেদিক দিয়ে মজুররা খনিতে ঢোকে সেদিকের প্রথম ঘরটি কাপড় ছাড়বার ঘর। কড়িকাঠের গায়ে সারি সারি আংটা লাগানো। সেই আংটা থেকে ঝুলছে লম্বা লম্বা লোহার চেন। মজুররা যখন এ ঘরে ঢোকে তখন তারা তাদের ভদ্রপোশাক খুলে রেখে খনি-গহ্বরে প্রবেশ করবার হালকা ঢিলে পোশাক পরে। এই সব খনির পোশাক টাঙানো থাকে কড়িকাঠ থেকে ঝোলানো ঐ চেনের সঙ্গে। নম্বর করা প্রত্যেক মজুরের আলাদা আলাদা পোশাক। চেন থেকে দেখলুম দু-চারখানি মাত্র পোশাক ঝুলছে—যারা সেদিন কাজে আসতে পারেনি শুধু তাদেরই। বাদ বাকি সবই খালি—খনির পোশাক পরে মজুররা নিচে নেমেছে। শুনলুম, যখন সবাই ফিরে আসবে তখন তাদের ছাড়া-পোশাক

চেন টেনে কড়িকাঠের কাছে টেনে তোলা হবে এবং ঘর বন্ধ করে গ্যাস ছেড়ে তাদের নির্বীজিত করা হবে।

ম্যানেজার বললেন—আপনি আর ডাঃ ইলিক্ যখন নিচে নামবেন আপনাদের এক প্রস্থ করে নতুন কাপড় দেব।

ভারতবর্ষের খনি মজুরেরা খনিতে ঢোকবার সময় আলাদা পোশাক পায় কি না এবং তাদের পোশাক ডিস্ইনফেক্ট করা হয় কি না আমার জানা ছিল না। তবে আমার যত দূর মনে হয়, বাড়ি থেকে যে ছেঁড়া ময়লা ঘেমো গেঞ্জি পরে তারা আসে সেই ঘেমো ময়লা গেঞ্জি পরেই তারা খনির মধ্যে ঢোকে এবং বাড়ি যায়। যাই হোক, ভাগ্যিস ওঁরা কোনো প্রশ্ন করেন নি তাই আমাকেও জবাব দিতে হয় নি। এর পর স্নানের ঘরে ঢুকলুম। মজুররা ধুলো কাদা মেখে গহ্বর থেকে উঠে এখানে ঝাঁঝরির গরম জলে স্নান করে নেয় এবং গরম হাওয়ার দমকায় গা মাথা শুকিয়ে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। তারপর যখন ইস্ত্রি করা পশমী কোট প্যাণ্ট পরে সিগারেট মুখে দিয়ে পরম পরিতৃপ্তি ভরে বাড়ির দিকে এগোয়, কে বলবে তারা খনির মজুর? স্নানের ঘরের পাশে ক্লিনিক। সেখানে হৃদযন্ত্র এবং ফুসফুস চেক করা হয়। তিন হাজার ফিট নিচে শ্রমের কঠোরতায় দেহের যন্ত্রের উপর ধকল আসতে পারে যে কোনো সময়, তাই নিয়মিত ভাবে তাদের পরীক্ষার এবং দরকার হলে চিকিৎসার প্রয়োজন। আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে নাকের মধ্যে কাঁচের নল ঢুকিয়ে ভস্‌ভস্ করে স্প্রে করে দিল। বললে—জীবাণু-শূন্য হয়ে গেল আপনার মুখের ভিতরটা। কেমন লাগছে?

আমি বললুম—একেবারে শূন্য লাগছে।

—মানে? কি শূন্য লাগছে?

আমি বললুম—পেট। গলার মধ্য দিয়ে বোধ হয় পেট অবধি পৌঁচেছে আপনাদের ওষুধ। মনে হচ্ছে পেটের মধ্যে আর কিছু নেই।

ম্যানেজার হো হো করে হেসে বললেন—চলুন তাহলে খাবার ঘরে যাওয়া যাক।

চললুম আমরা সংস্কৃতি-আবাসে। সেখানেই খাবার ঘর। প্রকাণ্ড এই আবাস। এখানে যত খনি আছে তাদের গত কয়েক বছরের লাভের কড়িতে এই বিরাট সৌধ তৈরি হয়েছে। এখানে আছে থিয়েটারের স্টেজ, সিনেমা, ছোটদের জন্যে পুতুল নাচের মস্ত থিয়েটার, বক্তৃতার হল, প্রদর্শনীর হল, রেস্তরাঁ, কফিখানা এবং রাত্রিবাসের হোটেল।

ম্যানেজারে সঙ্গে বসে অতি উপাদেয় লাঞ্চ খেলুম। ম্যানেজার ছেলে-বয়সে লেখাপড়া করতে পেরেছিলেন মাত্র তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় কিছুই লেখাপড়া শেখেন নি। লেখাপড়া ছেড়ে তাঁকে এক রুটিওয়ালার সহকারীর কাজ নিতে হয়। সেটা ছেড়ে দিয়ে খনির কাজে ঢোকেন খনি-মজুর হিসেবে। এখানে তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা যেমন বাড়ে তেমনি খনি বিষয়ক কিছু বইও নিজের চেষ্টায় পড়তে থাকেন। নেতৃত্ব গুণ ছিল। শীঘ্রই তিনি মজুরদের ছোট একটি দলের নেতা হন এবং তারপর ক্রমে হন ম্যানেজার। প্রধানত তাঁর জনপ্রিয়তা এবং নেতৃত্ব গুণের জন্যেই তিনি সর্বসম্মতিক্রমে ম্যানেজার নিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু তাঁকে ম্যানেজার পদে উন্নীত করার সঙ্গে সঙ্গে বলে দেওয়া হয়েছে যে এইবার ভাল করে তাঁকে লেখাপড়া শিখে নিতে হবে। আপাতত তিনি খনি-ইঞ্জিনীয়ারিং, ভূতত্ত্ববিদ্যা এবং পদার্থবিদ্যা নিয়ে রীতিমত পড়াশুনা করছেন।

এখানে উপর থেকে ঠিক করে ম্যানেজার চাপানো হয় না শ্রমিকদের ঘাড়ে। শ্রমিকেরা নিচের থেকেই নির্বাচন করতে থাকে তাদের নেতাদের এবং তারই ফলে নেতৃপতি বা ম্যানেজার নির্বাচিত হয়ে যান। যাঁর উপর শ্রমিকদের বিশ্বাস আছে, যাঁর উপর তারা নির্ভর করতে পারে, যাঁর নেতৃত্ব তারা মেনে নিতে পারে

তিনিই হন নেতা। তাঁর যদি টেকনিক্যাল গুণ না থাকে তাহলেও নেতা নির্বাচিত হয়ে যাবার পর নেতাকে বলে দেওয়া হয়, তোমার টেকনিক্যাল বিদ্যায় যেটুকু ঘাটতি আছে সেটুকু পড়ে শুনে যথা শীঘ্র পূরণ করে নাও। এই বিচিত্র প্রণালী আমাদের দেশের প্রথার একেবারে ঠিক উল্টো। আমাদের দেশে পরীক্ষা পাশের মাপকাঠি দিয়ে একজনকে বেছে ম্যানেজার হিসেবে বসিয়ে দেওয়া হয়। তারপর তিনি শ্রমিক কুলের উপর নেতৃত্ব করতে পারেন তো ভালই ; না পারলেও ক্ষতি নেই। শুধু তাঁর নিজের কয়েকজন পেটোয়া লোকের উপর নেতৃত্ব এবং প্রভুত্ব করলেই চলবে।

ছুটোর সময় ফিরে গেলুম আমরা খনিতে। সেখানে ডাঃ ইলিক্ আর আমি আমাদের গরম কাপড় খুলে হালকা সুতির নীল রংয়ের আঙরাখা পরলুম—খনি-মজুরেরা যে রকম পরে। ম্যানেজারের সহকারীও সেই রকম একটা পোশাক পরে আমাদের সঙ্গে খনি-গর্ভে নামার জন্যে প্রস্তুত হলেন। পায়ে উঁচু রবারের 'গালশ্' পরে আমরা দরজা পার হয়ে একটা উঠোনের মধ্যে এসে হাজির হলুম। সেদিন বোধ হয় শূন্যের নিচে দশ ডিগ্রি ঠাণ্ডা। বাপ্‌রে, খোলা উঠোনে সে কী শীত! ফিনফিনে কাপড়ে জমে যাই আর কি! তবে বেশীক্ষণ নয়, উঠোনটুকু পার হতে যতটুকু সময় লাগে। তারপর আবার উত্তাপময় একটি হলে গিয়ে ঢুকলুম। সেইখানেই খনির প্রবেশদ্বার। হাতে একটি গ্যাসের বাতি আর গলায় একখানি অক্সিজেন ভরা বাক্স ঝুলিয়ে মাথায় একটি লোহার শিরস্ত্রাণ পরে লিফ্‌ট্-এর সামনে গিয়ে আমরা দাঁড়ালুম।

হেলতে দুলতে নেমে চললো লিফ্‌ট্—প্রথমটা আস্তে তারপর বিদ্যুৎবেগে। হাওয়ার তোড়ে মনে হল আমাদের ক্ষুদ্র বাতিটি ফুস্ করে নিভে যাবে। কিন্তু নিভল না। আমরা এক হাজার মিটার অর্থাৎ তিন হাজার ফিটেরও নিচে নেমে চললুম এবং

অধোগতির প্রতি মিটারের সঙ্গে উত্তাপও বেড়ে চলল। নিচে যখন পৌঁছলুম, দেখি দেশের মতো গরম—সুতির কাপড় দিব্যি গায়ে চলে। লিফ্‌ট্‌ থেকে বেরিয়ে আধো-অন্ধকার লম্বা একটা সুঁড়ি রাস্তা দিয়ে দীপ হাতে আমরা এগিয়ে চললুম। পায়ের তলায় রেলের লাইন। তার উপর দিয়ে খালি মালগাড়ি ঠেলে নিয়ে চলেছে শ্রমিকেরা। এক জায়গায় যেখানে দু-জোড়া লাইন এসে মিলিত হয়েছে, দেখলুম কটা মালগাড়ি লাইনচ্যুত হয়ে পড়েছে, আর তিনজন কর্মী তাদের পেশীবহুল হাত আর যন্ত্রের সাহায্যে এবং ঘর্মাক্ত কলেবরে তাদের তুলে দাঁড় করাবার প্রচণ্ড চেষ্টা করছে। প্রায় এক কিলোমিটার পথ হেঁটে আমরা যেখানে গিয়ে পৌঁছলুম সেখানে সুড়ঙ্গর ছাদ এত নিচু হয়ে এসেছে যে, হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়। হামাগুড়ি দিয়ে খানিকটা এগিয়ে দেখলুম সেইখানেই সুড়ঙ্গের শেষ। কিছুক্ষণ আগে ডিনামাইট দিয়ে সেখানকার পাথর ফাটানো হয়েছে। চারিদিকে চাংড়া চাংড়া পাথর বিস্রস্তভাবে ছড়ানো। সেই পাথর টপকে গুহার বন্ধ দেয়ালের কাছে গিয়ে দেখলুম উজ্জ্বল আলো জ্বেলে প্রকাণ্ড একটা ঘুরন্ত চাকার সাহায্যে গুহার দেয়ালের গা মসৃন করা চলেছে। একদল লোক ভাঙা পাথরের টুকরোগুলি মালগাড়িতে ভরছে বড় বড় বেলচার সাহায্যে। এই হল সিসের মনিক। এখানে প্রচুর কর্মব্যস্ততা। একদল কর্মী সুড়ঙ্গের নতুন ফাটানো অংশটাতে কাঠের ঠেকা দিয়ে লোহার কড়িকাঠ লাগিয়ে চলেছে। খনির কাজে এইটিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিপদ। ভাল করে ঠেকা না দিলে উপরের ছাদ ধসে পড়ে যেতে পারে। আগেকার দিনে ছাদ ঠেকা দেবার কৌশল লোকে ভালো জানত না। কয়লার খনিতে প্রায়ই ছাদ ধসে পড়ত। ধসে পড়বার আগে সাবধান হতে পারলে মানুষ পালিয়ে যেত, কিন্তু কত সময় অকস্মাৎ কয়লার ছাদ ধসে পড়ে কত মানুষকে জীবন্ত সমাধি দিয়ে দিয়েছে।

এই চেকোস্লোভেকিয়াতেই অস্ত্রাভা নামে এক কয়লার খনির শহর আছে। বহুকালের পুরোনো সব খনি সেখানে। অস্ত্রাভা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে একটি শহর আছে সেখানে গিয়ে দেখেছি বহু বাড়ি বহু রাস্তা মাটির নিচে আস্তে আস্তে বসে যাচ্ছে। কত বাড়ি দেখেছি, তাদের জানলাগুলি মাটির সঙ্গে সমান্তরাল নয় —রীতিমত এক দিকে কাত। সেই বাঁকা বাড়িতে এখনও মানুষ বাস করে, কিন্তু আর বেশীদিন করবে না। সমস্ত শহরের নিচেটা কয়লা খুঁড়ে খুঁড়ে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে। ঠেকা দেবার কৌশল ভালো রকম জানা ছিল না বলে শহর আস্তে আস্তে বসতে আরম্ভ করেছে। শহরের ভিত গেছে নড়ে। যাই হোক কর্তৃপক্ষ কিন্তু এতে দমে যান নি মোটেই। তাঁরা ঐ ধসা শহরের বাসিন্দাদের নোটিস দিয়ে রেখেছেন সকলকে শহর ছেড়ে উঠে যেতে হবে— পাঁচ কিলোমিটার দূরে এক নতুন আধুনিক শহর তৈরি হচ্ছে— প্রত্যেকে সেখানে জায়গা পাবে। নতুন শহর তৈরি হলেই তখন আবার খনন কার্য শুরু হবে মাটির নিচে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায়।

প্রিব্রামের এই খনিতে যে-ভাবে কড়িকাঠ লাগানো হচ্ছে তাতে করে খনির উপরতলায় যাঁরা বাস করেন তাঁদের বাড়ি বেঁকে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই, অথবা খনির নিচে যাঁরা কাজ করেন তাঁদেরও অকস্মাৎ সমাধিস্থ হবার আশঙ্কা নেই।

পাথর বোঝাই মালগাড়ি ডিজেল ইঞ্জিনে চালিত হয়ে এগিয়ে চলল ঝক্‌ঝক্ করে। আমরা তার পিছু ধরলুম। দেয়াল, ছাদ সব জায়গা দিয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে জল পড়ছে। মাটির নিচে তিন হাজার ফিট—আশ্চর্য লাগে উপরিতলের মুক্ত জল মাটির পথ বেয়ে কত দূর এসেছে ভেবে! পায়ের তলার মাটি কর্দমাক্ত। দেয়ালে হাত লাগালে চট্ চট্ করে। এবড়ো খেবড়ো খোঁচা খোঁচা পাথরের ছাদ জায়গায় জায়গায় এত নিচু যে মাথায় লোহার হেলমেট না থাকলে

অর্দ্ধান্ধকারে কোথায় মাথা ফেটে পড়ে থাকতুম কেউ হয়তো খুঁজেও পেত না।

সুড়ঙ্গ-যাত্রা শেষ করে লিফ্‌টে করে উপরে যখন উঠে এলুম তখন আমাদের চেহারা সত্যিই ঝোড়ো কাকের মত। সোজা গিয়ে ঢুকলুম স্নানের ঘরে। গরম জলের ফোয়ারার নীচে স্নান করলুম আরামে। ছাড়া কাপড় চলে গেল পরিষ্কার হতে। ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে যখন আবার ঢুকলুম, দেখলুম তিনি চায়ের টেবিল সাজিয়ে বসে আছেন।

চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে ম্যানেজার বললেন—চেকোস্লোভেকিয়া আপনার কেমন লাগছে বলুন।

আমি বললুম—খুবই ভাল লাগছে। খারাপ লাগবার তো এখানে কিছু খুঁজে পাইনে।

—ওটা বোধ হয় আপনার বিনয়। এই যেমন আমাদের এই চা। চা করতে আমরা তো ভালো জানি না। হয়তো আপনার খুব খারাপ লাগবে।

চায়ে একটু মুখ দিয়েই বললুম—কী আশ্চর্য! এ রকম একেবারে কলকাতার ঢংয়ের চা আপনি কেমন করে বানালেন?

চেকৃরা কফির ভক্ত। কদাচিৎ চা খায়। যখন খায় তা অত্যন্ত পাত্‌লা, প্রায় জলের মতো। চিনি দেয় কিন্তু দুধ দেয় না। কিন্তু আজকের চা যেমন কড়া, তেমনি দুধ এবং তেমনি চিনি মিশ্রিত।

ডাঃ ইলিক্ দেখি মৃদু মৃদু হাসছেন। তখন রহস্য প্রকাশ হল। ডাঃ ইলিক্ বছর কয়েক আগে কলকাতায় গিয়েছিলেন একটি বিখ্যাত চেক্ লোকনৃত্যের দলের সঙ্গে। সে সময় বাঙালী বাড়ির চা খেয়েছিলেন। বুঝলুম তিনিই শিখিয়ে দিয়েছেন কেমন করে চা দিয়ে আমায় খাতির করতে হবে।

কথায় কথায় চেক সঙ্গীত এবং অপেরা আমার কেমন লাগে এই প্রসঙ্গ উঠল। চেকোস্লোভেকিয়ার দুই শ্রেষ্ঠ অপেরা রচয়িতা

ড্ভোরাক ও স্মেটানার অপেরাগুলি আমি কতবার বিমুগ্ধ চিত্তে শুনেছি তা বললুম। ম্যানেজার লাফিয়ে উঠে বললেন—জানেন, ড্ভোরাক কোথায় বসে তাঁর 'রুসাল্কা' রচনা করেছিলেন? এইখানে এই প্রিব্রামে।

—বলেন কি?

—এখান থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে যে উচ্চ ভূমি তারই উপর আছে একটি ছোট্ট প্রাসাদ 'ভিসোকা'। তার সামনে আছে একটি ছোট্ট জলাশয়। ঐ হল রুসাল্কার হ্রদ। ড্ভোরাক ভিসোকা প্রাসাদে এসে সময় কাটাতে ভারি ভালবাসতেন। সেই জলাশয়ের ধারে বসেই তিনি জলকন্যা রুসাল্কার গান লিখেছিলেন।

ড্ভোরাকের রুসাল্কা এক অপূর্ব অপেরা। অনবদ্য তার সঙ্গীত। জলকন্যা রুসাল্কা স্থলবাসী রাজপুত্রকে ভালোবেসেছিলেন। জলকন্যা তাই হতে চাইল মানব কন্যা। হওয়া কি সহজ? এক ডাইনিকে খুশী করে পেল রুসাল্কা মানবী মূর্তি। হল রাজার বধূ। তারপর সুখের সংসারে এল দুঃখের ছায়া। রাজা এক সত্যিকারের মানবীর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। রুসাল্কাকে জানিয়ে দিলেন, সে জলের মেয়ে, সে শীতল, তার মধ্যে উষ্ণতা নেই। রুসাল্কা দুঃখের বোঝা মাথায় করে জলে ফিরে গেল। এই সহজ গল্পের উপর রচিত অপেরা। অদ্ভুত মোহময় তার সঙ্গীত। বার বার শুনেও মন আবার শুনতে চায়।

আমি বললুম সময় থাকলে ভিসোকা প্রাসাদ দেখে আসতুম একবার; কিন্তু আজ সে লোভ সংবরণ করতে হবে। এই শহরে এখানকার খনি-শ্রমিকেরা কেমন থাকেন তাই একবার দেখবার ইচ্ছে ছিল।

ম্যানেজার বললেন—তবে চলুন বেরিয়ে পড়া যাক। বাছাবাছির দরকার নেই। যে কোনো বাড়িতে ঢুকে পড়ুন। তাহলেই বেশ একটা ধারণা হবে এখানকার খনি-শ্রমিকদের জীবন-যাত্রা কেমন।

শহরের চত্বরে গিয়ে আমরা হাজির হলুম। অনেকগুলি নতুন সৌধ উঠেছে এখানে—এক একটা সৌধে খান-পঞ্চাশ করে ফ্ল্যাট। খনি-শ্রমিকেরাই এখানে থাকে। এলোপাতাড়ি একটা বাড়ি বেছে নিয়ে তার একখানি সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় গিয়ে উঠলুম। খান-পাঁচেক দরজা। প্রত্যেকটা দরজাই বন্ধ। আন্দাজে একটা দরজা বেছে নিয়ে ঘা দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল। রোগা মত একজন মহিলা বেরিয়ে এলেন।

—কি চান আপনারা ?

—এই দেখুন না, ভারতবর্ষ থেকে অতিথি এসেছেন আমাদের শহরে। ইনি এখানকার শ্রমিকদের জীবন-যাত্রা প্রত্যক্ষ করতে চান।

—সর্বনাশ! আমাদের যে সব ফ্লু! বিছানায় শুয়ে আছে সব। আমিই একমাত্র আজ একটু উঠেছি।

হল না। ফ্লু বড় ছোঁয়াচে রোগ। শ্রমিক দেখতে এসে শেষে ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবাণু নিয়ে বাড়ি যাবো? ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। অন্যত্র ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে চললুম আমরা।

দোতলার এক ফ্ল্যাটে ধাক্কা দিতেই আর এক মহিলা দরজা খুলে আমাদের ভিতরে আসতে বললেন। ফ্যাকাশে চেহারা--ইনিও সবে ফ্লু থেকে উঠেছেন। বললেন, এ পাড়ায় অর্ধেকের উপর পরিবার ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত। স্বামী কোথায় বেরিয়েছেন। দুটি ছোট মেয়ের মধ্যে একটি বাড়িতেই ছিল—অতগুলি অপরিচিতকে ঢুকতে দেখে তার খেলাঘরে গিয়ে লুকোলো। মহিলা আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফ্ল্যাট দেখালেন। ইলেকট্রিক চুল্লি, গরমজলের স্নানাগার, কাপড় কাচা কল, কার্পেট পরিষ্কার করার ভ্যাকুয়াম যন্ত্র, রেডিও, টেলিভিশান, সবই আছে। স্বামীর রোজগার মাসে তিন হাজার মুদ্রা। খনিতেই কাজ করেন। স্বচ্ছল সংসার। রোগভোগের পর মহিলাকে দুর্বল বলে মনে হল। তাই তাঁকে বেশীক্ষণ বিরক্ত না করে আমরা উঠে পড়লুম।

তারপর ঢুকলুম আর এক ফ্ল্যাটে। একটি ছোট ছেলে এসে দরজা খুলে দিল। সব অচেনা মুখ দেখে ছুটল তার মাকে ডাকতে। মা এসে আমাদের আসার উদ্দেশ্য শুনে ভিতরে ডেকে নিয়ে গেলেন। পাশের ঘর থেকে স্বামী এলেন। তারপর আমরা বসবার ঘরে গিয়ে বসলুম। কার্পেট পাতা সুসজ্জিত ঘর, চকচকে টেবিল, সোফা, কাঁচের আলমারি ভরা বই, এক পাশে পিয়ানো। ঢাকা-ওয়ালা স্নিগ্ধ ইলেকট্রিকের আলোয় ঘর ভর্তি। ইনিও খনিতে কাজ করেন। পরিবারের মধ্যে স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ে। মাইনে তিন হাজার মুদ্রা। ফ্ল্যাট ভাড়া দেন দেড় শ মুদ্রা। ঐ ভাড়ার মধ্যে ইলেকট্রিক, গ্যাস ও জলের খরচ অন্তর্ভুক্ত। ইনি ছেলেবেলায় লেখাপড়া শিখেছিলেন স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত। তারপর খনিতে চাকরি নিয়ে যান। ১৯৪৮ সালে শ্রমিকদের মিলিশিয়াতে যোগ দেন এবং সেই পদে বিশেষ সম্মানিত হন। পরে কমিউনিস্ট পার্টিতেও যোগ দিয়েছেন। কাজ করতে করতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠ নিতে শুরু করেন। এখন ইনি একজন পাস করা খনি-ইঞ্জিনিয়ার।

কর্ত্রী কফি বানাতে গিয়েছিলেন। ট্রে-তে বাষ্পায়িত কফির পেয়ালা আর কেকের টুকরো সাজিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

জিজ্ঞেস করলুম—আপনি সারাদিন কি করেন? সংসার নিয়ে থাকেন?

—মোটেই না। চাকরি করি কর্তারই মতো।

—সে কি, আপনার স্বামীর এত রোজগার, তবু আপনি কাজ করেন কেন?

—এখানে মেয়েদের মধ্যে কে বসে আছে বলুন? তা ছাড়া আমরা একটা মোটার কেনবার জন্যে টাকা জমাচ্ছি।

—মোটার কিনে কি করবেন?

—সমুদ্র দেখতে যাবো। আমার ছেলেমেয়েরা সমুদ্র দেখবার

জন্যে পাগল। আমি নিজেও কম নই। কখনো দেখি নি। উনি বরং একবার দেখেছেন অনেক কাল আগে।

এদেশের মেয়েরা যাতে সবাই চাকরি গ্রহণ করতে পারে তার নানা রকম ব্যবস্থা এবং কায়দা। প্রথমত মেয়েদের করবার মতো কাজ এদেশে প্রচুর আছে। দ্বিতীয়ত সংসার পালনের যে সব ঝঞ্ঝাট মেয়েদের বাইরে কাজ নেওয়ার প্রধান প্রতিবন্ধক তা প্রায় লোপ পেয়েছে। ছেলেমেয়ে যখন খুব কচি তখন অবশ্য মা নিরুপায়, কিন্তু শিশুর নার্সারি স্কুলে যাবার বয়েস হলেই মা মুক্ত। সকাল থেকে আরম্ভ করে বেলা দুটো অবধি ছেলেপিলের সম্পূর্ণ ভার স্কুল-কর্তৃপক্ষই নেন। খুব যোগ্য ভাবেই নেন। মা-বাপের কোনো ভাবনা থাকে না। বেলা দুটো পর্যন্ত এদের কর্ম-জীবন; দুটোর পর থেকে পারিবারিক জীবন শুরু। খাওয়া তার আগেই হয়ে গেছে। এদেশে কাঁচা মাল কিনে এনে বাড়িতে রাঁধলে সংসারের কোনো সুসার হয় না। লণ্ডনে ছাত্রাবস্থায় আমি যখন-যখন নিজে হাতে রেঁধে খেয়েছি আমার খাবার খরচ পড়ত হোটেলের খাবারের তিন ভাগের এক ভাগ কি চার ভাগের এক ভাগ। এখানে রেঁধে দেখেছি, খরচ পড়ে হোটেল-খরচার প্রায় বারো আনা। খাটুনিই পোষায় না। আগেকার দিনের চেকোস্লোভেকিয়ার গিন্নীদের যে এক মস্ত গর্ব ছিল, নিজে হাতে রান্না করে স্বামীর একটা মস্ত সাশ্রয় করে দিচ্ছেন, তা আর আজকের দিনে খাটেনা। আজকাল স্বামীকে সাহায্য করতে চাও তো চাকরি কর। নানা রকম কেক তৈরি আগেকার চেক গিন্নীদের ছিল এক মস্ত ব্যসন। কুচি কুচি করে আপেল কেটে ময়দার আস্তরণের মধ্যে পরতে পরতে পুরে চিনি আর মাখনের প্রলেপ দিয়ে অপূর্ব আপেলের স্ট্রুড্‌ল্ বানাতে তাঁদের যে কত সময় লাগত তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। আজকাল আর চেক মেয়েরা আপেলের স্ট্রুড্‌ল্ তৈরি করে না। রাস্তা

দিয়ে কেক রুটির গাড়ি যায়, তার গায়ে গায়ে বড় বড় করে লেখা—

আর নেই দরকার
ঘরে ঘরে নিজ-হাতে মিষ্টি করবার।

কেকের গাড়ির মধ্যেই আজকাল সব পাওয়া যায়। আপেলের স্ট্ ড্‌ল্ পর্যন্ত।

গৃহলক্ষ্মীর হাতের সযত্নে রচিত খাদ্য আজ আর চেক্ গৃহে নেই বটে কিন্তু রোজগার বেড়েছে অনেক—প্রতি গৃহই হয়েছে শ্রীমন্ত।

কর্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলুম—আপনার ছুটি-ছাঁটা কি রকম?

—বছরে এক মাস।

—সে সময় কি করেন?

—সবাই মিলে বেরিয়ে পড়ি। একদিনের জন্যেও বাড়িতে থাকি না।

—তাতে অনেক খরচ হয় তো?

—তা হয়। ছুটির আমোদের জন্যেই সারা বছর ধরে আমরা জমাই। আর তো কিছুর জন্যে টাকা জমাবার আমাদের দরকার হয় না। এ ছাড়া ওঁর খনি থেকেও মাঝে মাঝে পরিভ্রমণের ব্যবস্থা হয়—তাতে শ্রমিকেরা তাদের পরিবারকেও নিয়ে যেতে পারে। এগুলি খুব সস্তা। গত বছর আমরা দক্ষিণে গিয়েছিলুম। বাসের স্বাভাবিক ভাড়া হত ১৮০ মুদ্রা। আমরা সকলে মিলে দিয়েছিলুম মাত্র ৩০ মুদ্রা।

কফি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটি লাজুক লাজুক মুখ করে এগিয়ে এসে বললে—আপনার কাছে ভারতবর্ষের কোনো স্ট্যাম্প আছে?

ব্যাগের মধ্যে দেশের চিঠি ছিল। তার থেকে ছিঁড়ে তার হাতে দিয়ে বললুম—তুমি স্ট্যাম্প জমাও বুঝি? তোমার ঠিকানা লিখে দাও। প্রাহায় ফিরে গিয়ে আরো পাঠিয়ে দেব।

খনি দেখা, খনি-মজুর দেখা শেষ হল। চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি ফিরলুম।

॥ ২২ ॥

জানুয়ারী মাস। প্রচণ্ড শীত। বরফ পড়ে চারিদিক সাদা। আগুন জ্বেলে যতক্ষণ ঘরের মধ্যে থাকা যায় ততক্ষণই আরাম। বাইরে বেরলেই অস্বস্তি। সেই সময় কাগজে খবর বেরতে থাকল ইয়োরোপের নানা দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জার হিড়িক শুরু হয়েছে। এক দেশ থেকে অপর দেশে ছড়িয়ে পড়ছে ইনফ্লুয়েঞ্জার ছোঁয়াচ—দিক-বিদিকে ছুটেছে যেন ঘোড়ায় চড়ে। চেকোস্লোভেকিয়া তখনও ফ্লুর ছোঁয়াচমুক্ত। কিন্তু ক-দিনই বা? পাহাড় ঘেরা ছোট্ট দেশটি হয়তো মানব-শত্রুর আক্রমণ ঠেকিয়ে মুক্ত রাখতে পারে নিজেকে। কিন্তু অণু-জীবাণুর আক্রমণ ঠেকানো অত সহজ নয়। পাহাড়ের চূড়ো, বরফের বেড়া টপকে সবার অদৃশ্যে ঢুকে পড়লো একদিন ইনফ্লুয়েঞ্জার স্রোত চেকোস্লোভেকিয়ার মাটিতে। প্রথমে প্রায় সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে। তারপর ক্রমে প্রকাশ হল তার স্বরূপ। হঠাৎ একদিন কাগজে পড়া গেল যে দু-একটা ফ্লুর কেস হয়েছে এ শহরে ও শহরে। তারপর অনেক। তার পরই আগুন লাগার মত ছড়িয়ে পড়ল দিকে-দিকে। চেকরা এ ক্ষেত্রে যা করবার তাই করল। যা ছড়িয়েছে ছড়িয়েছে, যাতে আরও না ছড়ায়, বিশেষতঃ ছেলেপিলেদের মধ্যে না ছড়ায়, এই ভয়ে সমস্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দিল।

মিতু এসে একদিন খবর দিলে—বাবা, স্কুল বন্ধ হয়ে গেল—খ্রিপ্‌কা!

খ্রিপ্‌কা মানে ফ্লু।

লামি এসে খবর দিলে—মা, কলেজ বন্ধ হয়ে গেল—খ্রিপ্‌কা!

আমার কর্মস্থলে গিয়েও দেখি সেই ব্যাপার। বন্ধ হয়নি বটে, কিন্তু বহু সহকর্মী অনুপস্থিত—ঘরে ঘরে খ্‌প্‌কা!

আমরাও তাই সভয়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম, কবে খ্‌প্‌কা এসে আমাদের ধরে। কিন্তু আমাদের কিছুই হল না। ভারতীয় দূতাবাসে খবর নিলুম, সেখানে এক ভালা-সায়েব ছাড়া আর কেউই ফ্লু-তে পড়েননি। ভারতবর্ষের আমরা বোধহয় রক্তের গুণে এবার ঐ ভয়াবহ আন্তর্জাতিক খ্‌প্‌কা-আক্রমণের হাত থেকে বেঁচে গেলুম।

কিন্তু সময় যে আর কাটে না। স্কুল নেই, কলেজ নেই, আড্ডা নেই। যার বাড়িতেই যেতে চাই আড্ডা মারবার জন্যে সে-ই দরজা বন্ধ করে দেয়। বলে—বাড়িতে খ্‌প্‌কা। ঢুকবেন কি? ছোঁয়াচ লাগবে যে! ভিটামিন সি-য়ের বড়ি খাচ্ছেন?

আমি বলি—ভিটামিন সি আমাদের রক্তে। ও-সব খাবার দরকার হয় না।

লোকে তখন ফ্লু-র প্রতিরোধ বাড়াবার জন্যে মুঠো মুঠো ভিটামিন সি ট্যাবলেট খাচ্ছে, আর বাচ্ছাকাচ্ছাদের খাওয়াচ্ছে। তাতেও খ্‌প্‌কা রোধ হচ্ছে না। এদিকে আমরা কিছু না খেয়েও দিব্যি আছি।

—খুলুন না দরজা। আমাদের কিচ্ছু হবে না। এসেছি, গল্প করে যাই, টেপ রেকর্ড শুনে যাই।

তবু দাঁড়িয়ে থাকে।

—কি হল?

—না না না, খ্‌প্‌কা সেরে গেলে তারপর ঢুকতে দেব। এখন আসুন। বলে, সত্যিই ভিতর থেকে দরজায় কুলুপ মেরে দেয়।

মিতুরও ঐ অবস্থা। বেচারা স্কুলের বন্ধুদের বাড়ি ঘোরাফেরা করে। কিন্তু সব বাড়িতেই ফ্লু। কেউ ঢুকতে দেয় না তাকে। কেউ বেড়াতে আসে না তার সঙ্গে।

এ এক অসহনীয় অবস্থা। শেষে মিতুই এক পরামর্শ দিল। বললে—এক কাজ কর বাবা। যতদিন না ইনফ্লুয়েঞ্জার হিড়িক কাটে, চল ততদিন আমরা পাহাড়ে ঘুরে আসি।

চমৎকার মতলব। পাহাড়ে ফ্লু নেই, ফ্লুর প্রকোপ সমভূমিতে, শহরের ঘিঞ্জিতে। ঘন তুষারপাতে পাহাড় এখন সাদায় সাদা। পাইনের বন বরফের ভারে নুয়ে পড়েছে। কোনোদিকে কোনো মলিনতা নেই। পাহাড়ী কুটিরে, পাহাড়ী হোটেলে এখন শী-চালকদের ভিড়। পায়ে শী পরে ছুটছে সবাই বরফ-ঢাকা নরম ঢালু পাহাড়ের গা দিয়ে দিয়ে।

বললুম—মিতু, তাই চলো। এই ফাঁকে তোমারও খানিকটা শী-ইং শিক্ষা হয়ে যাবে।

পরামর্শ-সভা বসল আমাদের। আলোচনার পর স্থির হল, মিতু আর আমি ক্রকনশে পাহাড়ে যাবো শী-ইং করতে। কন্যা আর গৃহিণী প্রাহাতেই থাকবেন।

সেই দিনই ক্রকনশে পাহাড়ের এক পাহাড়ী কুটিরে টেলিফোন করলুম।

—চের্না বৌডা ?

—হ্যাঁ চের্না বৌডা !

—জায়গা পাওয়া যাবে আপনাদের কুটিরে এক হপ্তার জন্যে ?

—ক-জনের ?

—দু-জন।

—দুটো ঘর দিতে পারব না। এক ঘরে দুজনকে শুতে হবে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাতেই হবে। আমি আর আমার ছেলে যাচ্ছি।

—আপনারা কোন দেশের লোক ?

—ভারতবর্ষের।

—তবে কি আমাদের কুটিরে আপনাদের ভালো লাগবে ? আমাদের কাছেই একটা বেশ আরামের হোটেল আছে।

ফাষ্ট ক্লাস হোটেল। আমার মনে হয়, তাতেই আপনাদের সুবিধে হবে।

—কেন আপনাদের কুটিরের কি দোষ?

—দোষ আর কি? তবে এখানে শুধু চেক্ যাত্রীরাই আসেন। সকলেই কারখানার বা আপিসের কর্মী। তাঁরা বিশেষ কেউ ইংরিজী বা ভারতীয় ভাষায় কথা কইতে পারবেন না। হোটেলে বরং ইংরিজী বলা টুরিষ্ট অনেক পাবেন।

—তা হলে আর বলতে হবে না—আপনার কুটিরেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা করুন। কাল সকালেই টেলিগ্রামে টাকা পাঠিয়ে দেব। কি রেট আপনাদের?

রেট যা বললেন মনে হল ফার্ষ্ট ক্লাস হোটেলের অর্ধেক।

—টাকা পাঠাতে হবে না। এসে দেবেন। কবে আসছেন?

—পরশু। ওখানে শী-ইংএর সুবিধে হবে তো? বরফ কেমন? শী নিয়ে যেতে হবে?

—শী-ইং-এরই তো জায়গা এটা। বরফ এখন চমৎকার—গুঁড়ো চিনির মত পড়ছে অনবরত—শী-ইং-এর পক্ষে আইডিয়াল। পারেন তো শী নিয়ে আসবেন। না হলে এখানেও যোগাড় হয়ে যাবে।

যারা ওস্তাদ শী-চালক, প্রতি বছরই যারা শী-দৌড় দেয় তাদের সকলেরই নিজের নিজের এক জোড়া করে শী-বুট, এক জোড়া করে শী আর এক জোড়া করে শী-লাঠি আছে। যাদের তা নেই, তারা ভাড়া করে। স্পোর্টস-এর নানা রকম জিনিস সাইকেল, রুকস্যাক, তাঁবু, ক্যাম্বু-নৌকো, ছিপ থেকে আরম্ভ করে স্কেটিং জুতো, শী-বুট এবং শী পর্যন্ত ভাড়া দেয়, এমন কয়েকটি দোকান প্রাহায় আছে। সেই রকমই আর একটি জায়গা আছে, শুনলুম সেখানে শী এবং বুট দোকানের অর্ধেক ভাড়ায় পাওয়া যায়। এটি হচ্ছে একটি জাতীয় স্পোর্টস্‌এর সংস্থা, যাদের শী এবং বুটের সংখ্যা

অপরিমিত; যারা সাধারণতঃ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির বড় বড় দলকে ঐ সব জিনিস সরবরাহ করে। মিতু আর আমি সেই সংস্থায় গিয়ে হাজির হলুম। কার কত লম্বা শী লাগবে এটা বার করতে গেলে মাটির উপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাতটাকে লম্বভাবে উঁচিয়ে ধরতে হবে। গোড়ালি থেকে হাতের আঙ্গুলের শেষ পর্যন্ত লম্বা হওয়া চাই শী। আমার মাপের শী প্রচুর ছিল। কিন্তু মিতুর মাপে একটাও পাওয়া গেল না। দু তিনটি স্কুলের ছেলেরা এসে ছোট শী যা ছিল সব নিয়ে গেছে। যাই হোক, মিতুর আর আমার দু-জনের শী-ইং বুট মাপে-মাপে পাওয়া গেল। মোটা চামড়ার দারুণ ভারি বুট—দু-পুরু মোজা দিয়ে পরতে হয়। আমরা জানি শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে জল জমে বরফ হয়; কিন্তু পর্বত পৃষ্ঠে যে-তুষার এসে দিন-রাত জমা হচ্ছে, যার উপর দিয়ে শী-ইং করতে হয় তার শৈত্য শূন্যের নীচে দশ থেকে পনের ডিগ্রি যা হোক হতে পারে। সেই শৈত্য নিবারণের জন্যেই এমন দুর্জয় গুরু বুটের ব্যবস্থা।

মিতুর শী হল না। দোকানে যাবার সময় ছিল না সেদিন আর। তাই ঠিক করলুম চের্না বৌডায় গিয়ে শী-য়ের ব্যবস্থা করব।

ভোর সাড়ে চারটেয় উঠলুম। তৈরী হয়ে নিয়ে পাঁচটার মধ্যে বাড়ি থেকে বেরতে হবে। তৈরী হবার আর আছে কি? লম্বা ষ্ট্র্যাপ্ দেওয়া বুট জোড়া, পরতেই যা খানিকটা সময়; তারপর পিঠে রুকস্যাক ঝুলিয়ে কাঁধে শী ফেলে বেরিয়ে পড়া। গরম কিছু খেয়ে নিয়ে নেমে এলুম আমরা রাস্তায়। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলুম, আমাদের দোতলার ঘরের কাঁচের জানলাটা এক মুহূর্তের জন্যে ফাঁক হল। গৃহিণী এবং কন্যা একবার হাত নেড়েই চট্ করে জানলা বন্ধ করে ফেললেন প্রচণ্ড শীতের ভয়ে।

প্রাহার আকাশ অন্ধকার। রাস্তার বাতিগুলি শুধু জ্বলছে। পাথর বাঁধানো পথের উপর আমাদের লোহা-বাঁধানো বুটের খট্ খট্ শব্দ আশপাশের বাড়ির দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল।

ট্রাম-ষ্টপে এসে পৌঁছলুম। প্রাহার ট্রামে সাধারণত প্রচণ্ড ভিড় হয়। বসে দাঁড়িয়ে মানুষ এমন ঠাসাঠাসি করে যায় যে তিল ধারণের ঠাঁই থাকে না। তবে ভোরের ট্রামের কথা আলাদা। অত ভোরে উঠে লোকে কাজে বেরবেই বা কেন? এই কারণেই বোধহয় এরা বুদ্ধি করে পাহাড়ে যাবার ট্রেনটাকে অত ভোরে ছাড়ায়। শী-চালকেরা অন্ততঃ ষ্টেশনে পৌঁছবার জন্যে ট্রামগুলো খালি পাক।

ট্রাম আসতে দেখলুম ভিতরের সীটগুলো মোটামুটি যাত্রীশূন্য, কিন্তু যেখানে কণ্ডাক্টার দাঁড়ান, সেখানে প্রচুর শী-চালকের ভিড়। ট্রেন ধরবার জন্যে ভোর ভোর সব বেরিয়ে পড়েছে শী-রুকস্যাক নিয়ে। আমরাও তাদের দলে গিয়ে ভিড়লুম।

ট্রামে যদি-বা জন-দশেক শী-চালক ছিল, ট্রেনে দেখলুম শত শত। অতগুলি সুস্থ সবল ছেলেমেয়ে দেখলে মনেই হয় না শহরে ইনফ্লুয়েঞ্জার হিড়িক লেগেছে। আসলে পাহাড় থেকে খবর আসতে শুরু করেছে যে সেখানে খুব 'প্রাখোভি' তুষার পড়ছে। গ্রামে শহরে তুষার তুষারই, কিন্তু পাহাড়ে শী-চালকদের কাছে অনেক রকম তুষার আছে। ভিজে তুষার তারা দু-চক্ষে দেখতে পারে না। সব রকম তুষারের সেরা তুষার হচ্ছে বালির মত একরকম শুকনো বরফ, তারই নাম প্রাখোভি তুষার। এই খবর পেয়েই যাদের যাদের ফ্লু হয়নি, তারা সবাই বেরিয়ে পড়েছে শী ঘাড়ে পাহাড়ের উদ্দেশে।

টেকনিক্যাল কলেজের ছাত্র একদল উঠেছে আমাদের কামরায়। শী-গুলো সব গাদা করা লাগেজের তাকে। সুটকেস নেই কারো—শুধু রুকস্যাক। রুকস্যাকের দড়ি খুলে তার মধ্যে থেকে পাঁউরুটি, পনির আর সসেজ বার করে খেতে শুরু করল।

আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—নিন।

—আমরা খেয়ে বেরিয়েছি এক পেট।

—সে কি ? এত সকালে ? এই তো সবে ভোর হচ্ছে।

—সাড়ে চারটেয় উঠেছি যে।

—তাই বলুন। আমরা সবাই আজ এত দেরী করে উঠেছি যে ট্রেনই মিস্ করে ফেলেছিলুম প্রায়। কোনো রকমে ছুটতে ছুটতে এসে ধরেছি।

ছেলেরা সব কাল রাত্রে দুটো অবধি নাচনা-গাওনা করেছে। তাইতেই এই বিপত্তি।

মহা ফুর্তিবাজ সব। একটা ষ্টেশান আসতেই আমার হাত ধরে টানাটানি করে।—চলুন ষ্টলে গিয়ে কফি খেয়ে আসা যাক।

আমি আপত্তি করি। চেক্ ট্রেনগুলো হুইসিল না দিয়েই হঠাৎ ছেড়ে দেয়। বলি—ট্রেন ছেড়ে দেবে যে!

—আমরা এতগুলো জোয়ান থাকতে ছেড়ে দিলেই হল ? ঠেলে তুলে দেব আপনাকে।

কফি খাওয়ালো আমাকে। মিতুর জন্যে নিয়ে এল কাগজের গেলাসে করে লেমনেড। ঐ শীতে দেখলুম ঠাণ্ডা লেমনেড অনেকেই ঢক্ ঢক্ করে খাচ্ছে। মিতুও খেল।

স্ভোবোডা ষ্টেশানে এসে আমাদের ট্রেনযাত্রা শেষ হল। এ ষ্টেশানে পৌছবার আগে থেকেই দেখছিলুম রেলের লাইন থেকে বরফ সরাচ্ছে। শুনলুম ঘন তুষারপাতের ফলে কিছুক্ষণ আগে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই সবে চলতে আরম্ভ করেছে। ট্রেন থেকে নেমে দেখলুম বরফে চারিদিক সাদা। ফুটপাথ আর রাস্তা বরফে চাপা পড়ে এক হয়ে গিয়েছে। হিম বাতাস। আর সেই বাতাসে ভেসে আসছে গুঁড়ো গুঁড়ো প্রাখোভি তুষার—শী-চালকের প্রাণের আনন্দ।

এইখান থেকেই শী-চালনার ভূমি শুরু। ট্রেন খালি করে শী-চালকেরা নেমে এলেন। এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়লেন সকলে। এখান থেকে বাসে করে যেতে হবে আমাদের পাহাড়ি রাস্তায় য়ান্স্কে

লাজ্‌নে পর্যন্ত। সেটি একটি স্বাস্থ্যনিবাস। উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, যার জলে নানারকম রোগের চিকিৎসা হয়। সেইখান থেকেই খাড়া পাহাড়। বাস আর যায় না। বরফ যখন থাকে না তখন নিশ্চয়ই পায়ে চলা সুঁড়ি পথ অথবা ঘোড়ায় চলা রাস্তা বেয়ে পাহাড়ের চূড়োয় ওঠা যায়। এখন কিন্তু সে-সব রাস্তা বরফের নীচে। পাহাড়ের চূড়োয় ওঠবার একমাত্র পন্থা একটি ঝুলন্ত লিফ্‌ট্। সারাদিন সেটি দলে দলে যাত্রী নিয়ে চূড়োয় উঠছে আর নামছে। আমাদের পৌঁছতে হবে এই চূড়োয়। ঐখানেই চের্না বৌডা।

লিফ্‌টের স্টেশানে সে কী ভিড়! প্রকাণ্ড লম্বা কিউ লিফ্‌টে ওঠবার জন্যে। উপরে দুটি যাত্রী-কুটির আর একটি হোটেল। তাতে যা স্থানসঙ্কুলান হবে তার পাঁচ গুণ লোক জমায়েত হয়েছে লিফ্‌টের নীচে। শুনলুম এরা বেশীর ভাগই লিফ্‌টে করে চূড়োয় উঠে তারপর এই লিফ্‌টেরই নীচে দিয়ে বরফ ঢাকা ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে প্রচণ্ড বেগে শী-পায়ে নেমে আসবে। ঐতেই মজা।

অনেকক্ষণ কিউতে দাঁড়িয়ে থাকবার পর আমাদের পালা এল। টিকিট কিনে আমরা লিফ্‌টে গিয়ে ঢুকলুম। শী-গুলো আমাদের সবার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে লিফ্‌টের তলায় একটা সরু খোপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। বরফের রাজ্য দিয়ে শূন্যে উড়ে চললুম আমরা। যতদূর দেখা যায়, সাদা ছাড়া আর কিছু নেই। তারই মধ্যে দীর্ঘকায় পাইনের গুঁড়িগুলি কালো কালো থামের মত। পাইনের পাতা দেখা যায় না—সাদা টুপি পরে বসে আছে সব স্থির হয়ে। লিফ্‌ট্ উঠছে তো উঠছেই—যেন স্বর্গরাজ্যে চলেছি। পায়ের তলায় হঠাৎ মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে সাপের মতো এঁকেবেঁকে কোনো ওস্তাদ শী-চালক তীব্র বেগে বরফ কেটে ছুটে চলেছেন উপর থেকে নীচে। কতরকম ভঙ্গি তাদের! কেউ বা কোন অপূর্ব প্রথায় তার দুর্দম পতনগতি চকিতে থামিয়ে বরফের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের লিফটের

দিকে ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে হাত নেড়ে অভিবাদন জানাচ্ছেন। কেউ তা করতে গিয়ে ডিগবাজী খাচ্ছেন বরফের গুঁড়োর মধ্যে।

আমরা চূড়োয় এসে পৌঁছলুম। বহু নীচে পড়ে রইল শহর বাড়ি ঘর জন-কোলাহল।

লিফ্‌ট-স্টেশান থেকে বেরোতেই চোখে পড়ল তীরাঙ্কিত নির্দেশ। বাঁ দিকে সেই ফার্স্ট ক্লাস হোটেলটি এবং অন্য একটি শী-চালকদের কুটির, আর ডান দিকে চের্না বৌডা।

চের্না মানে কালো, বৌডা মানে কুটির। গ্রীষ্মকালে এলে হয়তো একটি কালো রং-এরই কুটির দেখতে পেতুম। এখন একেবারে সাদা। সমস্ত বাড়িটি যেন বরফের মধ্যে ডুবে রয়েছে। ঢালু ছাদ থেকে ঝুলছে লম্বা লম্বা বরফের স্বচ্ছ লাঠির মতো 'আইসিক্‌ল্‌'। তারই পিছনে চক্‌চক করছে কাঁচের জানলাগুলি। বাইরে যতই ঠাণ্ডা হোক, কুটিরের ভিতরে কিন্তু ভারি আরাম। নলের মধ্যে দিয়ে গরম জল বইয়ে বাড়িটাকে গরম করে রেখেছে সর্বক্ষণ।

কুটির-কর্তা আমাদের ঘর দেখিয়ে দিলেন, মিতুকে এক জোড়া শী দিলেন, তারপর খেতে ডাকলেন।

—কুটিরের আর সব যাত্রীরা কই?

—একটু আগে খেয়ে নিয়ে সবাই বেরিয়ে পড়েছেন মাঠে।

—মাঠে? মানে শী-ইং করতে? কোন দিকে মাঠ?

—অনেক দিকেই আছে। তবে কুটির থেকে নীচে নেমে যদি একটু বাঁ দিকে যান, ঐখানে মস্ত খোলা মাঠ পাবেন, সেখানেই বেশীর ভাগ লোক গিয়েছেন। অন্য মাঠগুলোয় শী-চালানো একটু কঠিন। প্রথম দিন আপনারা নীচের মাঠেই যান—ওখানে কোন বিপদ হবে না।

হাওয়ার এমনই গুণ যে আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় যাত্রা শুরু করে রাস্তার ধকল সয়ে এত দূর এসেও ক্লান্তি বোধ করছিলুম না। মিতুর তো একটুও করছিল না। নতুন শী পায়ে বাইরে বেরিয়ে পড়তে পারলে যেন বাঁচে।

বহুদিন শী পায়ে বাঁধিনি, চলতে অসুবিধে হচ্ছিল। মিতু তো একেবারে নতুন। অস্ট্রিয়ায় আল্‌প্‌স পর্বতে প্রথম যখন শী করতে শিখেছিলুম, আমার শিক্ষক মহাশয় আমায় প্রথম যে শিক্ষাটি দিয়েছিলেন, সেটি হচ্ছে, পড়ে গেলে কেমন করে উঠে দাঁড়াতে হয়। মাটিতে পড়ে গেলে যেমন করে মানুষ উঠে দাঁড়ায়, শী-পায়ে তুষারের উপর পড়ে গেলে তেমনি করে উঠতে গেলে কোনোদিনই মানুষ উঠতে পারবে না। লম্বা লম্বা শী দুটো ঠ্যাং দুটোর সঙ্গে এমন জড়িয়ে যাবে যে ওঠবার চেষ্টা করলেই আবার টেনে ফেলবে বরফে। শী দুটো সমান্তরাল করে এক পাশে সোজা শুয়ে পড়তে হয়। তারপর এক হাতে ভর দিয়ে অনায়াসে উঠে দাঁড়ানো যায়। মিতুকে শিখিয়ে দিলুম বিদ্যেটা। আর সব ভুলে গিয়েছিলুম—প্রথম বিদ্যেটাই শুধু মনে ছিল। কুটির থেকে মাঠে যেতে গেলে বেশ খানিকটা নাবাল জমি পড়ে। আর নাবাল জমি দিয়ে শী পায়ে যাওয়া মানেই আছাড় খাওয়া। বারবার আছাড় খেতে খেতে আর নতুন বিদ্যেয় উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে মিতু আমার সঙ্গে এগিয়ে চলল। আমিও কয়েকবার আছাড় খেলুম। শেষে যেখানে অনেক যাত্রী শী-চালনা অভ্যাস করছিলেন সেই মাঠে এসে হাজির হলুম আমরা।

কথায় বলে শী-ইং-এর মতো স্পোর্ট হয় না। নির্মল স্পোর্ট। ধুলো নেই, কাদা নেই, জল নেই, ময়লা নেই, আছাড় খেলে গায়ে লাগে না, দৌড় দিলে ক্লান্তি লাগে না, প্রাণ ভরে নিশ্বাস নাও, আর মনে হবে সমস্ত রক্ত তাজা হয়ে গেল।

আমাদের আনাড়ি ভঙ্গী দেখে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। বললেন—আসুন, আপনাদের কয়েকটা প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে দিই।

আলাপ হল। শ্রী চেরমাক নাম। ইঞ্জিনীয়ার। গট্‌ভাল্‌ডভ্‌ শহরে জুতোর কারখানায় কাজ করেন। ওস্তাদ শী-চালক। শিক্ষক হিসেবেও খুব ভালো। বোধহয় ছাত্রের অভাব বোধ করছিলেন। মিতুকে পেয়ে বর্তে গেলেন।

—আমাদের দেশের ছেলেরা বুঝলেন, বলতে গেলে একরকম শী পায়ে দিয়েই জন্মায়।

—তা তো বটেই। হাঁটার মতো বোধহয় ওরা আপনিই শিখে যায় শী চালানো?

—বেশীর ভাগ। তবে এলো-পাতাড়ি শী চালানো আর ওস্তাদি কায়দায় চালানো এ দু-য়ে অনেক তফাৎ। সেই জন্যেই শিক্ষারও দরকার।

—আপনাদের দেশে যেমন বরফ, আমাদের দেশে তেমনি আবার জল। এত নদী নালা যে গ্রামের ছেলেরা কতটুকু বয়সে যে সাঁতার শিখে নেয় আমরা লক্ষ্যই করি না। তবুও ভালো সাঁতারু হতে গেলে শিক্ষার দরকার।

—ক-দিন থাকবেন আপনারা? এ হপ্তাটা আছেন তো?

—নিশ্চয়ই। সারা হপ্তার জন্যেই তো এসেছি।

—তা হলে এই সাত দিনে আপনার ছেলেকে আমি তৈরী করে দেব। যথেষ্ট ভালো শী-ইং করতে পারবে এর মধ্যে। নিজের উপর বিশ্বাসও জন্মাবে।

—ধন্যবাদ।

মিতুর কপালে ভালো। পাহাড়ে এসেই শী-লাভ। মাঠে নামতে না নামতেই মাষ্টারও জুটে গেল। আমিও শিখতে লাগলুম ঐ সঙ্গে।

সারাদিন বরফের মধ্যে ছুটোপাটি করে যখন বাড়ি ফিরলুম তখন সান্ধ্য-ভোজনের আয়োজন হচ্ছে।

উজ্জ্বল আলোকিত সুদৃশ্য ঘর। ঘরের মধ্যে ছোট ছোট টেবিল সাজানো। প্রত্যেকটি টেবিলে চারটি করে চেয়ার। আমাদের টেবিলে চেরমাক আর তাঁর স্ত্রী চেরমাকোভা এসে বসলেন।

গরম স্যুপ দিয়ে গেল। কুটির-কর্তা ঘরের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে নবাগতদের অভিবাদন জানিয়ে ছোট একটি বক্তৃতা দিলেন। খেলার মাঠ কোথায় কোথায় আছে বললেন। দূরের পাল্লায় যাঁরা যেতে

চান তাঁরা কোথায় কোথায় যেতে পারেন এবং কে গাইড হয়ে নিয়ে যেতে পারেন তার কথা বললেন। সারাদিনের জন্যে যারা বরফের পথ ধরে বেড়াতে যাবেন তাঁদের সঙ্গে খাবার দিয়ে দেওয়া হবে। সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরে এলে কি ভাবে গান, বাজনা, সিনেমা, নাচ, টেলিভিশান, খেলাধূলা দিয়ে সকলের মনোরঞ্জন করা হবে তা বললেন। আরো নানান খুঁটি-নাটি।

এই আবাসটি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ানের। সারা দেশের নানান কারখানার ও অপিসের কর্মীরা এখানে ছুটি কাটাতে আসেন। সাধারণত আসেন তাঁরা এক সপ্তাহের জন্যে—শুক্রবারে এসে বৃহস্পতিবারে ফিরে যান। এর চেয়ে লম্বা ছুটি কাটাবার অন্যান্য আবাস আছে দেশে। সুপরিচ্ছন্ন ঘর—চমৎকার আয়োজন। শীতের সময় এলে শী-ইং করবার সমস্ত সুযোগ, গরমের সময় এলে পাহাড়-বনে হাঁটার সুযোগ। যে কদিন অতিথিরা আবাসে থাকেন, সকলে মিলে-মিশে এক পরিবারের মতই থাকেন। এক হপ্তার মধ্যেই দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে কর্মীরা কর্মস্থলে ফিরে যান।

সূপের প্লেট তুলে নিয়ে মাংস দিয়ে গেল। চেরমাকদের সঙ্গে আমি আলাপ শুরু করলুম।

গট্‌ভাল্‌ডভের আগেকার নাম ছিল জ্‌লিন। এই জ্‌লিনই হচ্ছে বিশ্ব-বিখ্যাত জুতা-ব্যবসায়ী টমাস বাটা-র জন্মস্থান। ছোট গ্রাম জ্‌লিন টমাস বাটার উদ্যমে শেষে বিরাট শিল্প নগরে পরিবর্তিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে চেকোস্লোভেকিয়ার সবচেয়ে বৃহৎ জুতা উৎপাদক ছিলেন বাটা। এই গট্‌ভাল্‌ডভের জুতোর কারখানায় জুতো তৈরীর যে যন্ত্রপাতি তৈরী হয় তারই এক অংশের খবরদারি করেন চেরমাক। আজকের দিনে জ্‌লিনের নাম বদলে যেমন হয়েছে গট্‌ভাল্‌ডভ্‌, তেমনি বাটা কারখানার নাম দেওয়া হয়েছে স্বিট কারখানা। বাটার নাম লোকের মুখে-মুখে আছে বটে কিন্তু

লেখা কোথাও নেই। দেশের যেমন সব বড় বড় কারখানাই জাতীয়করণ করা হয়েছে তেমনি বাটারও কারখানা। আগে বিরাট কারখানার প্রচুর লাভ আসতো শুধু একটি পরিবারে। এখন তার এক অংশ কর-রূপে জাতীয় তহবিলে যায়, বাকিটা কর্মীদের মধ্যে বেটে দেওয়া হয়।

চেরমাক বললেন—আমাদের স্বিট কারখানার নাম ছিল আগে বাটা কারখানা। বাটার নাম শুনেছেন আপনারা ?

—তা আর শুনবো না ? আমাদের কলকাতার বাজারে কত চলছে বাটার জুতো। এখনও লোকে ছড়া কাটে—'বাটা বাঁচিয়ে দিল পা-টা !' ওদের কারখানা যে গ্রামে তার নাম ছিল ন্নুঙ্গি। এখন লোকে বলে বাটানগর।

—বলেন কি ? তাহলে তো আমাদের এখানকার ঠিক উল্টো ? আচ্ছা, আপনাদের ওখানকার জুতোর কারখানা সবই নিশ্চয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি ? জাতীয় কিছু নেই ?

—না, জুতোর কোনো জাতীয় কারখানা আমাদের নেই।

—করুন না একটা। দেখবেন চেক সরকার নিশ্চয় আপনাদের সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে আসবেন।

—কি ভাবে সাহায্য করবেন ?

—কেন যন্ত্র দিয়ে ? ইঞ্জিনীয়ার দিয়ে ? আমাদের ইঞ্জিনীয়াররা গিয়ে আপনাদের ইঞ্জিনীয়ারদের শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়ে আসবে। জানেন, জুতো গড়ার কলের কত উন্নতি করে ফেলেছি আমরা ? কত নতুন কল করেছি ? বাটার আমলে যা উৎপাদন ছিল তার তিন গুণ উৎপাদন বাড়িয়েছি, জন-পিছু উৎপাদনের হার বাড়িয়েছি, এদিকে উৎপাদনের খরচও কমিয়েছি। আপনারা জাতীয় জুতোর কারখানা গড়ুন একটা। একেবারে আধুনিকতম যন্ত্র এবং বিদ্যা পেয়ে যাবেন আমাদের কাছ থেকে।

—হলে তো বেশ ভালই হয়। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে

সব ছেড়ে-ছুড়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-বিদ্যায় নেমে পড়ি।

—আমার নিজের স্বার্থ আছে, তাই বলছিলুম। ইজিপ্টে গিয়েছিলুম ওদের একটা জুতোর ফ্যাকটারি চালু করতে। জাতীয় কারখানা। আমরা যন্ত্র দিয়েছি একেবারে আনকোরা নতুন। ন-মাস ছিলুম—ওখানেই ইংরিজীটা শিখেছি। ইণ্ডিয়ায় যদি যাবার সুযোগ পাই, ধন্য হয়ে যাবো। ইণ্ডিয়া আমার স্বপ্নের দেশ। ইণ্ডিয়া যদি চেক-যন্ত্র দিয়ে জুতোর কারখানা খোলে, তাহলে স্বভাবত এখান থেকে ইংরিজী-জানা ইঞ্জিনীয়ার পাঠাবে। আমাদের বিভাগে ইংরিজী জানে খুব কম লোক। কাজেই আমার নাম মনোনীত হওয়ার সম্ভাবনা।

—বাস্ তাহলে তো হয়েই গেল। দেশে ফিরেই আমি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নামব, আর চেষ্টা করব যাতে আমাদের সরকার আপনাদের সরকারের কাছ থেকে জুতোর যন্ত্র আমদানি করতে শুরু করে দেন। তাহলেই আপনার সঙ্গে আবার আমাদের দেখা হবে।

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন চেরমাক ও চেরমাকোভা।

চেরমাকদের সঙ্গে আমাদের বেশ ভাব হয়ে গেল। দুজনেই খুব ভালো শী-চালক। বরফ-ঢাকা বনের অপূর্ব রাস্তা দিয়ে দূর-দূরান্তের পথে অনায়াসে ঘুরে আসতে পারতেন, কিন্তু সে সব না করে আমাদের নিয়ে পড়লেন। কদিনের মধ্যে মিতুকে ওস্তাদ না-করে আর ছাড়বেন না। ঐ মাঠের মধ্যে আর মাঠের চারি পাশের বনের গায়ে উঁচু-নীচু জমিতে মিতুকে শেখাতে লাগলেন কসরৎ। তিন দিনের দিন দেখা গেল মিতু গড়ানে জমিতে দিব্যি ব্যালেন্স করে নামছে, একটুও পড়ছে না। খাড়াই জমিতে কেমন করে মাছের কাঁটার মতো দাগ ফেলে ফেলে উপরে উঠতে হয় তাও শিখে নিয়েছে। এইবার দরকার আরও কিছু অভ্যাস। তারপরই মিতুকে আর আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারবেন বনের পথে দূরের পাল্লায়!

সেইদিন দুপুরে মাঠে সবাই প্র্যাকটিস করছি, হঠাৎ উঠল ঝড়। পাহাড়ের পিছনের আকাশটা কালো হয়ে এল। তুষার-কণা মাটি থেকে উড়ে পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরতে লাগল। মুখে এসে ফুঁটতে লাগল। ঝড় উঠতেই আমরা সবাই ঘরমুখো, ফিরেছি। হাত বাড়ালেই তো বাড়ি, কিন্তু ঐটুকুই কি পৌঁছন যায়? দারুণ হাওয়ার দাপট। ঠিক আমাদের উল্টোমুখে বইছে। টলতে টলতে এগিয়ে চলেছি সবাই ছত্রভঙ্গ সৈনিকদের মত। উঠছি উপর দিকে খানিকটা, আবার পিছলে পড়ে যাচ্ছি। এইভাবে ক্রমে বাড়ির মধ্যে এসে পৌঁছলুম সকলে। কুটির-কর্তা দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাড়ির মধ্যে হু-হু করে ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়া ঢুকছিল। তৎসত্ত্বেও যতক্ষণ না শেষ মানুষটি ঘরে ঢোকে, ম্যানেজারমশায় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। খাবার ঘরের জানলার ধারে বসে আমরা বাইরে ঝড়ের তাণ্ডব দেখতে লাগলুম।

ঘণ্টাখানেক পরে ঝড়ের বেগ একটু কমল। সেই সময় হঠাৎ দু-তিনজন এসে ঢুকলেন কুটিরে। তাঁরা কয়েকজন নাকি একটু দূরে বনের ভিতরে ঝড়ের মধ্যে পড়েছিলেন। ফিরছিলেন, বাড়ির কাছে এসে এক কাণ্ড। লিফ্‌ট্ স্টেশানের পাশে জায়গাটা বেশ ঢালু। সেখানে নামতে গিয়ে পা পিছলে, তাঁদের সঙ্গে আসছিল একটা বারো-বছরের মেয়ে, সে পড়ে যায়। কেমন করে যে কি হয়ে গেল—মটাস্ করে এক আওয়াজ!' সবাই ভেবেছিল মেয়েটির স্কী ভেঙে গেছে, কিন্তু গোঙানি শুনে কাছে গিয়ে দেখে পা ভাঙা। দুজনে কাঁধে করে তাকে তুলে আনতে চেয়েছিল কিন্তু দেখতে দেখতে পা ধনুকের মতো বেঁকে উঠেছে আর মেয়েটি দারুণ যন্ত্রণায় কাঁদছে। তুলতে দিচ্ছে না কাউকে। ছুঁতেই দিচ্ছে না। তার বাপ-মা দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে। এখনই কিছু করা দরকার।

স্লেজ্ নিয়ে দৌড়ল কয়েকজন। ম্যানেজার টেলিফোন করলেন পাহাড়ী রেডক্রসের আপিসে। অন্য কুটিরটিতে ছিল তাদের

আপিস। এদের কাজই হচ্ছে পাহাড়ে কারো বিপদ হলে, পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙলে তাদের চিকিৎসা করা, সাহায্য করা। এই কাজেই ওস্তাদ এরা। পাহাড়ী রেডক্রসের লোকেরা ব্যাণ্ডেজ নিয়ে স্কী-পায়ে ছুটে গেল সেই জায়গায়। তারা ঠিক করল, মেয়েটিকে আবাসে ফিরিয়ে না নিয়ে গিয়ে তখনই লিফ্‌টে করে নীচে নিয়ে যেতে হবে। মেয়েটির পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে তারা তার বাপ-মাকে সঙ্গে নিয়ে নেমে গেল য়ান্‌স্কে লাজ্‌নেতে।

খবরটা শুনে আমাদের সবারই মন খারাপ হয়ে গেল। ম্যানেজারমশায় বললেন—আজকের সন্ধ্যের প্রোগ্রামে গান-বাজনার কথা ছিল—বন্ধ থাক।

সেদিন রাত্রে ঘুমের মধ্যে টের পেলুম আবার ঝড় উঠেছে। শোঁ-শোঁ ঝড়ের শব্দ ভোর অবধি চলল। সকালে উঠে দেখলুম আমাদের বেরবার দরজা বরফে ঢাকা পড়েছে। ম্যানেজার কয়েকজন অতিথির সাহায্যে বেলচা দিয়ে বরফ তুলে তুলে অনেক কষ্টে দরজা খুললেন। রেডিওতে খবর দিল, পাহাড়ে আবহাওয়ার গতিক ক্রমেই আরও খারাপ হবে।

চেরমাক এসে বললেন—মিস্টার গাঙ্গুলি, আপনাদের কপালই মন্দ।

আমি বললুম—ভেবেছিলুম চ্যাম্পিয়ান হয়ে বাড়ি ফিরব।

মিতু অস্থির হয়ে উঠেছিল। বললে—মাঠে না-হয় না-ই গেলুম। কুটিরের সামনে রাস্তার উপর একটু প্র্যাকটিস করতে পারব না?

দুজনে ওঁরা বেরলেন। কিন্তু একটু পরেই নীল য়ুনিফর্ম-পরা দুই পার্বত্য রেডক্রসের লোক তাঁদের ফিরিয়ে নিয়ে এসে আমাদের কুটিরে ঢুকলেন। ম্যানেজারকে বললেন—বাইরে বেরোনো বিলকুল বারণ। যে বেরবে, তার জরিমানা।

এই বলে আমাদের দরজায় প্রকাণ্ড একটা নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। তাতে লেখা—

—বহিরাগমন সম্পূর্ণ বন্ধ। অন্যথায় জরিমানা পঞ্চাশ ক্রাউন। পার্বত্য রেডক্রস।

বাস্, ঘরের মধ্যে বসে দাবা, তাস, স্প্রীংয়ের ফুটবল আর ব্যাগাটেল খেলা ছাড়া আর কিছুই করবার রইল না'।

এমনি করে দু-দিন কাটল। ঝড়ের কমতি নেই। বাইরে বেরবার দরজা বন্ধ, কে আর বেরবে? বরফ জমা হয়ে দরজার মাথা পর্যন্ত ঢেকে গেল। মনে হতে থাকল, বরফের নীচে আমাদের কবর হয়ে গেছে। টেলিফোনে খবর নিয়ে জানলুম, হাওয়ার দুলুনিতে লিফ্‌টের চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। লিফ্‌টে করেই এখানকার আবাসগুলির খাদ্য-রসদ আসে। তা আজ দুদিন আসেনি। ম্যানেজার হাসিমুখে বলে গেলেন—খাবার আমাদের স্টকে যথেষ্ট আছে, শুধু জলেরই একটু অভাব। জল সবাই একটু কম করে খাবেন।

জল মানে বোতলে ভরা 'মিনেরাল ওয়াটার'।

চেরমাক এসে রহস্যজনকভাবে বললেন—এইমাত্র দেখলুম রেডক্রসের লোকেরা ঐ মাঠের দিকে গেছে। এই সুযোগ। চট্‌ করে একটু বেড়িয়ে আসবেন নাকি? আমরা যাচ্ছি। আসবেন তো আসুন।

—কোথায়?

—হোটেলটায়। কাফি খেয়ে আসব।

—বেরব কোথা দিয়ে? গমন-পথ তো বন্ধ?

—খিড়কির একটা পথ আছে নীচের তলা দিয়ে। সেদিকে হাওয়া বয়নি বলে বরফ জমেনি। সেইখান দিয়ে বেরব।

বসে বসে পা ধরে গিয়েছিল। মিতু আর আমি চট্‌ করে বুট পরে শী পায়ে বেঁধে বেরিয়ে পড়লুম চেরমাকদের সঙ্গে।

ঝড়ের তেজ আগের চেয়ে কম বটে, কিন্তু এখনও যা, উল্টে প্রায় ফেলে দেয়। আর বরফের বালি মুখে ফোটে একেবারে ছুঁচের মতো।

কোনোরকমে লড়াই করতে করতে পৌঁছলুম গিয়ে হোটেলে : খাবার ঘর খালি। আমরাই ক-জন সেখানে গিয়ে বসলুম। ক্রমে আমাদের আবাস থেকে আরো কয়েকটি দল এসে যোগ দিল। হোটেলের বাসিন্দারা সব যে-যার ঘরে ঘুমচ্ছেন। দেখলুম—নাঃ, আমাদের আবাসের বাসিন্দারা অনেক বেশী জীবন্ত। ভাগ্যিস্ এই ফার্স্ট ক্লাস হোটেলে এসে থাকিনি। থাকলে হয়তো এদেরই মতো সারাদিন ঘুমোতে হত।

রেডক্রসের হাতে ধরা না পড়ে, জরিমানা না দিয়ে বাড়ি ফিরে এলুম। একটু পরেই রেডক্রসের সেবকরা এসে তাঁদের নোটিস খুলে নিয়ে গেলেন। বললেন—চারিদিক ঘুরে দেখে এলুম, এখন আর অত বিপদ-জনক কিছু নেই। লিফ্ট বোধহয় চলবে কাল সকালে।

লিফ্ট চলবে শুনে অতিথির দল সব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বাড়ি ফেরার জন্যে। পাঁচ-সাত জনে মিলে বেলচা হাতে বরফ সরাতে লেগে গেলেন সামনের দরজা থেকে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দরজার সম্মুখভাগ পরিস্কার হয়ে গেল।

পরদিন ভোর থেকে আবার ঝড় আরম্ভ হল। কিন্তু নীচের ঘরে নেমে এসে দেখি ঝড় সত্বেও যাত্রীরা সব যাবার জন্যে তৈরী। চেরমাক চেরমাকোভাও ঐ সঙ্গে।

তাঁরা আমাদের জিজ্ঞেস করলেন—আপনারা থেকে যাচ্ছেন না কি ?

—নিশ্চয়ই। স্কী-ইং শেখা হল কই ? আরেকটু দেখি।

টেলিফোনে খবর এল, আধঘণ্টার মধ্যে লিফ্ট ছাড়বে।

দক্ষিণ মেরুর অভিযাত্রী দলের মতো আমাদের বন্ধুরা সারি বেঁধে বরফ-ধূলি আর কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। দেখতে দেখতে ঝড় আরও বেড়ে উঠল। ম্যানেজার বললেন—লিফ্ট ছাড়ে কি না বলা যায় না। হয়তো সবাই ফিরে আসবেন।

আধঘণ্টা পরে টেলিফোনে খবর নিয়ে জানা গেল লিফ্‌ট্‌ নীচে নেমে গেছে। রেডিওতে খবর দিল—আবহাওয়া আজকে আরও খারাপ হবে।

ম্যানেজার দরজায় কুলুপ এঁটে দিলেন। অত বড় বাড়ি খাঁ খাঁ করতে লাগল। কুটিরের মধ্যে রইলুম খালি ম্যানেজার, তাঁর স্ত্রী-পুত্র, আমরা দুজন আর রান্নাঘরের ঝি-চাকর। কুটিরের বাইরে তুষারঝটিকা গর্জন করতে লাগল।

সেদিন বিকেল থেকে নতুন অতিথিদের আসবার কথা, কিন্তু লিফ্‌ট্‌ আবার অচল। কেউ এসে পৌঁছতে পারলেন না। অত বড় খাবার ঘরের এক কোণে বসে মিতু আর আমি ম্যানেজারের সঙ্গে ডিনার খেতে খেতে কুটিরের বাইরে যে বিজলী-আলো জ্বলছিল তাইতে দেখতে লাগলুম ঘুরপাক খেতে খেতে কেমন করে বরফের কুঁচি আমাদের কাঁচের জানলায় জমা হয়ে আস্তে আস্তে জানলা ঢেকে ফেলছে।

রাত্রে প্রাহায় টেলিফোন করলুম। কি ভাগ্যিস্‌ টেলিফোনের লাইনটা সচল ছিল। গৃহিণীকে বললুম—ফিরতে পারছি না। ঝড়ে আটকা পড়েছি। বাড়ি থেকে বেরবার উপায় নেই। রেডক্রসের পাহারাদার ঘুরছে। বেরলেই ধরবে। তা ছাড়া লিফ্‌ট্‌ বন্ধ। কে জানে, পাহাড়তলীতে বাস ট্রেন এসে পৌঁচচ্ছে কিনা। ঝড় কবে থামবে জানি না। ঝড় কমলে ফিরব।

বন্দী দশায় কাটতে লাগল জীবন। ম্যানেজারের ভাঁড়ারে খাদ্যদ্রব্য ছিল যথেষ্ট। জলেরই যা একটু অভাব। তা হলেও অতিথির দল চলে যাওয়ার ফলে হয়তো জলে টান পড়বে না। অত লোক ছিল, নানাজনের সঙ্গে গল্পে গুজবে কেটে যেত সময়, এখন এই শূন্যপুরীতে সময় কাটানোই সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। ম্যানেজারের চার বছরের ছেলে য়িরকা এসে ডেকে নিয়ে যেত আমাদের তাদের ঘরে টেলিভিশান দেখবার জন্যে। গল্প করত

প্রায়ই য়িরকা আমাদের সঙ্গে। কবার সে পাহাড়ের নীচে নেমেছে তার কথা বলত—মাত্র দুবার। দুবারই য়ান্স্কে লাজ্নেতে। য়ান্স্কে লাজ্নে তার কাছে পরীর দেশ।

—আঃ, য়্যান্স্কে লাজ্নের আইস্ক্রীম কী মিষ্টি, জানেন? অমন আর হয় না।

—কেন, তোমাদের এখানকার আইস্ক্রীম তো অতি চমৎকার আমরা প্রাহায় অমন আইস্ক্রীম পাই না।

—প্রাহা আবার কোথায়?

বেচারির পৃথিবীর বিস্তৃতি সম্বন্ধে ধারণা একেবারে নিজস্ব। ছ-মাস বরফের মধ্যে থাকে, আর ছ-মাস পাহাড়ের চূড়ো থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখে। জগত মানে পাহাড়ের উপরের তিনটি আবাস আর পাহাড়ের নীচে বিরাট কোলাহলময় লোকবহুল একটি জনপদ তার ওপারে আর কিচ্ছু নেই।

ম্যানেজার তাঁর সংসারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বললেন সামনের বছর য়িরকা পাঁচে পড়বে। বাস্, তখনই তাঁর এখানকার চাকরি শেষ। ছেলেকে স্কুলে দেওয়া দরকার; তাই এখানকার পাঠ শেষ করতে হবে। অনেকদিন এখানে আছেন। জায়গাটি স্বাস্থ্যকর, সুদৃশ্য। নির্জন হলেও অতিথি-সমাগমের বিরাম নেই কিন্তু স্কুলের খাতিরে যেতেই হবে তাঁদের এ জায়গা ছেড়ে নীচে নেমে অন্য চাকরিতে।

আরো তিন দিন পরে কত রাত জানি না হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। এ কি? ঝড়ের শব্দ থেমে গেছে না? কাঁচের জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ফ্রেমে। উঁকি মেরে দেখলুম স্তব্ধ বাতাস, বরফের অচঞ্চল ঢেউয়ের উপর জ্যোৎস্না ঠিকরে পড়ছে।

ভোরে উঠে সেদিন ব্রেকফাস্ট খাবার আগেই মিতু আর আমি স্কী পরে বেরিয়ে পড়লুম। অদ্ভুত দৃশ্য। বন, মাঠ, পাহাড় সব বদলে গেছে। যেখানে নীচু ছিল সেখানে উঠেছে বিরাট বরফের

পাহাড়। যেখানে পাহাড়প্রমাণ বরফ ছিল সমস্তটা ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছে ঝড়ে। বনের একটা অংশ জমা-হওয়া বরফে এমনই ঢেকে গেছে যে উঁচু উঁচু পাইন গাছের গুঁড়ি আর দেখা যায় না। বরফের চাদরের উপর জেগে আছে এখানে ওখানে শুধু কতকগুলি পাইনের ছুঁচোলো মাথা।

বাড়ি ফিরে আসতেই কুটির-কর্তা খবর দিলেন, আর দু-ঘণ্টার মধ্যে লিফ্‌ট্ চলতে আরম্ভ করবে। নতুন অতিথিরাও আজ বিকেল থেকে আসতে শুরু করবেন বোধহয়।

জিজ্ঞেস করলেন—আপনারা থাকবেন নাকি আরো কিছুদিন? এইবার তো আবহাওয়া ভালো হবে।

আমি বললুম—না, এবারে আর নয়। অনেকদিন হল। শী-ইং শিক্ষা সম্পূর্ণ হল না বটে কিন্তু ঝড় তো দেখলুম!

সেদিন লাঞ্চ খাওয়া শেষ করে পিঠে রুকস্যাক বেঁধে মিতু আর আমি গুটি গুটি এগিয়ে গেলুম লিফ্‌টের স্টেশানে। একটু পরেই উপত্যকা থেকে লিফ্‌ট্ উঠে এল প্রচুর খাদ্যপানীয়ের রসদ নিয়ে। টিন ভর্তি মাছ, মাংস, তরকারি, ফল, মিনেরাল পানীয়, পাঁউরুটি ইত্যাদি সমস্ত যা এসে এ-কয়দিন জমা হচ্ছিল নীচের স্টেশানে।

লিফ্‌টে করে নামলুম। বাস ধরলুম, ট্রেন ধরলুম, অবশেষে পৌঁছলুম এসে প্রাহায়।

প্রাহায় এসে শুনলুম খ্রিপ্‌কার আতঙ্ক প্রায় অন্তর্হিত। যেমন ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল, তেমনি ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল।

ক-দিনের মধ্যে স্কুল কলেজ খুলে যেতে খ্রিপ্‌কার কথা কারো আর মনেও রইল না।

॥ ২৩ ॥

পোলাবি কৃষি সমবায়ের সাধারণ বার্ষিক সভার দিন ধার্য ছিল ৯ই ফেব্রুয়ারি। সেটা পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ২৩শে। নিমন্ত্রণ পত্র এল একখানা। সবাইকে যেতে লিখেছে।

মিতু বললে—মিটিং শুনতে কে যায়?

লামি বললে—কৃষি সমবায়ের আমরা কি বুঝি?

আমি বললুম—ও-সব কিছু নয়। খাওয়া দাওয়া, গান-বাজনা, বেড়ানো এইগুলোই আসল। এ সব প্রচুর হবে—চলো।

কাজেই বিজ্ঞান আকাদেমির এক প্রকাণ্ড গাড়ি করে চললুম আমরা পোলাবির দিকে।

সভা তো নয়, যেন গ্রামে উৎসব লেগেছে। রং-চং-এ পোশাক পরে চলেছে সব রাস্তা দিয়ে। কোথায় যে সভা, তা আর বলে দিতে হল না। সবাই যেদিকে চলেছে সেই দিকেই আমাদের গন্তব্য। হলের দরজা খুলতেই বাজনার শব্দ কানে এল। উচ্চৈঃস্বরে ঐকতান বাজছে। একসঙ্গে অনেকগুলো বাজনা। বাঁশী আর ড্রামের শব্দ সবার উপরে। যে-জে-ত্তের কনসার্ট। ভিতরে যাঁরা বসে আছেন, সুরের মৌজ লেগেছে তাঁদের মুখে—উজ্জ্বল উচ্চকিত হয়ে বসে আছেন সব। সভাপতি এসে আমাদের ভিতরে ডেকে নিয়ে গেলেন। হলের শেষে দেয়ালের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত অপরিসর যে টেবিলের সামনে প্রিসিডিয়ামের সভ্যেরা বসেছিলেন, সেইখানেই আমাদের বসালেন। হলের মধ্যে প্রায় তিন-শ গ্রামবাসী—বেশীর ভাগই বয়স্ক পুরুষ এবং মহিলা। নবীনারা যে যাঁর বাড়িতে সাজগোজে ব্যস্ত—মিটিংয়ের চেয়ে তাঁদের আকর্ষণ মিটিং-য়ের পরে যে নাচ হবে, তারই উপর। আমরা

যখন পৌঁচেছি, তখন মিটিং চলছিল। একদফা আলোচনা শেষ হয়েছে, আর একদফা আলোচনা আরম্ভ হবে, তার মাঝে বাজনদাররা বাজিয়ে নিচ্ছে। বাজনদারদের কী সাজ! টকটকে সবুজ পোশাক পরে এগারোজন বাহার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আস্তিনে, কনুইয়ে, কলারে একবিন্দু ময়লা নেই—ইস্ত্রি-করা তক্‌তক্‌ করছে সব। মাঠে ধুলো কাদার মধ্যে কাজ করতে হয় যাদের সারা বছর, তাদের পক্ষে বছরের দিনটায় ঝলমলে পোশাক পরে সবার সামনে দাঁড়ানো এক মস্ত ব্যাপার। আমাদের ডান পাশে গলায় লাল স্কার্ফ বাঁধা গ্রামের পাইওনিয়ার দল—ন' থেকে চোদ্দ বছরের ছেলেমেয়ে।

বাজনা থামতেই পাইওনিয়ার ছেলেমেয়েরা যেন উড়তে উড়তে চলে এল আমাদের সামনে। মিহি গলায় সবাই একসঙ্গে ধরল গান আর তার সঙ্গে নাচ। তারপর হল আবৃত্তি। আবার নাচ! হলের এক দিক থেকে আর-এক দিক বাঁইবাঁই করে লাট্টুর মত ঘুরে গাইতে গাইতে দৌড়তে দৌড়তে চলে গেল তারা নিজেদের জায়গায়। দেখলুম হাপরের মত হাঁপাচ্ছে সব। টেবিলের চারিদিকে ঘিরে বসতেই তাদের সামনে ধরে দিল গরম সসেজ আর ঠাণ্ডা লেমনেড। সেই নিয়ে পাইওনিয়ার দল যখন মহা ফূর্তিতে খাচ্ছে, তখন আবার আরম্ভ হল সভার কার্য। যে বছর শেষ হচ্ছে, সে বছরের কাজের রিপোর্ট দাখিল করলেন সভাপতি। উৎপাদন অন্য বছরের চেয়ে বেশী। সেই অনুপাতে সমবায়ের আয়ও। আয় থেকে শতকরা ১৩ ভাগ খরচ করা হয়েছে যন্ত্রাদি কিনে ও গরুর গোয়াল এবং অন্যান্য বাড়ি-ঘর করে। সমবায়ের এখনও কোনো নিজস্ব সংস্কৃতি আবাস নেই, যেমন কারখানাওয়ালাদের আছে, তার জন্যে কিছু সঞ্চয় করে রাখা হল এবারের আয় থেকে। এর উপর রাষ্ট্রের কাছ থেকে কিছু সাহায্য এবং সামনের বছরের আয়ের একটা অংশ পেলেই সামনের

বছরেই আবাস তৈরি হয়ে যাবে। এই সব খরচ, সঞ্চয় এবং আয়কর বাদ দিয়ে যা রইল, তা হল সভ্যদের নিজেদের প্রাপ্য। এ বছর সকলেরই পকেট মন্দ ভারি হয়নি। তাই সবাই বেশ খুশী। সর্বসম্মতিক্রমে রিপোর্ট গৃহীত হল।

এইবার খাওয়া। কাজের গুরুভারকে নানা উপায়ে এরা লঘু করতে জানে। বাৎসরিক সভা এদের শুধু সভা নয়। নিজেদের সমবেত কঠোর কাজের সফলতার আনন্দ বিকাশের সুযোগ। আমরাও সেই আনন্দের ভাগ নিলুম। মনে হতে লাগল, আমরা যেন শ্রম করেছি এবং আমাদেরও সেই শ্রম যেন সার্থক হয়েছে। বাজনা বেজে উঠল আবার। টেবিলের তলায় সবার পা নাচতে লাগল বাজনার তালে তালে।

সভাপতি বললেন—কেমন লাগছে আপনাদের ?

আমি বললুম—এরকম আশ্চর্য সভা কখনো দেখি নি।

সভাপতি বললেন—ছেলেমেয়েদের কেমন লাগছে ?

আমি বললুম—দেখতেই তো পাচ্ছেন।

ছেলেমেয়েরা পাইওনিয়ার দলে গিয়ে বসেছিল। দিব্যি জমে গিয়েছিল তাদের সঙ্গে। মিতুকে দাঁড় করিয়ে তার চারপাশে ঘিরে পাইওনিয়ারদের গান গেয়ে কায়দা-দুরস্তভাবে একখানি লাল রং-এর নতুন স্কার্ফ তার গলায় বেঁধে দিয়ে মিতুকে রীতিমত পাইওনিয়ার করে ফেলেছিল তারা। সেই টকটকে লাল স্কার্ফ গলায় দিয়ে মিতু বসেছিল তাদের সঙ্গে।

বাজনা থামতেই আবার শুরু হল সভার কার্য। এইবার পেশ করা হবে সামনের বছরের কর্মসূচী।

কয়েক বছর আগে এদের দেশেও আমাদের দেশের মত ক্ষেত-মজুরদের মধ্যে যথেষ্ট বেকারত্ব ছিল। তাদের মধ্যে যে-সব ভাগ্যবান ক্ষেত-মজুর তখন কাজ পেত, তাদের খাটতে হত দিনে অনেক সময় পনের ঘণ্টা পর্যন্ত। দিন-মজুরী তখনকার দিনের

মুদ্রানুযায়ী ছিল বারো ক্রাউন। তাতে করে বহু কষ্টে তাদের গ্রাসাচ্ছাদন হত। অনেক মজুরকে ভিজে অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘরে, এমন কি, ঘোড়ার আস্তাবল বা গরুর গোয়ালে পর্যন্ত রাত্রিযাপন করতে হত। গরীব জমিহীন ক্ষেত-মজুরের দিন গেছে। বেকারত্ব আর নেই। জমি এখন চাষীদের নিজেদেরই। হতাশার দিন ঘুচে গেছে। এখন এরা আলোচনা করে, প্রতি বছর কৃষির সম্পদ এবং নিজেদের সংস্থান আরো কি করে উন্নত করা যাবে, তাই নিয়ে। সবাই বিশ্বাস করে, সভাপতি বাৎসরিক সভায় আগামী বছরের পরিকল্পনার বিষয়ে যা বলবেন, তা অলীক নয়. তা ফলবে। এই বিশ্বাসটাই এদের এক আশ্চর্যলোকের মানুষ করে তুলেছে। আমি তো দেখেছি, আমাদের দেশের কর্তা-ব্যক্তিরা, নেতারা, রাজনৈতিকেরা, মন্ত্রীপুরুষেরা কত কী আশ্বাস দেন, কত স্তোক দেন, কত কী তাঁরা আমাদের জন্যে করবেন বলেন, কত কী আমরা পাবো, তার অঙ্গীকার দেন, কিন্তু ক-জন বিশ্বাস করে তাঁদের কথা? আমরা খালি সবুর করেই আছি—আমাদের মেওয়া ফলে না।

পোলাবি সমবায়ের সভাপতি যখন আগামী বছরের কার্যসূচী পড়ে শোনালেন, সবাই সাগ্রহে শুনল এবং বোধ হয় একটি কথাও অবিশ্বাস করল না। স্তোক নেই, ভুয়ো অঙ্গীকার নেই। যা হওয়া সম্ভব, সকলে মিলে যা করতে পারবে, তারই একটা বাস্তব চিত্র। সে চিত্র বড় লোভনীয়। শ্রোতাদের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ভবিষ্যতের সুখ-চিন্তায় অনেকেরই ভরে গেল মন।

পোলাবি হল একখানি ছোট কৃষি সমবায়। সারা চেকোস্লো-ভেকিয়ার দশ বারো হাজার গ্রামে এমনি ক' হাজার সমবায় আছে, জানি না। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই এই সময় বাৎসরিক সভা ডেকে সামনের বছরের কর্মপন্থা নিরূপণ করছে। সারা দেশ জুড়ে এই। চেকোস্লোভেকিয়া এখনও রুটির জন্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গম বিদেশ থেকে আমদানি করে, এক-অষ্টমাংশ মাংস

এবং এক-পঞ্চমাংশ মাখনও বাইরে থেকে আসে। কৃষি-সমবায়ের মাধ্যমে যে-ভাবে এরা কৃষি-শিল্পের উৎপাদনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তাতে করে খাদ্যের ব্যাপারে আত্মনির্ভর হতে এদের খুব দেরি নেই।

তবে সমবায় আন্দোলনকে সফল করে তুলতে এদের কম কষ্ট পেতে হয়নি; খাটতেও হয়েছে খুব। ব্যক্তিগত কৃষি-সম্পত্তি নিজের হাত-ছাড়া না করার মনোভাব তো ছিল সর্বপ্রধান বাধা। সে বাধা টপকাবার পর প্রথমে ছোট ছোট সমবায়ে ছেয়ে গিয়েছিল সারা দেশ। সেগুলি ছিল জমি-উন্নতির সমবায়, বিজলী-শক্তির সমবায়, কৃষি-সমবায় ইত্যাদি। এই ছোট ছোট যন্ত্র সমবায়কে এক করে হল কৃষি সমবায়। তখনকার সেই কৃষি সমবায়ের সভ্যেরা একসঙ্গে মিলে যন্ত্র, পশুর খাদ্য এবং জমির সার কিনতেন এবং ক্ষেতের কাজে পরস্পরকে সাহায্য করতেন। তখনও কিন্তু জমি ছিল প্রত্যেকের আলাদা। তারপর এল বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের আন্দোলন। ব্যক্তিগত জমির বেড়া ভেঙে দেওয়া হল। সব জমি এক করে সমবায়ের সম্পত্তি করে বড় বড় ট্রাক্টর এনে চাষ করা হতে লাগল। চাষের খরচ গেল কমে; উৎপাদন বাড়ল। পশু পালন ও প্রজনন কিন্তু তখনও ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল। চেক কৃষি শিল্পে পশু-প্রজনন এক বৃহৎ ব্যাপার। কাজেই সেই দিকে নজর পড়ল সবার। সভ্যাদের সব পশুকে এক জায়গায় এনে বৈজ্ঞানিক প্রথায় পশুপালন ও উৎপাদন চলল। এই সময় পর্যন্ত, যারা বেশী জমি ও পশু সমবায়ে দিয়েছে, তাদের আয় ঐ অনুপাতে, যারা কম জমি বা পশু দিয়েছে, তাদের চেয়ে বেশী ছিল। সমাজতন্ত্রের চোখে এটা ঠিক মনে হল না। এরা বলল, যারা বেশী জমি দিয়েছে বা বেশী পশু দিয়েছে, তারা বেশী আয় করুক, কিন্তু জমির সমানুপাতে বা পশু-সংখ্যার সমানুপাতে নয়—তার থেকে কিছু কম। এইভাবে, যাদের কম জমি ছিল, তাদের আয় কিছু বাড়ল, যাদের বেশী জমি ছিল, তাদের আয় কিছু

কমল। ফারাকটা আগের মত আর রইল না। এইভাবেই আপাতত চলেছে চেকোস্লোভেকিয়ার অধিকাংশ কৃষি সমবায়।

এইবার এরা ভাবছে, আরো বৈজ্ঞানিক প্রথায় আরো উৎপাদন বাড়ানো যায় কি করে? শীঘ্রই এরা সমবায় গুলিকে আরো বড় করে তুলবে। তিন চার পাঁচটি সমবায় জুড়ে একটি বড় সমবায় গড়বে। তার মধ্যে পড়বে হয়তো আট দশটি গ্রাম। চেক বিজ্ঞান আকাদেমি সারা দেশের কৃষি-উৎপাদনের ম্যাপ তৈরী করে ফেলেছেন—তাতে দেখানো আছে, দেশের কোন্ কোন্ স্থান কোন্ কোন্ কৃষি-দ্রব্য উৎপাদনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। মোটামুটি এই ম্যাপ অনুসারে বৃহৎ সমবায়গুলি ঠিক করে নেবে, তারা কি উৎপাদন করবে। মনে করা যাক, একটি বৃহৎ সমবায়ের মধ্যে পাঁচটি ক্ষুদ্র সমবায় পড়ল, যেখানে আগে কৃষিজাত দ্রব্যের প্রায় সব কিছুই উৎপন্ন হত। এখন হয়তো হবে একটি সমবায়ে শুধু দুধালো গরু; দ্বিতীয় সমবায়ে হয়তো শুধু শূয়োর পুষে তাদের মোটা করা হবে; তৃতীয় সমবায়ে হাঁস-মুরগী; চতুর্থ সমবায়ে পশু ও পাখির খাদ্য, কারণ খাদ্য না হলে অত পশু পালন হবে কি করে? আর পঞ্চমটিতে ধরে নেওয়া যাক গরু এবং হাঁস-মুরগী দুই-ই।

এই হলেই এদের কৃষি-উৎপাদনের হার এখানকার চেয়ে অনেক বেড়ে যাবে।

সভাপতি এসে ফিসফিস করে বললেন—এঁদের সকলেরই ইচ্ছা, আপনি বাংলায় কিছু বলেন।

কি বলব? এদের কার্যকলাপ দেখে আমি অভিভূত হয়ে গিয়ে ছিলুম। সমবেত চেষ্টায় যে কী অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় তা দেখে চমৎকৃত হয়েছিলুম। এই সবই বললুম আর গৃহিণী তর্জমা করে বলে গেলেন চেক ভাষায়। হাততালি পাওয়া গেল খুব।

বাজনা বেজে উঠল আবার। সবাই দাঁড়িয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে। 'কাজ' এবং 'শান্তি' নামে এদের দুটি জাতীয় সংগীত

আছে তাই গাওয়া হচ্ছে। কৃষি সমবায়ের সব উৎসবেই ও দুটি গাওয়া হয়।

সভার কাজ শেষ হল। এইবার খানিক বিরতির পর শুরু হবে নাচ-গান। গ্রামের নবীন-নবীনারা যারা এরই জন্যে তৈরি হচ্ছিল তারা এইবার আসবে।

সভাপতি এবং কর্মীরা অনুরোধ করলেন থেকে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু আমাদের গৃহ-প্রত্যাবর্তনের পথ তো লম্বা বড় কম নয়। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা চারজনে ঘরমুখো হলুম।

॥ ২৪ ॥

শীত শেষ হয়ে এল। বসন্ত তখনও আসে নি কিন্তু বসন্তের ইঙ্গিত আকাশে। ঈস্টার। দিবারাত্র বরফ দেখে দেখে যখন মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে ঠিক তখনই ঈস্টার এসে মনে করিয়ে দেয় যে, পৃথিবী থেকে উত্তাপ উষ্ণতা চিরতরে নির্বাসিত হয় নি। এই সময় দোকানে বাজারে কেবল ডিম। ডিমের ছড়াছড়ি। চারিদিক ডিমে ডিমে ভরে যায়। সত্যিকারের মুরগীর ডিম তো আছেই, তা-ছাড়া ডিমের আকারের কেক চকোলেট মিষ্টি সব জায়গায়। আর দেখা যায়, দোকানের জানলায় অতি অদ্ভুত চিত্র-বিচিত্র নকৃশা-করা ডিমের আস্ত গোল গোল খোসা। গ্রামের মেয়েরা এগুলি তৈরি করে। সূক্ষ্ম কারুকার্য করা এই শিল্প-দ্রব্যগুলির দাম অনেক সময় দশ থেকে ত্রিশ মুদ্রা পর্যন্ত !

একজন বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলুম—হঠাৎ এত ডিম আসে কোথা থেকে ?

তিনি বললেন—বাঃ, এই তো মুরগীর ডিম পাড়বার সময়।

—এত ডিম নিয়ে কি কর তোমরা ? সব খেয়ে ফেল ?

—খাই প্রচুর। কেক তৈরিতেও লাগাই। কিন্তু শেষ করা কি যায়? শুনেছি আজকাল বৈজ্ঞানিক প্রথায় ডিম রক্ষা করা হচ্ছে।

এই সূত্র ধরে এরা আজকাল কেমন করে ডিম রক্ষা করে, কোথায় করে, কতই বা করে, এই সব খোঁজ করতে গিয়ে উপস্থিত হলুম এদের অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর দপ্তরে। তাঁরা আমায় তখনই একটি 'ম্রাজির্না' অর্থাৎ "কোল্ড স্টোরেজ" দেখার ব্যবস্থা করে দিলেন।

কোল্ড স্টোরেজে আলু এবং কমলালেবু জমা করে রাখে ব্যবসায়ীরা, যাতে আকাড়ার সময় চড়া দামে বেচে মুনাফা করতে পারে, এই তো জানতুম। ম্রাজির্নায় এসে শিখলুম সঞ্চয় প্রক্রিয়ার আরো একটা মানে থাকতে পারে, যেটা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। আমাদের দেশে লোক সঞ্চয় করে এইজন্যে যে, যখন সুদূর ভবিষ্যতে উপায়ের পথ অনিশ্চিত বা বন্ধ হবে, তখন সেই সঞ্চিত ধনই হবে একমাত্র নির্ভর। এ দেশে সে ধরণের হৃদয়বিদারক সঞ্চয় উঠে গেছে। আমাদের দেশে লোকে বেড়া দিয়ে জমি আটকে রেখে দেয়, কু-ব্যবসায়ীরা চাল চিনি জমা করে আটকে লুকিয়ে রাখে, যাতে পরে দাঁওয়ে বেচে লাভ করতে পারে। এ দেশে কোনো জিনিস এরা জমিয়ে রাখতে জানে না, যা কাজে লাগবে না। এরা ভালবাসে এদের উদ্বৃত্তকে সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের যন্ত্রে পরিবর্তিত করে ফেলতে। উৎপাদনের স্রোত তাই এদের আটকে থাকে না—এগিয়ে চলে। মেলা জিনিস তৈরি হয়ে গুদম-ঘরে পাহাড় হয়ে পড়ে রইল, এ এদের একেবারেই পছন্দ নয়। কাজে লাগুক সব কিছু। কোনো জিনিস জমা হয়ে মৃতবৎ পড়ে থাকুক অথবা অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে ক্লেদাক্ত হোক এর থেকে ঘৃণ্য এদেশে কিছু নেই। তবু এদের লক্ষ লক্ষ মুরগী যখন এক নাগাড়ে ডিম পেড়ে চলে, সেগুলিকে গুদম-জাত করা ছাড়া উপায় নেই। নষ্ট হতে না দিয়ে সযত্নে তাদের

রক্ষা করা হয় ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্যে। বেয়াড়া মুনাফার জন্যে নয়।

ব্রাজির্নায় ঢুকে প্রথমেই গেলুম মুরগীর ডিমের ঘরে। অবাক হয়ে গেলুম। ডিমের গায়ে প্রলেপ লাগিয়ে ডিমের প্রশ্বাস পথ বন্ধ করে তাকে ঠাণ্ডা ঘরে রেখে দেওয়ার প্রথা ব্রাজির্নায় নেই। ডিম রক্ষার এক নতুন উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। এতে করে বহুদিন রাখলেও ডিমের স্বাদ গন্ধ গুণ নষ্ট হয় না। ঘুরন্ত ফিতের উপর ছোট ছোট বাটি ডিমের তরলাংশের জন্যে, তারই পাশে ঢালু নালি ডিমের খোসার জন্যে। সারি সারি বসে মেয়েরা—প্রত্যেকের পাশে এক ঝুড়ি করে ডিম। বাটির গায়ে ঘা দিয়ে তারা ডিম ভেঙে ঢেলে দিচ্ছে বাটির উপর। ডিমের হলদে আর সাদা এক সঙ্গে মিশছে প্রকাণ্ড এক কাঁচের পাত্রের মধ্যে। সেই পাত্রের নীচে লাগানো হচ্ছে এক-একটি পাঁচসেরি প্ল্যাষ্টিকের থলি। কল খুলে ধরলেই প্ল্যাষ্টিকের থলি ভর্তি হয়ে যাচ্ছে ডিমের তরলাংশে। থলির মুখ তখনই বন্ধ করে চালান করা হচ্ছে ঠাণ্ডা ঘরে। ঘরের শৈত্য শূন্যের নীচে কুড়ি থেকে ত্রিশ ডিগ্রি। আট হাজার করে ডিম ভাঙা হচ্ছে রোজ।

এই যে এত ডিম এখন এসে পড়ল, এদের সযত্নে রক্ষা করে তবে এদের সারা বছরের ডিমের চাহিদা মেটে। খাবার দোকানের এবং হোটেল রেস্তরাঁর চাহিদা। এই দিয়ে এরা কেক মিষ্টি তৈরি করে, অমলেট করে, নানা রকম ডিমের খাবার করে। এই খোসাহীন ডিম আর খোসাওয়ালা টাটকা ডিমের মধ্যে কোনো তফাত নেই। এরা পারে না শুধু ডিম সিদ্ধ করে মুখের কাছে তুলে ধরতে। অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য দপ্তর এইভাবে দেশের হোটেল রেস্তরাঁ ক্যান্টিনে খোসাহীন ডিম সরবরাহ করে থাকেন। পারিবারিক ডিমের চাহিদা অবশ্য অন্য রকমের। তাঁরা চান খোসা-সুদ্ধ-ডিম—যা দোকানে পাওয়া যায়। এই কারণেই শীতকালে যখন দেশের মুরগীরা ডিম পাড়া

বন্ধ করে দেয়, প্রায়ই দেখা যায় দোকানে আর ডিম নেই। বাড়ির গিন্নীরা তখন সকালে কর্তাদের পাতে গরম গরম ডিমের পোচটি ধরে দিতে পারেন না।

এই হল ডিম রক্ষণ। এর পর আছে ফল এবং ফলের রস। একই ব্যাপার। গ্রীষ্মের ক-মাসে ফল এবং বেরীতে হঠাৎ সারা দেশ ছেয়ে যায়। মানুষে আর কত খাবে? অমন যে সুস্বাদু রসে ভরা লালটুকটুকে চেরী, মুখে দিলে মনে হয়, যত পাই তত খাই, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে তো? বেশী খেলে পেট যা কামড়াবে, মনে থাকবে অনেকদিন। তাই এদেরও রক্ষা করতে হয়। ফল বেরী পিষে রস বার করে বড় বড় ড্রামে ভরে তাদের ঠাণ্ডা ঘরে রক্ষা করা হচ্ছে।

অধিকর্তা নিজে আমাকে নিয়ে কারখানায় ঘুরছিলেন। বললেন—আগেকার দিনে এখানে শুধু মাংস আর মাখন রাখা হত! ডিম-ফল-বেরী এটা নতুন! আর রাখছি আমরা রাঁধা খাবার। রান্না করা খাবার বায়ু-শূন্য টিনে বা কাঁচের বুয়ামে ভরে রাখার অন্য কারখানা আছে। এখানে আমরা ড্রামের মধ্যে ভরে যে-কোনো রাঁধা খাবার শূন্যের নীচে পঞ্চাশ ডিগ্রি শৈত্যের মধ্যে রেখে দিতে পারি। তার স্বাদ একটুও নষ্ট হবে না।

—এ রকম আজির্না আপনাদের দেশে কটি আছে?

—তিনটি মাত্র ছিল। কিন্তু যখন দেখা গেল আজির্নার মাধ্যমে খাদ্যের অপচয় প্রচুর বাঁচানো যায় তখন রিপাবলিকের মধ্যে দেখতে দেখতে একুশটি কারখানা গড়ে উঠল। খাদ্যবস্তু সংরক্ষণের সুবিদিত প্রথা হচ্ছে খাদ্যবস্তুকে জলকণা শূন্য করে রাখা—যেমন গুঁড়ো দুধ, গুঁড়ো ডিম, শুকনো আলু ইত্যাদি। আমরা কিন্তু জল সুদ্ধই খাদ্য-বস্তুকে সংরক্ষণ করি। এইটিই আমাদের বিশেষত্ব। এর ফলেই কোনো বস্তুর স্বাদ নষ্ট হয় না।

বলতে বলতে আমরা শ্রমিকদের ক্যান্টিন-ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

অধিকর্তা বললেন—খাবার সময় তো প্রায় হল। বসুন না।

চাদর, প্লেট, ছুরি, চামচ, কাঁটা পাতা একটি টেবিল দেখিয়ে দিলেন। নিজেও বসলেন আমার পাশে।

—ঐ সব জমাটি খাবার খাওয়াবেন নাকি?

—দেখুনই না।

সূপ এল, টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। মাংসের ঝোল থেকে ধোঁওয়া বেরচ্ছে।

অধিকর্তা বললেন—মাইনাস্ পঞ্চাশ ডিগ্রি ছিল, প্লাস্ এক শ করে নিয়ে আসা হল।

মুখে দিয়ে দেখলুম, ঠিক যেন সবে রাঁধা হয়েছে।

গরম খাবার শেষ হতেই এল পেষাই করা ঠাণ্ডা ফল। জমাটি স্ট্রবেরী। এতেও ধোঁওয়া বেরোচ্ছে। ঠাণ্ডা বাষ্প। স্ট্রবেরীর স্বাদ বিন্দু মাত্র নষ্ট হয় নি—ঠিক যেন বন থেকে তুলে এনে ঠাণ্ডা করে টেবিলে দিয়ে গেল।

ম্রাজির্নাগুলি অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য দপ্তরের এক মস্ত সহায়। এই বাণিজ্য দপ্তরকে সারা বছর সারা দেশের অধিবাসীদের খাদ্য বস্ত্রের চাহিদা সুষ্ঠুভাবে মেটাতে হয়। দাম বাড়ালে চলবে না। জিনিস কম পড়লে চলবে না। গত চার বছরের মধ্যে বরঞ্চ চার বার কিছু কিছু জিনিসের দাম কমানোই হয়েছে। অথচ মাইনে কারো কমে নি, বরং বেড়েছে। এর ফলে খাবার জিনিসের চাহিদা বেড়েছে। ঠিক-মত সরবরাহ না করলে হোটেল রেস্তরাঁয় খাবার কম পড়ে যেত। দেশে যত দোকান আর রেস্তরাঁ তারা সব এই অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য দপ্তরের তাঁবে। সওয়া লক্ষ দোকান রেস্তরাঁর সব কিছু সরবরাহ এই দপ্তর থেকে করতে হয়। একশ দশটি জেলায় একশ দশটি পাইকারী খাদ্যবস্তুর গুদম আছে। এগারটি উপপ্রদেশে অন্যান্য বস্তুর এগারটি গুদম আছে—সেখানে থাকে কাপড়, খেলা-ধুলোর জিনিস, ওষুধ থেকে শুরু করে ছুঁচ সুতো এবং ঘড়ি গয়না

পর্যন্ত। আর আছে ব্রাজির্না এবং বিরাট বিরাট 'সাইলো' নামক শস্যভাণ্ডার, যেখানে পঞ্চাশ গজ উঁচু ফাঁপা কংক্রীটের স্তম্ভের মধ্যে শস্য সঞ্চয় করে রাখা হয় দরকার মত সরবরাহের উদ্দেশ্যে। কাজটি বড় সহজ নয়। সরবরাহের কাজ উৎপাদন কর্মের চেয়ে বহুতর গুণ কঠিন। দেশের উৎপাদনকে জাতীয়করণ করে তাকে সুসংবদ্ধ ভাবে চালানো যত না শক্ত, দেশের বাণিজ্যকে জাতীয়কৃত করে তাকে সুশৃঙ্খল সুষ্ঠুরূপে চালানো অনেক বেশী শক্ত। এরা তাই করছে। এই কাজে সংবাদ এবং সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করবার জন্যে বেশ মস্ত এক গবেষণা বিভাগ আছে এদের। গিয়েছিলুম দেখতে একবার। যে মহিলার হাতে পরিসংখ্যানের ভার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, কোনো বিশেষ তথ্য তাঁরা বিশ্লেষণ করছেন কি না?

—করছি। মানুষের মাইনে বাড়লে কোন কোন জিনিসের চাহিদা বাড়বে?

—বার করতে পারবেন?

—বিশেষ শক্ত নয়। কারণ জানেনই তো, এ দেশে আয়ের তারতম্য খুব বেশী একটা নেই। অল্প স্বল্প মাইনে বাড়লে লোকে কি কিনবে না কিনবে বার করে ফেলা যায়।

—মাইনে বাড়বে না কি লোকের?

—সে রকম খবর কিছু নেই। তবে সাধারণ দ্রব্যাদির উৎপাদন বাড়ার সম্ভাবনা তো রয়েছে। বাড়তি উৎপাদন খাওয়াতে গেলে মানুষের মাইনে বাড়াতে হবে—এই আর কি।

—চাহিদা বার করে কি করবেন?

—চেষ্টা করব যাতে আগে থেকেই সেই জিনিসগুলির উৎপাদন বাড়িয়ে ফেলা যায়।

—এত আটঘাট বেঁধে আপনারা কাজ করেন? আমাদের দেশে তো, ধরুন চিনির সরবরাহ কমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে চিনি বাজার থেকে

উধাও। লোকে অমনি ডবল দাম দিয়ে চিনি কিনতে আরম্ভ করলে। বাস্ চুকে গেল।

সর্বনাশ! এখানে সে উপায় নেই। কোনো জিনিসের দাম বাড়ালে চলবে না।

আপনাদের বিভাগের উপর দেখছি মস্ত দায়িত্ব। সিদ্ধান্তের ভুল চুক হয়ে গেলেই তো মহা গণ্ডগোল।

—ভুল হয় বইকি। তাই বলে কি আর হাত পা ছেড়ে বসে থাকতে হয়? একবার যেমন শ্রমিকদের শতকরা পাঁচ ভাগ মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমরা তথ্য বিশ্লেষণ করে বার করে-ছিলুম, শতকরা পাঁচ ভাগ মাইনে বাড়লে সবচেয়ে বেশী চাহিদা বাড়বে মাংসের। সত্যিই সে সময় মাংসের অভাব ছিল দেশে। কিন্তু হল কি জানেন? চাহিদা বাড়ল দেশ ভ্রমণের। রেলের স্টেশানে লম্বা লম্বা লাইন টিকিট কেনবার। ট্রেনে কেউ জায়গা পায় না।

—আপনারা কি করলেন তখন?

—আমরা প্রথমটা খুব হো হো করে হাসলুম। তারপর আমাদেরও তো মাইনে বেড়েছিল, বেরিয়ে পড়লুম এক-একটা করে রেলের টিকিট কিনে দূরের পথে, করিডোরে ঠেসাঠেসি করে দাঁড়িয়ে।

॥ ২৫ ॥

হঠাৎ বসন্ত এসে গেল। জানান না দিয়েই এল। গাছপালার দিকে তাকিয়ে অতটা দেখি নি। প্রথমে টের পেলুম মানুষের দিকে তাকিয়ে। তরুণ তরুণীদের দিকে নয়—তাদের তো চিরদিনই বসন্ত—প্রাণের ঝরণাস্রোত কতখানি বাড়ল কমল ধরা যায় না। কিন্তু ট্রামে একদিন যখন শুনলুম একজন বুড়ো-মত লোক আর একজন বুড়ো-মত লোকের কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে বলছে—বসন্ত এসে গেছে

দাদা! তখনই লক্ষ্য করলুম বিষয়টা। ইয়োরোপ মহাদেশে এমনি করেই বসন্ত হঠাৎ আসে। হঠাৎ সব কিছু বদলে দিয়ে যায়। আমাদের দেশে যেমন প্রখর গ্রীষ্মের পর বর্ষা। হঠাৎ এসে সব কিছু শ্যামল করে দেয়!

দেখতে দেখতে গাছগুলো কচিপাতায় ছেয়ে গেল। সবুজে সবুজ চারিদিক। পার্কগুলোয় ঢুকে দেখি শাদায় শাদা। চেরী ফুল প্লাম ফুলের ভারে গাছ নুয়ে পড়েছে। পাতার চেয়ে ফুলই বেশী। রোদে পা দিয়ে বেঞ্চিতে বসে মনে হয় যেন স্বপ্ন দেখছি—চোখের সামনে যা আছে তা যেন কিছুই সত্যি নয়। শহরের রাস্তায় চলতে দুধারে শুধু হলদে ফুলের মেলা। শহরতলিতে হালকা বেগুনী ফুলের বন্যা নেমেছে। চারিদিকে ফুল আর ফুল। পয়লা মে এল। মে দিবস। ঐতিহাসিক কালে এই দিনটিতে বসন্তের আবাহন জানিয়ে গ্রামের মানুষেরা উৎসব করত; আজকাল শহরের মানুষেরা দলবদ্ধ হয়ে পতাকা তুলে কুচকাওয়াজ করে। পয়লা মে হল মেহনতি মানুষদের দিন। সবাই সেদিন বেরিয়ে আসে শহরের প্রধান সড়কে। পাঁচ ছ ঘণ্টা ধরে চলে শোভাযাত্রা। ভিড়ের স্রোতে গা মিলিয়ে হাঁটছিলুম, হঠাৎ শুনি—হিন্দি-চেকি-ভাই-ভাই! উপরে তাকিয়ে দেখি পাঁচতলার বারান্দা থেকে একদল ভারতীয় ছাত্র লম্বা কাপড়ে—হিন্দি-চেকি-ভাই-ভাই—লিখে তারই পিছনে দাঁড়িয়ে থেকে-থেকে চীৎকার করে উঠছে আর তাই শুনে শোভাযাত্রার মানুষ হাত পা ছুঁড়ে সহস্র কণ্ঠে জবাব দিচ্ছে—হিন্দি-চেকি-ভাই-ভাই! সিঁড়ি খুঁজে বার করে উঠে গেলুম পাঁচতলার বারান্দায়। তারপর সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে ডাক দিলুম—হিন্দি-চেকি-ভাই-ভাই! নীচের জনসমুদ্র থেকে জবাব এল—হিন্দি-চেকি-ভাই-ভাই। মে দিবস পালিত হল। আমরা বাড়ি ফিরে গিয়ে এক পারিবারিক সভা ডাকলুম। বসন্ত কাল এসে গেছে, এবারে নিঃসন্দেহে গ্রাষ্মকালও আসবে, সুতরাং আসবে গ্রীষ্মের

ছুটি। ছুটির পরেই ফিরে যেতে হবে দেশে। আলোচ্য বিষয় হল, এই ছুটির সময় কি করা যায়? অবকাশ কাটানো যায় কি করে?

বেশীক্ষণ আলোচনা করতে হল না। সবাই বললে—হাঁটতে হবে। লটবহর বাদ দিয়ে শুধু রুকস্যাক পিঠে নিয়ে অনির্দিষ্ট যাত্রা-পথে। পথ যখন অনির্দিষ্ট তখন আর আলোচনার রইল কি? শুধু ঠিক করে ফেলা কোথা থেকে শুরু হবে আমাদের পদযাত্রা। সেটাও মুলতুবি রইল তখনকার মতো। মোটামুটি স্থির হল, এবারে গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা চরণিক হব। সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণকে স্মরণীয় করবার জন্যে সন্ধ্যাকালে আমরা বেরিয়ে পড়লুম মাছের দোকানে মাছ খেতে। প্রাহার বিখ্যাত মাছের দোকান। শহরের প্রধান সড়কের উপর। এই ধরনের দোকান সারা শহরে একটিই আছে। মাছ-খেকো বাঙালীর স্বর্গপুরী। এ দেশে তো কেবল মাংস খেতে হয়; সাধারণ রেস্তরাঁয় খুব কমই পাওয়া যায় মাছ। তাই প্রাহায় থাকতে থাকতে বাঙালীর প্রাণ মাঝে মাঝে মাছ খাবার জন্যে আঁকুপাঁকু করে ওঠে। মাছের দোকান এই 'রিবার্নায়' এসে তাই আমরা মাঝে মাঝে প্রাণ ভরে মাছ খাই। ভাজা মাছ, সিদ্ধ মাছ, মাছের রোষ্ট, ঝোলের মধ্যে মাছ, কত রকম বলব? কাঁটা-চচ্চড়ির কথা যদি বাদ দেওয়া যায়, একশ রকম মাছের পদ সারা বছরে এখানে পাওয়া যায়। বাঙালী কেউ যদি চেকোস্লোভেকিয়ায় আসেন, প্রথমেই তাঁর আসা উচিত প্রাহার এই রিবার্নায়। মাছের দোকানের তিনটি অংশ। প্রথম অংশে শুধু ঠাণ্ডা মাছ—মাঝারি গোছের সস্তায় খাবার ঘর এটা। দ্বিতীয় অংশ একটি দামী রেস্তরাঁ। এখানে নানারকম মাছের শৌখিন ডিশ পাওয়া যায়। তৃতীয় অংশ সস্তায় খাবার ঘর—সামো-অব্স্লুহা বা স্বয়ংসেবী খাদ্যগৃহ—এখানে খুব ভিড়। এইখানেই আমরা ঢুকলুম। চারজনের বসবার মতো খালি টেবিল একখানাও নেই। মিতু আর আমি মাছ ভাজার প্লেট নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে চার-সীটওয়ালা একটা টেবিলে

ছুটো সীট খালি দেখে বসে পড়লুম। একটু দূরে অন্য একটা টেবিলে লামি আর লামির মাও বসলেন।

বসেই মিতু বললে—বাবা, হাঁটতে গেলে আমাদের চারজনের চারখানা রুকস্যাক তো দরকার, কোথায় পাবে?

আমি বললুম—ভেবে রেখেছি। দুখানা কিনব আর দুখানা ধার করব। এ দেশের সবারই দু-একখানা বাড়তি রুকস্যাক থাকে। চাইলেই পুরোনো একটা দিয়ে দেবে।

মিতু বললে—আমার কিন্তু নতুন রুকস্যাক চাই।

আমি বললুম—বেশ, আমি পুরোনো রুকস্যাক নিতে রাজী। এখন তোমার মা আর দিদির মধ্যে একজনকে আর একখানা পুরোনো রুকস্যাক নিতে রাজী করাও, তা হলেই হবে।

কথা কইছি আর আমাদের পাশে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা অত্যন্ত উৎসুক হয়ে আমাদের বাক্যালাপ শুনছেন আর তাকাচ্ছেন আমাদের দিকে। আমার পাশে বসে এক মহিলা, মিতুর পাশে এক বৃদ্ধ। বেশ বুঝলুম মহিলার অদম্য কৌতূহল। জানতে চান কি ভাষায় কথা কইছি আমরা। শেষে মহিলাটি আর থাকতে পারলেন না। টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে বৃদ্ধকে কি একটা বললেন। বৃদ্ধ একটু ইতস্তত করে তারপর হাত কচলে বললেন—আজ্ঞে, যদি কিছু মনে না করেন, এই মহিলাটি জানতে চাইছেন, আপনারা যে ভাষায় কথা কইছেন তা কি গ্রীক?

যে কোনো দুর্বোধ্য ভাষাকে গ্রীক বলে অভিহিত করাই দুনিয়ার রীতি। তাই আমি যদি বলতুম—হাঁ, তাহলে ঠিকই বলা হত। কিন্তু আমি বললুম—না!

বৃদ্ধ এর চেয়ে পূর্ণতর একটা উত্তর আশা করেছিলেন। একটু থেমে বললেন—তবে কি আপনারা রুমেনীয় কিংবা বুলগেরীয় ভাষায় কথা বলছিলেন?

আমি আবার সংক্ষেপে বললুম—কোনোটাই না।

বৃদ্ধ হতাশ হয়ে বললেন—তবে কি ভাষা ?

ভাবলুম, যথেষ্ট হয়েছে, এইবার কৌতূহল চরিতার্থ করা যাক। বললুম—ইণ্ডিয়ার ভাষা।

—ইণ্ডিয়া! ইয়েশিস্ মারিয়া! বাস রে, সে যে অনেক দূর!

ইয়েশিস্ মারিয়া তর্জমা করলে দাঁড়ায় যীশু ও মেরি! এর মানে —বাপ্‌রে বাপ্। কিংবা, কী আশ্চর্য! চেকরা অবাক হলে বা উত্তেজিত হলে ঘন ঘন এই বাক্য ব্যবহার করে।

মহিলার দিকে ঝুঁকে বৃদ্ধ বললেন—এঁরা ইণ্ডিয়ার লোক। নিজেদের ভাষায় কথা কইছিলেন।

বিদেশ সম্বন্ধে এরা আজকাল অনেক খবর রাখে। আফগানিস্তান, ইকুয়েডর বা ইরাক বিষয়ে গুরুগম্ভীর বই বেরলেও সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যায়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও এরা ওয়াকিবহাল, যেমন আমাদের দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষা, লোকাচার জাতিভেদ, আবহাওয়া, কমলালেবু, কলা, আনারস, সাপ, বাঘ, সন্ন্যাসী, মজুরের মাইনে, স্ত্রী-স্বাধীনতা ইত্যাদি। কিন্তু প্রথম দেখা হলে যেই এরা জানতে পারে আমরা ভারতের লোক, তখন ভাষার প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে প্রথমেই এরা যেটা বলবার চেষ্টা করে সেটা হচ্ছে, এরা নেহরুর নাম শুনেছে। নেহরুর কথা বললেই আমাকেও কিছু বলতে হয়। আমি তখন বিশ্বশান্তি প্রসঙ্গ তুলে ভারতের হয়ে একটু প্রোপাগাণ্ডা করে নিই। বলি—ঠিক, ঠিক, নেহরু—মীর!

শান্তিকে এরা বলে মীর।

মীর এদেশে বড় মধুর শব্দ। ছোট্ট দেশ চেকোস্লোভেকিয়া। মীর ছাড়া এদের গতি নেই। যুদ্ধ লাগলে সবার আগে এই সব ছোট দেশগুলিই কচুকাটা হয়ে যাবে।

যা ভেবেছিলুম তাই হল। মহিলা চোখ বড় বড় করে বললেন—ইণ্ডিয়া! নেহরুর দেশ।

আমি সঙ্গে সঙ্গে একটা আঙুল তুলে বললুম—নেহরু, মীর !

সে দিবসে আজ সারাদিন এরা মীর মীর করে চেঁচিয়েছে। বৃদ্ধের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বলে উঠলেন—আনো আনো, (অর্থাৎ হাঁ হাঁ) নেহরু—মীর।

মহিলাও ঘাড় দুলিয়ে বললেন—আনো, নেহরু, ইণ্ডিয়ে, মীর !

বিশ্বশান্তি হল। আমাদের মাছ ভাজা খাওয়াও শেষ হল—পেটের শান্তি। লামিদের কাছে যেতে ওরা বললে—তোমাদের টেবিলে তো বেশ জমেছিল, ব্যাপার কি ?

॥ ২৬ ॥

প্রাহা থেকে মোটারে করে ঘণ্টা-খানেকের পথ—ছোট্ট একটি গ্রাম লিডিৎসে। নগণ্য গ্রাম। স্থানীয় লোকেরা ছাড়া বিশেষ কারুরই সে গ্রামের নাম জানা বা সে গ্রামকে মনে রাখবার কথা নয়। সেই গ্রাম আজ বিশ্ববিখ্যাত। দর্শনীয় বস্তু বলতে আমরা যা বুঝি বা বোঝাই তেমন কিছুই সে গ্রামে নেই। না কোনো মিনার, না কোনো অপূর্ব গির্জে বা প্রাসাদ, না কোনো মিউজিয়াম। নেহাৎই একখানি গ্রাম। এক ঐতিহাসিক করুণ ঘটনার ফলে সেই গ্রাম আজ সর্বজনবিদিত। সারা বছর ধরে দূর দূরান্তর থেকে লোকে আসে সেই গ্রাম দেখতে। সব চেয়ে বেশী আসে ১০ই জুন তারিখে।

৮ই জুন ডাঃ ফাউক্নারের আপিস থেকে এক টেলিফোন পেলুম। ডাঃ ফাউক্নার জানাচ্ছেন, আগামী ১০ই জুন সকালে প্রচুর বিদেশী নিমন্ত্রিতদের নিয়ে দুখানি বাস প্রাহা থেকে লিডিৎসে গ্রামে যাচ্ছে। তাতে করে আমি লিডিৎসে যেতে রাজি আছি কি না ?

চেকোস্লোভেকিয়ায় এসে অবধি লিডিৎসে দেখিনি। আমি বললুম—নিশ্চয় রাজি আছি।

ডাঃ ফাউক্‌নার হচ্ছেন চেকোস্লোভেকিয়ার আন্তর্জাতিক মৈত্রী সংঘের অধিকর্তা। এই সংঘটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও নয়, টুরিষ্ট প্রতিষ্ঠানও নয়। সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক সংগঠন। বিদেশী যাঁরা চেকোস্লোভেকিয়ায় এসে দেশটিকে দেখতে চান, জানতে চান, বুঝতে চান, তাঁরা সাহায্য পান ডাঃ ফাউক্‌নারের সংঘের কাছ থেকে। বিদেশের নানা মৈত্রী ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ। এঁরাই বাস্‌এর বন্দোবস্ত করেছেন লিডিৎসে নিয়ে যাবার জন্যে, সেখান থেকে ফেরত আনবার জন্যে।

আমরা সবসুদ্ধ শ-খানেক মানুষ। যাঁরা আমাদের নিয়ে বেড়াবেন, ঘোরাবেন, বোঝাবেন তাঁরা ছাড়া আর সকলেই বিদেশী। ইতালিয়ান সব চেয়ে বেশী। তা ছাড়া আছেন ফরাসী, ইংরেজ, জার্মান, গ্রাক, চীনা, জাপানী আর ভারতীয়ের মধ্যে আমি।

শীতের হাওয়া বিদায় নিয়েছে। প্রাহার বাতাসে উষ্ণতার আমেজ। প্রাহা ছাড়িয়ে চলেছে আমাদের বাস গ্রামের পথ দিয়ে। আকাশে ফিকে মেঘ—তার মধ্যে দিয়ে হালকা রোদ এসে পড়েছে নতুন-সবুজ-হওয়া গাছ আর ঘাসের উপর। গ্রামের পথে যারা হাঁটছে, কাজে যাচ্ছে, নব-উষ্ণ-ঋতুর আগমনে তাদের মুখে খুশার আলো, তাদের গায়ে হালকা পোষাক, মনও পোষাকের মত হালকা। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে-না যে ঠিক আজকেরই দিনে ১৯৪২ সালে এই রাস্তারই উপর দিয়ে, এই গ্রামের ভিতর দিয়েই মৃত্যুদূতের কালো ছায়া ছুটে গিয়েছিল লিডিৎসে গ্রামের দিকে।

মধ্যরাত হতে তখন আধ ঘণ্টা বাকি। অন্ধকার উষ্ণ রাত্রি। আশপাশের আর সব গ্রামের মত লিডিৎসে গ্রামও পরম নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছে। গ্রামের অধিবাসীরা বেশীর ভাগই খনি মজুর। নিকটস্থ খনিতে তারা খাটতে যায় সারাদিন। সন্ধ্যায় ফিরে এসে ঝুলকালি ধুয়ে মুছে পেট ভরে খেয়ে কাঠের কুঁদোর মত বিছানায় এলিয়ে পড়ে আরামে ঘুম দেয়। শীতে যেমন কাঁচের শার্সি বন্ধ করে ঘুমোতে

হয় এখন আর তার দরকার নেই। কাঁচের জানলা খুলে নির্মল গ্রাম্য বাতাসে পরম নির্ভরতায় ঘুমোচ্ছে সব। লিডিৎসে উপত্যকা নীরব। উপত্যকার মধ্যে দিয়ে নীরবে বয়ে যায় একটি ছোট্ট নদী—গ্রীষ্মের রাতে তার জলে এসে পড়ে আকাশ-ভরা তারার ছায়া। হঠাৎ শত-শত মোটারের ইঞ্জিনের বীভৎস ঘর্ঘর শব্দে ঘুম ভেঙে যায় গ্রামবাসীর। সেই সঙ্গে কর্কশ গলায় মানুষের চীৎকার। দেখতে দেখতে গ্রাম ভরে যায় সশস্ত্র বাহিনীতে। লোহার পেরেকওয়ালা বুটের শব্দে ধ্বনিত হয়ে ওঠে গ্রামের রাস্তা। প্রথমটা হতচকিত হয়ে যায় গ্রামবাসীরা। গভীর ঘুমের অচৈতন্য ভাব কাটতে সময় লাগে খানিকটা। অন্ধকার চেরা তীক্ষ্ণ সার্চ লাইটের আলোয় চোখে পড়ে শিরস্ত্রাণ-পরা সারি-সারি জার্মান সৈন্য। দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়। কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র। তারপরই গ্রামবাসীরা বুঝতে পারে স্বয়ং মৃত্যু তাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। নাৎসি সৈন্যেরা তৈরী হয়েই এসেছিল। তারা অপেক্ষা করতে জানে না। বিছানার মধ্যে থেকে টেনে বার করে নিয়ে গেল প্রত্যেক বাড়ির প্রত্যেক মর্দ পুরুষকে, এক মুহূর্ত্ত দেরী করল না।

পুরুষদের সকলকে গোলাবাড়ির মধ্যে বন্দী করা হয়ে যেতেই স্ত্রীলোক আর শিশুদের টেনে বার করে নিয়ে যাওয়া হল স্কুল-বাড়িতে। তাদের কান্নার শব্দে ভরে উঠল গ্রামের রাস্তা। ভোর হবার আগেই পনের বছরের উর্দ্ধে যত স্ত্রীলোক ছিল তাদের সকলকে পাঠিয়ে দেওয়া হল কন্‌সেন্‌ট্রেশান বন্দীশালায়। শিশুদের চালান করা হল গ্যাস-চেম্বারে গ্যাস প্রয়োগ করে হত্যা করবার জন্যে। কিছু কিছু শিশু চলে গেল জার্মাণীতে, যাতে তারা নব-শিক্ষা-লাভ করতে পারে। পুরুষদের সকলকে গোলাবাড়ির দেয়ালে সার-বন্দী করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গুলি করা হল। একজনকেও ছাড়া হল না। তাদের মৃত দেহগুলি কুড়িয়ে নিয়ে প্রকাণ্ড এক গর্ত্ত করে এক সঙ্গে কবর দেওয়া হল।

ঘড়ির কাঁটার মত হল সব। তারপরেই ডিনামাইট দিয়ে গ্রামের প্রত্যেকটা বাড়ি উড়িয়ে দিয়ে ভগ্নস্তূপে আগুন লাগিয়ে স—ব ছাই করে দেওয়া হল। মুছে গেল লিডিৎসে গ্রামের চিহ্ন পৃথিবীর বুক থেকে। হিটলারের আদেশে যেখানে যত ম্যাপ ছিল, চেক্ হোক, জার্মান হোক তার থেকে লিডিৎসে নাম কেটে বাদ দেওয়া হল। হুকুম হল লিডিৎসের আর কোনো চিহ্নই থাকবেনা—না মাটির বুকে, না ম্যাপের উপর, না মানুষের মনে।

বাসে যেতে-যেতে আমাদের গাইড হেলেনা পাশে বসে বলছিলেন লিডিৎসের গল্প। বলছিলেন—

তারপর হিটলারের আদেশ-মতে লিডিৎসের চিহ্ন মুছে দেওয়া হল সমস্ত ম্যাপ থেকে।

কিন্তু মানুষের মন? মানুষের মন কি করে ভুলবে লিডিৎসেকে? যে লিডিৎসে ছিল একেবারেই অজানা, একেবারেই নগণ্য, যে লিডিৎসের আঁচড় পর্য্যন্ত সত্যিই মুছে দিল হিটলার, সেই লিডিৎসেই মানব-মনকে অধিকার করে নিল সঙ্গে সঙ্গে এবং সম্পূর্ণরূপে। লিডিৎসে যেদিন ধ্বংস হয় ঠিক তার দু-দিন পরেই ডাঃ বারনেট ষ্ট্রস্, ইংলণ্ডের একজন এম্ পি, ইংলণ্ডে এক আন্দোলন শুরু করলেন লিডিৎসেকে নতুন করে গড়ে তোলার। ঐ হল শুরু। ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু। সেই বছরই সেপ্টেম্বার মাসে 'লিডিৎসে আবার বাঁচবে' এই নামে এক আন্তর্জাতিক কমিটির প্রথম অধিবেশন হয়। তাতে মিত্রপক্ষের প্রত্যেক সরকারের সদস্য উপস্থিত থাকেন। যতদিন যুদ্ধ চলেছিল প্রতিদিন লোকে হিটলারের অত্যাচারের প্রতীক হিসেবে লিডিৎসেকে স্মরণ করেছিল। যুদ্ধের পর লিডিৎসেকে গড়ে তুলেছে নতুন করে।

আমাদের বাস এসে পৌঁছল লিডিৎসের সীমানায়। বাসের গতি ক্ষীণ হয়ে এল—যেদিকে যত রাস্তা সব ভরে গেছে গাড়িতে আর মানুষে! সবাই চলেছে লিডিৎসের দিকে। আজকের দিনের

একমাত্র তীর্থস্থান লিডিৎসে। মোড়ে মোড়ে পুলিস দাঁড়িয়ে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করছে। আকাশে যে-টুকু ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ ছিল তা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপে গেছে। সোনালী রোদে লিডিৎসে গ্রাম সমুজ্জ্বল। উজ্জ্বল গ্রামের রাস্তা দিয়ে গুটি গুটি এগিয়ে চলেছে আমাদের বাস গ্রামের খোলা মাঠের দিকে।

হেলেনাকে জিজ্ঞেস করলুম—আজ কত লোক হবে বলে আপনার মনে হয়?

—পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর হাজার হবেই। আরও বেশী হলে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

—গ্রামের জন-সংখ্যা কত?

—সাড়ে চার-শ'র কিছু উপরেই হবে।

ছোট্ট গ্রাম তাহলে?

—হ্যাঁ :নেহাতই ছোট্ট। গ্রামের লোক-সংখ্যার চেয়ে গ্রাম দেখতে যাঁরা আসেন তাঁদের সংখ্যাই সব সময় বেশী।

নির্দিষ্ট বাস ষ্ট্যাণ্ডে আমাদের বাস এসে দাঁড়াল। অগুন্তি মোটার আর বাস চারিদিকে। মাঠের মধ্যে জন-সমুদ্র। সেই দিকে আমরা অগ্রসর হলুম। জনসমুদ্রের ওপারে খানিকটা দূরে উচ্চভূমির উপর দেখা যায় লাল টালির ছাদ মাথায় ছোট ছোট বাংলো-বাড়ি। ঐ হচ্ছে নতুন লিডিৎসে গ্রাম। ঝরঝরে তকতকে গোছানো গ্রামটি। ওদের কাচ্চা বাচ্চারা আজ হাসে, খেলা করে, গোলমাল করে, ছুটোছুটি করে। লিডিৎসে মরে গিয়েও আবার বেঁচে উঠেছে।

সঙ্গীরা বক্তৃতা মঞ্চের কাছে যাবার জন্যে ব্যস্ত। আমি তাঁদের ছেড়ে মাঠ পরিক্রমণ করায় মন দিলুম। বক্তৃতা শুরু হয়ে গেছে। বিরাট মাঠের চারিদিকে মাইক্। চলতে চলতেই শোনা যায় মিলিটারি বাদ্যের আওয়াজ, সমবেত কণ্ঠে গাওয়া 'লিডিৎসে সঙ্গীত', বক্তারা যা বলছেন তা। এক জায়গায় দেখলুম লিডিৎসে গোলাপের প্রতীক আঁকা ধাতুর ব্যাজ বিক্রী হচ্ছে। কিনে নিয়ে

আঁটলুম কোটের ল্যাপেলে। একটু এগিয়েই এসে পড়লুম এদের বিখ্যাত গোলাপ-বাগানে। সযত্নে সাজানো অপূর্ব গোলাপের কেয়ারি। দামী এবং দুষ্প্রাপ্য সব ফুল। যেখানে রক্তের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল সেখানে লাল সুগন্ধী ফুলের বন্যা বইয়ে দিয়েছে।

যুদ্ধ বিরতির পরের বছর থেকেই নতুন করে লিডিৎসে গ্রাম করার কাজ শুরু হয়। 'লিডিৎসে আবার বাঁচবে' কমিটির সভাপতি ডাঃ ষ্ট্রস্ই প্রথম ১৯৪৬ সালে পাঁচ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলে এনে দেন লিডিৎসে গড়ার ফাণ্ডে। নানা দেশের তরুণ-তরুণীরা স্বয়ং-সেবক হয়ে ভীড় করে এসেছিল রাস্তা ঘাট বাড়ি তৈরীর কাজে। ১৯৫৬ সালে 'লিডিৎসে আবার বাঁচবে' কমিটি লিডিৎসেতে এক সুন্দর আন্তর্জাতিক গোলাপ-বাগান করবার আন্দোলন শুরু করেন। এক হাজার গোলাপ গাছের জন্যে তাঁরা নানা দেশের কাছে আবেদন পাঠান। দশ-হাজার বাছাই-করা গোলাপ গাছ পেয়ে যান তাঁরা পঁয়ত্রিশটি দেশের কাছ থেকে।

সেই আন্তর্জাতিক গোলাপ-বাগানের মাঝে আজ আমি দাঁড়িয়ে। আকাশ পরিষ্কার নীল—কোথাও মেঘের চিহ্ন নেই। এখানকার মানুষের মনও আজ নীল আকাশের মতই মুক্ত। বীভৎসতা, নির্দয়তা, রক্ত-লোলুপতা বিদায় নিয়েছে। লিডিৎসের গোলাপ-বাগানের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাবতে ইচ্ছে করে মানুষে-মানুষে জাতিতে-জাতিতে হানাহানি, হিংসা দ্বেষ চিরদিনের মত শেষ হয়ে যাক।

গোলাপ-বাগান থেকে বেরিয়ে গ্রাম ঘুরে বক্তৃতা মঞ্চের দিকে পা বাড়ালুম। বক্তৃতাদি তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সঙ্গীরা কেউ ঘাসের উপর বসে, কেউ ঠায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনছেন। হেলেনাকেও দেখলুম সেখানে। আমি পৌঁছবার কিছু পরেই সভা ভঙ্গ হল।

হেলেনা বললেন—চলুন আপনাকে গোলাপ বাগান আর গ্রাম দেখিয়ে আনি।

আমি বললুম—আমি ইতিমধ্যেই দেখে ফেলেছি সব। তার চেয়ে চলুন বরং গিয়ে আমাদের বাস্-এর ছায়ায় একটু বসা যাক। সঙ্গীরা তো সকলেই এখন অন্যান্য গাইডের সঙ্গে গ্রাম দেখতে বেরবেন। ওঁরা ফিরে আসা পর্য্যন্ত আপনি বরং আমায় লিডিৎসের গল্প বলুন। বলুন, কেন লিডিৎসের উপর এই কঠোর শাস্তি বর্ষিত হয়েছিল ?

বাস্-এর মধ্যে ঢুকে দুটি ঠাণ্ডা জলের বোতল 'মালিনোভা' আর গেলাস বার করে নিয়ে এলেন হেলেনা। ঘাসের উপর বসে এক গ্লাস মালিনোভা শ্চাভা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে হেলেনা বললেন—লিডিৎসের হত্যা কাণ্ড সম্বন্ধে আপনি কতটা জানেন বলুন ?

আমি বললুম—সামান্যই জানি। যুদ্ধের সময় অধিকৃত বোহিমিয়া ও মোরাভিয়ার জার্মান গভর্ণর হাইড্রিখ্‌কে চেক স্বদেশভক্তরা বোমা ছুঁড়ে মেরে ফেলে। সেই রাগে হিটলার বহু চেক্ অধিবাসীর প্রাণদণ্ড দিয়ে প্রতিশোধ নেয়—তার মধ্যে লিডিৎসেও পড়েছিল। এই জানি।

—মোদ্দা কথাটা জানেন। তবে এটা কি জানেন যে লিডিৎসে গ্রামের কেউ যে আততায়ীদের সঙ্গে কোনো সূত্রে জড়িয়ে ছিল তার প্রমাণ আজ অবধি হয়নি ?

—জানিনা।

শুধু সন্দেহের বসে হাজার হাজার লোককে সে সময় হত্যা করা হয়েছিল। আর কি ধরণের সন্দেহ ? শুধু যদি মনে হয় হাইড্রিখের মৃত্যুতে কেউ সামান্যতম খুসী হয়েছে অথবা দুঃখিত হয়নি—সেটাই দোষ—সেই দোষেই মৃত্যুদণ্ড !

ঘটনাটা ঘটেছিল লিডিৎসে হত্যাকাণ্ডের কয়েকদিন আগে—মে মাসের শেষের দিকে, রৌদ্র-প্লাবিত এক সকালে প্রাহার রাস্তায়। 'লিবেন্' পল্লীর ঘড়িতে তখন ঠিক ন-টা বাজছে। প্রাহার ৩নং ট্রাম এইখান দিয়ে চলে। ট্রামের লাইনটা পাহাড়ে-মত জায়গায় উঠে

হঠাৎ বাঁক নিয়েছে একটা। ট্রাম-পথের সবচেয়ে কঠিন অংশ হচ্ছে এই বাঁকটি। ঘন্ ঘন্ শব্দ করতে করতে ৩নং ট্রাম এইখান দিয়ে হেলে দুলে ওঠে—মনে হয় যেন কত কষ্ট করে চলতে হচ্ছে! সেদিন সকালে ঠিক ন-টার সময় তিন জন অতি সাধারণ চেহারা অতি সাধারণ পোষাক-পরা লোক সেই বাঁকের কাছে এসে হাজির হল। যেন রাস্তার ছোকরা। দু-জন বাঁকের এক মাথায়, অন্য জন বাঁকের অন্য মুখে। প্রাহায় সেদিন কেউ তাদের চিনতে পারেনি। পরে জানা গিয়েছিল তাদের নাম কুবিশ্, গাব্চিক্, ভাল্চিক্। আকাশ থেকে এসে নেমেছে তারা নেহ্ভিজ্দি গ্রামে। আর, এ, এফ, প্লেন প্যারাচুটে করে নামিয়ে দিয়ে গেছে তাদের নেহ্ভিজ্দি গ্রামের মাঠে।

কুবিশ্ আর গাব্চিক্ সাইকেলে চড়ে এসে হাজির হল ট্রাম রাস্তার বাঁকে। সাইকেল থেকে নেমে কুবিশ্ সাইকেলের হাতল থেকে সাবধানে একটা চামড়ার পোর্টফোলিও তুলে নিলে। পোর্ট-ফোলিওর মধ্যে ছিল দুটি ছোট ছোট সাংঘাতিক বোমা। সাঁজোয়া গাড়ি পর্য্যন্ত এই বোমা ছুঁড়ে খতম করা যায়।

একটু তফাতে গাব্চিক্ তার সাইকেলটা তারের বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে রাখল। মেয়েদের সাইকেল এটা। সেইদিনই সকালে ভাল্ডেৎস্কা রাস্তার খোদ্ল্ পরিবারের মাটির তলার ঘর থেকে ধার করে আনা। তার হাতেও একটা পোর্টফোলিও শ্রী স্বাটশ-এর কাছ থেকে ধার করা। পোর্টফোলিওটি একটি বর্ষাতির আড়ালে ঢাকা। বর্ষাতিটি ধার করা হয়েছে ভিসোচানি পল্লীর শ্রী হফ্মানের কাছ থেকে। পোর্টফোলিওর মধ্যে একটি ছোট্ট ষ্টেন গান। তিন টুকরো করে ফেলা যায়। দক্ষ হস্তে আবার চট্ করে জুড়ে লাগানো যায়। সাংঘাতিক অস্ত্র। গাব্চিক্ বেচারা সাইকেল থেকে নেমে পোর্টফোলিওর মধ্যে দু-হাত লুকিয়ে অস্ত্রটাকে যখন জুড়ছিল তখন হয়েছিল সামান্য একটু গাফিলতি। গুলি ভরেছিল বটে, কিন্তু ঠিক

যেমন ভরা উচিত তেমন করে ভরেনি। তখনকার উত্তেজনায় মাথায়ই আসেনি সে কথা।

বাঁকের অন্য মুখে, এক-শ গজ তফাতে আরও একটি সাইকেল চড়ে যে হাজির হল তার নাম ভাল্‌চিক্‌। ভাল্‌চিক্‌-এর পকেটে ছোট্ট একটি আয়না। অন্য পকেটে একটি অটোম্যাটিক পিস্তলও আছে ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে ছোট্ট আয়নাটিই আসল অস্ত্র।

রাস্তা প্রায় খালি। অনেকক্ষণ পরে ৩নং ট্রাম একটা ঘন্‌ ঘন্‌ শব্দ করতে করতে চলে গেল ত্রয়া ব্রীজের দিকে। পৌনে দশটা বাজে। সময় হয়ে এল। এরা তিনজন বেশ কয়েকদিন ধরে ঘড়ি ধরে দেখে গেছে গাড়িটা ঠিক কোন সময় যায়। জার্মান অফিসাররা কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন ঘড়ির কাঁটা ধরে। এক চুল এদিক ওদিক হয়না। কিন্তু আজ হল কি? লক্ষ্য এসে পৌঁছয়না কেন? কিসে দেরী হচ্ছে? তিন জনে তিন জায়গায় অধৈর্য হয়ে দাঁড়িয়ে— দু জন কাছাকাছি আর একজন একশ গজ দূরে।

প্রাহা থেকে কিছু দূরে পানেনস্কে ব্রেজানি প্রাসাদ দখল করে হাইড্রিখ বাস করতেন। প্রতিদিন তিনি তাঁর আট সিলিণ্ডার মার্সেডিস্‌ বেন্‌স্‌ গাড়ি করে লিবেন্‌ পল্লী হয়ে প্রাহার রাজপ্রাসাদে আসতেন। প্রাহার রাজপ্রাসাদ দখল করে জার্মানরা তাকে তাদের সরকারি আপিসে পরিণত করেছে। পানেনস্কে ব্রেজানি প্রাসাদে হাইড্রিখ-পত্নী সুখে আছেন। যখন খুশী যতজন খুশী ইহুদি বন্দীদের তলব করেন আর ক্রীতদাসদের মত খাটান। সারা দেশ ভরা যত ইহুদি, সব তখন কন্‌সেন্‌ট্রেশান ক্যাম্পে। স্বামীকে একবার বললেই হল, জন খাটাবার জন্যে যত ইহুদি চাই ধরে এনে দেবেন। হাইড্রিখ-পত্নী মনের আনন্দে বাগান করছেন, পার্ক করাচ্ছেন, সুইমিং পুল করাচ্ছেন, টেনিস কোর্ট করাচ্ছেন। ইহুদি বেচারাদের নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই।

সেদিন হাইড্রিখের বার্লিন থেকে তলব এসেছে। কাগজ-পত্র

নিয়ে তাঁকে বার্লিন যেতে হবে। কিন্তু তার আগে অল্প কিছুক্ষণের জন্যে প্রাহার রাজপ্রাসাদেও যাওয়া দরকার। বেরতে দেরী হচ্ছে একটু। পানেন্‌স্কে ব্রেজানি প্রাসাদের ফটকে গাড়ি তৈরী। প্রাসাদের ঘড়িতে দশটা বাজতে দশ মিনিট। আজকে ড্রাইভারের সীটে তাঁর খাস্ ড্রাইভার নেই, আছে একজন শরীর রক্ষী, ক্লাইন তার নাম, সে-ই গাড়ি চালাবে। খাস ড্রাইভারকে বলেছেন অন্য গাড়ি করে তাঁর মাল-পত্র নিয়ে সোজা এয়ারোড্রোমে যেতে। বেলা বারোটায় প্লেন ছাড়বে।

পত্নী-পুত্র-কন্যাদের কাছে বিদায় নেবার সময় হল। এদের হাইড্রিখ বড় ভালোবাসেন। যে যা চায় তাই এনে দেন। স্ত্রী ডজন ডজন ইহুদী গোলাম চান—পান। মেয়ে রেসের ঘোড়া চেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বোহিমিয়ার বিখ্যাত ক্লাড্‌রুবি ঘোড়ার 'ষ্টাড্' থেকে ঘোড়া চলে এল। ছেলে দুটির মাথায় ঢুকল তারা সত্যিকারের রাজমুকুট নিয়ে খেলবে। বাবাকে বলতেই তিনি প্রাহার রাজ প্রাসাদের রাজভাণ্ডার খুলে হীরে-মানিক গাঁথা ঐতিহাসিক রাজ-মুকুট এনে দিলেন ছেলেদের খেলতে। নিজেও সেই মুকুট একবার মাথায় পরে নিয়ে দেখালেন চেহারাটা। চেক্ দেশে বহু পুরোনো এক অন্ধ বিশ্বাস আছে যে রাজা-ব্যতীত অন্য যে-কেউ বোহিমিয়ার রাজ-মুকুট মাথায় দেবে তার প্রাণ-হানি হবে। হাইড্রিখের অবশ্য সে অন্ধ-বিশ্বাস ছিলনা। তিনি নির্ভয়ে মাথায় মুকুট দিলেন। তিন সন্তানের ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন, চতুর্থ তখনও জন্মায় নি। হাইড্রিখ পত্নী আসন্ন-প্রসবা। চতুর্থ সন্তানের কোনো ইচ্ছা পূরণ করবার সুযোগ হাইড্রিখ আর পেলেন না। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মার্সেডিস্-বেন্‌স্ গাড়িতে উঠলেন। সে-ই তাঁর শেষ বিদায়।

প্রতিদিন হাইড্রিখের গাড়ির সামনে এবং পিছনে দুটি এস্‌কর্ট গাড়ি যায়। সেদিনই হাইড্রিখ বলেছিলেন—দরকার নেই। এমনিতেই

বেরতে দেরী হয়ে গিয়েছিল, এস্‌কর্ট গাড়ি নিতে গেলে আরও দেরী হত।

আশী কিলোমিটার বেগে গাড়ি ছুটেছে। জ্‌ডিবি গ্রাম, খাবরি গ্রাম পার হয়ে, প্রাহার উপকণ্ঠ কবিলিসি পার হয়ে লিবেন্‌ পল্লীতে পৌঁছল।

মে মাস। গাছের মাথায় পাখীর দল বসে সমস্বরে গান করছে। দু-জন লোক রাস্তার ধারে ইলেকট্রিক পোষ্টের গায়ে তখনও দাঁড়িয়ে। এক ঘণ্টার উপর দাঁড়িয়ে আছে এরা, মাঝে মাঝে চলা ফেরা করছে। এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে সন্দেহ হবার কথা। একজন হাতে একটা পোর্টফোলিও নিয়ে, অন্যজন বাহুর উপর বর্ষাতি ঝুলিয়ে এক ঘণ্টা ধরে করছে কি? তা ছাড়া সাইকেল দুটোই বা ওখানে অমন ভাবে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন? হাইড্রিখের এই পথ দিয়ে জার্মান সেপাই আর পুলিস সব সময় আনাগোনা করে, পাহারা দেয়। আশ্চর্যের বিষয় সেদিন কেউ এদের লক্ষ্য করেনি।

কুবিশ আর গাব্‌চিক্‌ আর পারে না। তৃতীয় বন্ধুর দিকে সমানে এক-দৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে তাদের চোখ ধরে গেছে। তৃতীয় বন্ধু ভাল্‌চিক্‌ একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে চলেছে। সে বেচারাও আর পারে না। কখন আসবে সেই চরম মুহূর্ত?

তারপর হঠাৎ—

হঠাৎ ভাল্‌চিক্‌ দেখতে পেল দিগন্তে সেই পরিচিত মার্সেডিস্‌ বেন্‌স্‌ উদিত হয়েছে। না, ভুল নেই। কিন্তু এস্‌কর্ট গাড়ি দুটো কোথায়? ঘড়ির কাঁটার মত যে প্ল্যান তাতে করে সামনের এস্‌কর্টের উপর হবে প্রথম আক্রমণ। তারপর একের পর এক অন্যান্য নাট্যাঙ্ক। প্ল্যান বদলালে পরে কোনটা আগে কোনটা পরে? কিন্তু এখন আর ঐ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। বন্ধুদের ইশারা দিতে হবে। ভাল্‌চিক্‌ পকেট থেকে চিরুনী বার করে তার চুল আঁচড়াতে লাগল। চিরুনীর সঙ্গে ছিল আয়না।

প্রতিফলিত আলোর গতি শব্দের চেয়েও দ্রুত। দু-জোড়া চোখের উপর এসে পড়ল দুটি ঝিলিক। তৈরী হয়ে দাঁড়াল তারা।

এইবার প্ল্যান-মাফিক কাজ করতে হবে। কুবিশের প্রথম বোমা গিয়ে পড়বে সামনের এস্‌কর্ট গাড়ির উপর। গাব্‌চিক্ ষ্টেন গান নিয়ে গুলি ছুঁড়তে থাকবে মার্সেডিস্ বেন্‌স্‌এর যাত্রীর উপর। কুবিশ তার দ্বিতীয় বোমা ছুঁড়বে পিছনের এস্‌কর্ট গাড়ির উপর। ইতিমধ্যে আয়নাটি পকেটে পুরে অন্য পকেট থেকে অটোম্যাটিক পিস্তল বার করে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসবে ভাল্‌চিক্। সেই সুযোগে সাইকেল চড়ে সরে পড়বে কুবিশ আর গাব্‌চিক্ এবং সব শেষে ভাল্‌চিক্।

কিন্তু দেখা গেল আসছে শুধু একটি গাড়ি। সেই মুহূর্তে তাদের প্ল্যান বদলে ফেলতে হল। কুবিশ গাব্‌চিক্‌কে চেঁচিয়ে বলল— যাও ভাই তোমার কাজ কর। আমি পিছনে আছি।

গাব্‌চিক্ তৈরী হয়ে দাঁড়াল। দেখতে দেখতে এগিয়ে এল আট সিলিণ্ডারের গাড়ি। সাদা রংয়ের নম্বর প্লেট চোখে পড়ে। গাড়ির নম্বর তিন। হিটলারের গাড়ির নম্বর এক। হিম্‌লারের দুই। হাইড্রিখের তিন। নাৎসিদলে হাইড্রিখ ছিলেন নাম্বার থ্রী!

ঠিক সেই সময় তিন নম্বর ট্রামও একখানা এসে পড়ল। খোলা মাথা, খয়েরি সুট্ পরা গাব্‌চিক্ ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। মনে হল যেন সে ছুটন্ত ট্রামটা ধরবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে। ব্রেক কষার একটা কর্কশ আওয়াজ। রাস্তার মাঝে লোক দেখে ক্লাইন ব্রেক কষেছে। মুখে তার অকথ্য গালাগালি—শূয়োরের বাচ্ছা! চোখের মাথা খেয়েছিস্!

এক সেকেণ্ডের এক ভগ্নাংশ সময়। ছোকরা তার বর্ষাতি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ষ্টেন গান বার করেছে। স্কটল্যাণ্ডের ট্রেনিং ক্যাম্পে মহড়া দিয়ে এসেছে অনেকবার। তাক করেছে ঠিক ড্রাইভারের পাশে বসা যাত্রীর উপর। গাব্‌চিক্ বন্দুকের ঘোড়া টিপলো বটে, বার

বার টিপলো কিন্তু গুলি বেরল না। ভুল মত গুলি ভরার ফলে আটকে গেছে। মহড়ার সময়েও ঐ একই দোষ কয়েকবার হয়েছিল।

হাইড্রিখের খাস ড্রাইভারের বদলে আজ গাড়ি চালাচ্ছে হাইড্রিখের শরীর রক্ষী ক্লাইন। খাস ড্রাইভার থাকলে বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির গতিকে বিদ্যুৎ বেগে বাড়িয়ে আততায়ীকে চাপা দিয়ে গাড়ি নিয়ে সে ছুটে পালিয়ে যেত। বাঁকের মুখে বেশী জোরে গাড়ি ছোটানোয় বিপদ আছে—তা হলেও বোধহয় সে তাই-ই করত। কিন্তু ক্লাইন তা করল না। সে হল হাইড্রিখের শরীর রক্ষী। সে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে তার পিস্তল টেনে বার করল আততায়ীকে চরম শিক্ষা দেবার জন্যে।

তখনও পিছনে লুকিয়ে আছে কুবিশ—অভিজ্ঞ যোদ্ধা।

তিন নম্বর ট্রাম যেমন চলছিল চলল, কেউ কিছু লক্ষ্য করেনি। ট্রাম-ড্রাইভার তার সামনে একটা পুরোনো ঘড়ি দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে ট্রাম চালিয়ে নিয়ে চলেছে। ঘড়ির কাঁটা দেখাচ্ছে দশটা বেজে একত্রিশ মিনিট। একজন যাত্রী মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন।

এক কান ফাটানো শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ট্রাম যাত্রীর হাত থেকে খবরের কাগজ উড়ে বেরিয়ে গেল। ড্রাইভারের ঘড়িটা গেল পড়ে। ভাঙা শার্সির কাঁচে ভরে গেল ট্রামের সীট। সবুজ রংয়ের মার্সেডিস গাড়িটা একদিকে কাত হয়ে পড়েছে। পিছন দিকের দরজাটা উড়ে গেছে। একটা টায়ার ফাটা। কুবিশ বোমা ছুঁড়েছে।

গাব্‌চিক্ তখন তার ষ্টেন গান ফেলে দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে, তার পিছনে ড্রাইভার ক্লাইন। ক্লাইনের চোট লাগেনি। ক্লাইন তার রিভলবার বার করতেই গাব্‌চিকও তার পকেট থেকে অটোম্যাটিক বার করেছে। তারপর শুরু হল পিস্তল যুদ্ধ। দেয়াল থেকে দেয়ালের পিছনে, গাছ থেকে গাছের আড়ালে। ক্লাইনের দেহ

ছুটি গুলিতে বিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে রইল। গাব্‌চিক্ দৌড় দিল ত্রয়া ব্রীজ পর্যন্ত। সেখানে পৌঁছেই সে হয়ে গেল আগেরই মতো অজানা নগণ্য রাস্তার ছোকরা। তারপর কোথায় মিলিয়ে গেল, আর তাকে দেখা গেল না।

কুবিশের নিজের বোমাতেই খানিকটা চোট লেগেছিল। সে-ও পালাচ্ছে তখন। পিছন ফিরে দেখল তাকে তাড়া করেছে হাইড্রিখ স্বয়ং। কিন্তু হাইড্রিখের মুখ তখন রক্তশূন্য, মুখের প্রত্যেক রেখায় বেদনার চিহ্ন। হাইড্রিখ বোমার ঘায়ে আহত। ভারি বন্দুক তুলে মারবার তার আর ক্ষমতা নেই।

কুবিশ দৌড়ে গেল তার সাইকেলের কাছে। ভাঙা ট্রাম থেকে লোকজন নামতে আরম্ভ করেছে তখন। কুবিশ সাইকেলে চড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই সঙ্গে ভাল্‌চিক্‌ও কোথায় মিলিয়ে গেল কেউ জানে না। পড়ে রইল শুধু গাব্‌চিকের মহিলা-সাইকেল, তার বর্ষাতি আর পোর্টফোলিওটা। আর পড়ে রইলো অর্দ্ধমৃত অবস্থায় হাইড্রিখ।

শব্দ পেয়ে তখন একজন চেক্ পুলিশ দৌড়ে এসেছে। সে-ই হলান কোম্পানির চলন্ত একখানা ভ্যানকে থামিয়ে নাৎসি পার্টির তৃতীয় ব্যক্তিকে উঠিয়ে নিকটস্থ 'বুলোভ্‌কা' হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলে।

হাইড্রিখ বাঁচেনি। যন্ত্রণার মধ্যে মৃত্যু হল কয়েকদিন পরে। হিটলার গেল ক্ষেপে।

হিটলারের গুপ্ত পুলিশ অনেক চেষ্টা করল এ-দেশে কারা-কারা এই চক্রান্তের মধ্যে জড়িত তাদের খুঁজে বার করতে। কিন্তু পারল না। যে-সব চেক্ স্বদেশ-ভক্ত হিটলারের আগমনে দেশ ছেড়ে ইংলণ্ডে পালিয়েছিলেন তাঁরাই ইংরেজদের সঙ্গে এক-জোট হয়ে এই পরিকল্পনাটি নিখুঁৎ ভাবে করেছিলেন ১৯৪১ সালের ডিসেম্বার মাস। ছ-মাস পরে তা প্রতিপূরিত হল। পরিকল্পনায় এ দেশের

অনেকেই সাহায্য করেছিলেন কিন্তু নাৎসিরা সন্দেহবশে শুধু একে-ওকে উৎপীড়ন করেছিল, আসল লোকদের বার করতে পারেনি। ক্রোধে অন্ধ হয়ে হিটলার তাই হত্যা-তাণ্ডব সুরু করলো। লিডিৎসে হল তার সবচেয়ে করুণ সবচেয়ে নিষ্ঠুর সবচেয়ে পাশবিক বলি।

হেলেনার চোখ দিয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

বন্ধুরা একে একে ফিরতে আরম্ভ করেছেন। বাস্‌এর সীট একটি একটি করে ভরে আসছে। মাঠ লোকে লোকারণ্য। কিসের টানে এত লোক এখানে এসেছে? লিডিৎসে গ্রামে যে দুর্ভাগা খনিমজুররা ছিল তাদের আমরা কেউ চিনতুম না জানতুমও না। এই রকম শত সহস্র গ্রাম শত সহস্র শহরের দুর্ভাগা মানুষের উপর বর্বর অত্যাচার হয়েছে, তারাও আমাদের কেউ আত্মীয় নয়, পরিচিত নয়। তাদেরই টানে আমরা এখানে এসেছি। মানুষের উপর মানুষের নির্দয়তা আমরা অনুমোদন করিনি। মানব-ইতিহাসের এক নিষ্করুণ মুহূর্তে যে হিংসা-স্রোত ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল তার বিরুদ্ধে যে আমরা রুখে দাঁড়িয়েছিলুম সেই কথা বার বার স্মরণ করতে আমরা লিডিৎসে গ্রামে এসে সমবেত হই। মনে মনে ভাবি, টুঁটি টিপে মেরে ফেলা লিডিৎসে গ্রামও যেমন বেঁচে উঠেছে, হেসে উঠেছে, তেমনি সমস্ত মানব সমাজও বাঁচছে হাসছে গান গাইছে, এর মার নেই।

বাস্ ষ্টার্ট নিয়েছে। আমরা সীটে গিয়ে বসলুম। জুন মধ্যাহ্নে চমৎকার উষ্ণ বাতাস বইছে। বাসের কাঁচের জানলাগুলো সম্পূর্ণ মুক্ত করে আমরা চলেছি। রাস্তার ধারের লাগানো মাইক্এ গান আসছে—লিডিৎসে সঙ্গীত। চোখ বুজে গান শুনছি আর সুরের সঙ্গে ভেসে আসছে দশ হাজার গোলাপে ভরা গোলাপ-বাগানের ছবি। তারই মধ্যে গোলাপেরই মত সুন্দর নতুন লিডিৎসের নতুন শিশুরা খেলে বেড়াচ্ছে।

॥ ২৭ ॥

মিতুর স্কুলের ছুটি হতেই আমরা তল্পি-তল্পা বেঁধে ফেললুম। আর অপেক্ষা করা যায় না। গ্রীষ্ম এসে গেছে। চরণিক হবার দিন আসন্ন। এইবার ঘর-ছাড়া হয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। দুটো রুকস্যাক কিনলুম। দুটো ধার করলুম। তারপর সংসারের সমস্ত জিনিস বাক্সবন্দী করে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ক'টি দ্রব্য সযত্নে ভরে ফেললুম রুকস্যাকে। একেবারে হাল্কা। চারজনের পিঠে চারখানি পিঠঝুলি। এই আমাদের সম্বল। দুনিয়া টহল দেবার ন্যূনতম রসদ।

এর আগেও চেকোস্লোভেকিয়ায় চরণিক হয়ে হেঁটেছি। নর-ওয়েতেও হেঁটেছি রুকস্যাক পিঠে নিয়ে। কিন্তু এবারে এক নতুন সমস্যার সামনে এসে দাঁড়াতে হল। সেবারে হাঁটা শুরু করবার আগেই চেক ভ্রমণ সমিতির সভ্য হয়েছিলুম চাঁদা দিয়ে। তাতে করে সারা দেশের পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ সমিতির যে সব যাত্রীকুটির আছে তাতে রাত্রিবাসের সুবিধে পেয়েছিলুম। কিন্তু সে অনেক কালের কথা। এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। চেক ভ্রমণ সমিতি আর নেই। বিপ্লবের পর থেকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে ভ্রমণকারীর সংখ্যা এত বেড়েছে যে এরা আর কুলিয়ে উঠতে পারছে না। তখনকার দিনে চরণিক হত কারা? মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ আর ছাত্রছাত্রীরা। আর এখন মেহনতি মানুষদের অবস্থার উন্নতি হওয়ায় তারা তাদের গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। তারাও দেশ দেখতে চায়, জীবনের রস পেতে চায়। আগেকার দিনের সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগঠনের পক্ষে এই অপার জনসাধারণের দেশ ভ্রমণের

ক্ষুধা মেটানো অসম্ভব। দেশজোড়া তাদের যে ক'টি ভ্রমণ কুটির ছিল তাতে করে এই নব-উদ্বুদ্ধ ভ্রমণকারীদের একশ ভাগের এক ভাগও বোধ করি ধরবে না। চেক ভ্রমণ সমিতি তাই উঠে গেছে। তার বদলে হয়েছে বিভিন্ন কারখানা, আপিস এবং সংগঠনের নিজেদের নিজেদের আবাস—পাহাড়ের গায়ে, বনের ধারে, হ্রদের তীরে, যেখানেই প্রকৃতি সুন্দর সেইখানেই। ভ্রমণ সমিতির যে সব কুটির আগে ছিল সেগুলি নানা সংগঠনের হাতে চলে গেছে। এর উপর হয়েছে ছোট ছোট হোটেল। কিন্তু এত হওয়া সত্ত্বেও জায়গার অভাব ঘোচে নি। বহু দিন বহু মাস আগে থেকে বন্দোবস্ত করে না রাখলে গ্রীষ্মের সময় কোথাও থাকবার জায়গা পাওয়া যায় না। ভ্রমণের শখ এদের ক্রমেই বাড়ছে। যারা কোনোদিন ভ্রমণ করত না তারা ভ্রমণের রস পেয়েছে। বছরের পর বছর যাত্রীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে তাই।

কিন্তু তাই বলে আমরা পিছিয়ে গেলুম না। অনির্দেশ যাত্রা করব বলে আমরা মন স্থির করেছিলুম। এই সব অসুবিধের কথা জানবার পরেও মত বদলালুম না। অবশ্য কোনো একটা সংগঠনকে ধরে তাদের কোনো যাত্রী-আবাসে উঠে আরামে হপ্তা তিনেক কাটিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু তাতে আমাদের মন ভরত না। আমরা চাইছিলুম রুকস্যাক পিঠে নিয়ে কেবল এগিয়ে চলব—এক কুটির থেকে আরেক কুটিরে, পর্বত শৃঙ্গ থেকে উপত্যকায়, বন থেকে বনান্তরে, দিনের পর দিন। আমাদের স্থির বিশ্বাস ছিল এটা সম্ভব করব আমরা। কষ্ট হতে পারে, কিন্তু গাছতলায় রাত্রিবাস কিংবা রাতের ট্রেন ধরে শহরে ফিরে আসা এ আমাদের করতে হবে না। চেকোস্লোভেকিয়ায় এসে বিদেশীরা অথই জলে পড়বে, এ চেকরা হতেই দেবে না।

কাজেই আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

ত্রেঞ্চানস্কে তেপ্লিৎসে। স্লোভেকিয়ার একটি স্বাস্থ্য আবাস। স্বাস্থ্যকর অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ এখানে আছে। পাহাড় ঘেরা সুন্দর জায়গা। অনেক লোক আসে এখানে স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায়। প্রাহা থেকে সোজা চলে এলুম আমরা এইখানে। এখান থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু হবে। এখানে আসার উদ্দেশ্য আমাদের লুপ্ত স্বাস্থ্যোদ্ধার নয়। এখানে এসেছি আমরা লামির কথায়। সারা বছর ধরে লামি প্রাহার কলেজে ভূতত্ত্ব পড়ছিল। ও-ই খোঁজ দিল ত্রেঞ্চানস্কে তেপ্লিৎসের আশে পাশে অনেক রহস্যময় গুহা আছে, যার কথা শুধু স্থানীয় লোকেরাই জানে।

—কি রকম গুহা লামি? কি আছে তার মধ্যে?

—ভাল করে আবিষ্কারই হয়নি গুহাগুলো তা ভিতরে কি আছে লোকে জানবে কি করে? কিছু কিছু স্ট্যালাক্টাইট স্টালেগ্মাইট থাকবার কথা, কোনো কোনো গুহার মধ্যে হয়তো জমা বরফ, কোনো কোনো গুহায় আদিম মানুষের হাঁড়িকুঁড়ি অথবা জন্তুর কঙ্কাল। যেদিন বিজলীর লাইন পেতে গুহার কাদা পরিষ্কার করে পাঁচজনের দেখবার মতো করে দেবে সেদিন টুরিস্ট গুহা হয়ে যাবে ওগুলো। তার আগেই তো মজা।

—মজা মানে? বিপদ নেই? অজানা গুহার মধ্যে অন্ধকারে পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙলেই হয়েছে আর কি!

কিন্তু ওতে লামি বা মিতু ভড়কাবার পাত্র নয়। ওরা অ্যাডভেঞ্চার চায়।

সুতরাং ত্রেঞ্চানস্কে তেপ্লিৎসেতে পৌঁছে আমরা খুঁজতে শুরু করলুম সেখানে কে আছেন যিনি গুহার সন্ধান বলতে পারেন।

এসব ব্যাপারে গৃহিণী চৌকস। তিনি বললেন—তোমরা বোসো, আমি ঠিক লোক খুঁজে বার করে নিয়ে আসছি। বলে হোটেলে আমাদের রেখে দুপুর বেলা বেরিয়ে গেলেন সেই ছোট্ট শহরে লোক খুঁজতে। সন্ধ্যের আগেই ফিরে এসে বললেন—আসল লোকের

খোঁজ পেয়েছি। অনেক গুহা তিনি আবিষ্কার করেছেন। এখনও খুব কম লোকেই সে সব গুহার কথা জানে। ইস্কুল মাস্টার ইনি। কাল তোমাদের নিয়ে যাবেন। বলে একরাশ লাল টুকটুকে রসালো চেরীর ঠোঙা এগিয়ে দিয়ে বললেন—খাও।

কি করে যে মাস্টার মশায়কে খুঁজে বার করলেন তা আর বললেন না।

আমরা বললুম—তুমি যাবে না কাল ?

—আমি কাল একটু জিরোবো।

পরদিন ভোরবেলা উঠে পাঁউরুটি-কেটে স্যাণ্ডুইচ তৈরি করে ফ্লাস্কে জল ভরে একখানা রুকস্যাক গুছিয়ে ফেললুম। এইটেই তিন জনে পালা করে পিঠে নেব।

ইস্কুল মাস্টার স্পাচেক সায়েব এখানকার পুরোনো লোক। পাহাড়ে বনে ঘুরতে ভালবাসেন। এ অঞ্চলের প্রতিটি পাথরের খবর তাঁর জানা। মাটির নীচেকার গুহা আবিষ্কার করেছেন অনেক। গুহার উৎপত্তি, অবস্থিতি এবং প্রবেশ পদ্ধতি বিষয়ে এঁর জ্ঞান অপরিমিত। তা ছাড়া গল্প করতে ভালবাসেন দারুণ। এমন একজন মানুষকে সঙ্গী পাবো জেনে আমরা খুশীও হলুম যেমন, নিশ্চিন্ত হলুমও তেমনি।

বাস্ স্টপের কাছে গিয়ে দেখি স্পাচেক সায়েব তাঁর ছেলে ঈভানকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বাস এসে পড়তেই আমরা উঠে পড়লুম। তেপ্‌লা নদীর ধার দিয়ে আঁকা বাঁকা বাসের রাস্তা। দু-পাশে তার গ্রাম। গ্রামের পিছনে ঢেউ-খেলানো পাহাড়। আধ ঘণ্টার উপর এই পথ ধরে চলে আমরা 'অম্‌শেনিয়ে' গ্রামে এসে পৌঁছলুম। বাস থেকে নেমে সামনেই যে বাড়িটা সেটাই স্পাচেক সায়েবের স্কুল। অম্‌শেনিয়ে গ্রামের এই স্কুলে তিনি পড়ান। এখন গ্রীষ্মের ছুটি চলেছে। দরজা জানালা সব বন্ধ। তবু দেখা গেল বন্ধ ফটক খুলে কে একজন বেরিয়ে আসছেন।

স্পাচেক সায়েব বললেন—দেখেছেন কাণ্ড! আমাদের হেড মাস্টার। ছুটি ভালবাসেন না—কেবল কাজ। ল্যাবরেটারি গোছ-গাছ করছিলেন বোধ হয়। চলুন, আলাপ করিয়ে দি।

আমরা অবাক হয়ে বললুম—ইনি হেড মাস্টার?

স্পাচেক সায়েবকে বুড়ো বললেই হয়। আর ফটক দিয়ে যিনি বেরিয়ে আসছেন তাঁর বয়েস আর কত হবে—ত্রিশের অনেক নীচে।

স্পাচেক সায়েব বললেন—বয়েস দেখে অবাক হচ্ছেন? ও সব আগে ছিল। উচ্চতন আর নিম্নতন কর্মচারী নিয়োগ করা হত বয়েস মেপে। এখন শুধু দক্ষতা। এঁর মতো দক্ষ হেড মাস্টার এ তল্লাটে নেই। দু বছরের মধ্যে স্কুলটাকে যা দাঁড় করিয়েছেন—দেখবার মতো। এই যে নমস্কার হেড মাস্টার মশাই। আসুন আমার ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

করমর্দন হল। হেড মাস্টার মশায় বললেন—কোথায় চললেন এই জংলা দেশে এঁদের নিয়ে?

—গুহার শখ। ভারত থেকে এসেছেন গুহা দেখতে। এ আমার দুর্লভ সুযোগ।

হেড মাস্টার মশায় স্পাচেক সায়েবকে দেখিয়ে বললেন—এ কাজে এঁর মতো লোক আর পাবেন না। যান, গুহা দেখে আসুন। মনে রাখবেন আমাদের এই অঞ্চলকে।

আমরা একটা সুঁড়ি রাস্তা ধরে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করে দিলুম। একটু উঠেই বুঝলুম এঁরা যাকে একটু আগে জংলা দেশ বলেছিলেন তার মত অপূর্ব পর্বতাঞ্চল চেকোস্লোভেকিয়ায় অল্পই আছে। গরু চরাতে নিয়ে চলেছে গ্রামের লোকেরা। পাহাড়ের উপর নিশ্চয় মিষ্টি ঘাস আছে। রাখালদের সঙ্গে গল্প করতে করতে আমরা উপর দিকে উঠছি। মাথার উপরে নীল আকাশ। রোদের আলোয় উজ্জ্বল চারিদিক। ঘেসো ফুলের উপর প্রজাপতি নেচে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে গরুর গলার গম্ভীর ডাক। গরমে আর

চড়াই ভাঙার শ্রমে আমরা বিশেষ কথা কইতে পারছি না, কিন্তু ঈভান সমানে বকবক করে চলেছে রাখালদের সঙ্গে। ঈভানের পরনে সৈনিকের পোশাক। কুড়ি বছর বয়েস হলে এদের দেশের প্রত্যেক ছাত্রকে দু-বছরের জন্যে সামরিক ট্রেনিং নিতে হয়। ঈভানের এখন সেই অবস্থা। ক-দিনের ছুটি পেয়ে বাপ-মার কাছে এসেছে —আবার ফিরে যাবে। কিন্তু সামরিক পোশাক ছাড়তে মানা। সৈনিক সেজেই ঘুরে বেড়াতে হয়—ছুটির সময়েও নিষ্কৃতি নেই। পাহাড়ের কয়েকটা বাঁক পার হয়ে ঈভান একবার পিছন ফিরে দেখে নিল আর গ্রাম দেখা যাচ্ছে না। তখন সে সৈনিকের কোট খুলে পিঠে ঝুলিয়ে নিল। এইভাবে আমরা প্রায় তিন কিলোমিটার চড়াই ভাঙলুম। একটা মালভূমির উপর এসে পৌঁছলুম আমরা।

এর পর আর বিশেষ চড়াই নেই। বাঁ পাশে এক সারি পাহাড় ঘন বাদাম গাছের জঙ্গলে ভরা। এই পাহাড়ের সারির তলা দিয়ে দূর দিগন্তের দিকে চলে গেছে আমাদের পথ, সবুজ লম্বা লম্বা ঘাসে ভরা মাঠের উপর দিয়ে এঁকে বেঁকে। মাঝে মাঝে গমের আর ভুট্টার ক্ষেত। ছোট্ট একখানি গ্রাম পড়ল। পাহাড়ী গ্রাম। বড় জোর আট দশ ঘর বাড়ি।

স্পাচেক বললেন—জানেন, এই গ্রাম থেকেও ছেলেমেয়েরা রোজ স্কুলে যায়? আমাদের ঐ অম্‌শেনিয়ে গ্রামের স্কুলে!

আমি বললুম—সে কি? এতটা পাহাড়ে পথ যায়-আসে কি করে? হেঁটে?

—তা ছাড়া আবার কি? দেখলেন তো রাস্তা! বড় জোর গরুর গাড়ি চলতে পারে। তার চেয়ে হাঁটাই সুবিধে। তা ছাড়া শীতের সময় এ সব রাস্তার তো চিহ্নই থাকে না, তখন সব বরফে ঢেকে যায়। তখন শী পায়ে দিয়ে যায়-আসে ছেলেমেয়েরা।

স্পাচেক এক বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলেন—ভিয়েরা! ভিয়েরা!

একটি বছর দশেকের মেয়ে বেরিয়ে এল। মাস্টার মশায়কে দেখে মহা খুশী। দু হাত তার কুঁচো খড়ে ভর্তি—গরুর জাব মাখছিল। আমাদের দেখে অবাক।

মাস্টার মশায় বললেন—এঁরা সব ভারতবর্ষের লোক। অনেক দূর থেকে এসেছেন আমাদের দেশে। আচ্ছা বলতো ভিয়েরা, তোমাদের গ্রামের কাছে কোথায় যেন গত বছর একটা ধস দেখা দিয়েছিল, সেটা কোথায়? এঁদের দেখাতে চাই।

—চলুন নিয়ে যাই। বলে ভিয়েরা আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ফটকের বাইরে বেরিয়ে এল।

কয়েকটা গমের ক্ষেত পার হয়ে সেই ধসটা। প্রকাণ্ড একটা হাঁ হয়ে রয়েছে। গত বছর হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে গিয়েছিল হঠাৎ। গ্রামের কারো অবশ্য কোনো ক্ষতি হয় নি। কিন্তু এ গ্রামের কারো বাড়ির তলায় মাটি যদি এমনি হঠাৎ একদিন ফাঁক হয়ে যায় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

স্পাচেক সায়েব বললেন—এখানকার চুনা পাথর সব সময় মাটির তলায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে চলেছে। তাই চারিদিকে ধস আর গুহা। যেখান দিয়ে আমরা হাঁটছি এর অনেক নীচে যে ক্রিয়াকলাপ চলেছে তা কি আর আমরা জানি?

ভিয়েরাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমরা আবার এগিয়ে চললুম।

কিছু দূরে গিয়ে খোলা মাঠের মাঝে একটা ঢালু জমির গায়ে মস্ত এক গরুর খাটাল। প্রকাণ্ড জায়গাটা বেড়া দিয়ে ঘেরা—তার মধ্যে এক রাশ গরু। এরই পাশ দিয়ে এক প্রস্রবণ। মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে টলটলে জল। গরমে এবং হাঁটার শ্রমে এতক্ষণ আমরা আমাদের ফ্লাস্কের জল প্রায় শেষ করে এনেছিলুম। স্পাচেক সায়েব বললেন—এই প্রস্রবণ থেকে জল ভরে নাও সবাই। এমন জল আর পাবে না।

আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ফ্লাস্কে যেটুকু করে জল বাকি ছিল সবটা গলায় ঢেলে আবার ফ্লাস্ক ভরতে বসে গেলুম। মখমলের মত ঘাস বিছানো জায়গাটা। দেখলেই বসে পড়তে ইচ্ছে করে। আমার ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল। বললুম—আসুন, সবাই একটু বসা যাক।

ঈভান হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল—আরে আমার বর্ষাতিটা কোথায়? কোটের সঙ্গে ঝুলছিল পিঠে—পড়ে গেছে। দৌড়ে নিয়ে আসছি—আপনারা বসুন ততক্ষণ।

আমরা সেই মখমলের মত ঘাসের উপর আধশোওয়া অবস্থায় হাত-পা ছড়িয়ে দিলুম। ঈভান চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমাদের পিছনে বাদাম গাছে ঢাকা পাহাড়ের শ্রেণী। সামনের মালভূমি ধীরে ধীরে নীচু হতে হতে বহুদূর বিস্তৃত। তারই মাঝে কাছে দূরে কয়েকটি প্রস্তরময় টিলা। স্পাচেক সায়েব একটি টিলার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—জানেন, ঐটার পিছনে একটা ভারি মজার গুহা আছে?

আমরা বললুম—মজার কি রকম?

—ঐ গুহার মধ্যে শীতের সময় হাজারে হাজারে বাদুড় এসে বাসা নেয়। আমাদের স্কুলের একজন মাস্টার মশায় একবার গুনেছিলেন—আট হাজার! গুহার খোঁচা খোঁচা পাথরে নখ আটকিয়ে ডানার মধ্যে মাথা গুঁজে ঐ বাদুড় বাহিনী সারা শীত ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। তার পর গরম পড়লে গুহা খালি করে সব উড়ে পালিয়ে যায়—কত দূর দেশে যে যায় তা-ও জানি না। শীতের সময় এলে দেখিয়ে দিতুম আপনাদের। এখন খালি।

লাফাতে লাফাতে ঈভান এসে গেল। খুব বেশী দূর যেতে হয় নি—রাস্তার ধারেই পড়ে ছিল প্ল্যাস্টিকের হালকা বর্ষাতিটা। ভাগ্যিস গরুতে খেয়ে ফেলে নি।

উঠে পড়ে আবার আমরা চলতে শুরু করলুম। বন ভেঙে বেশ খানিকটা রাস্তা পার হয়ে হঠাৎ একটা ফাঁকা জায়গায় এসে হাজির

হলুম। প্রকাণ্ড একখানা স্টেজের মত। তিন দিক ঘন পাইন বৃক্ষ-রাজিতে ঘেরা আর চতুর্থদিক দিগ-দিগন্তব্যাপী ফাঁকা। ফাঁকা দিকটার সীমানায় এলেই দেখা যায় প্রায় লম্বভাবে নেমে গেছে পাথরের দেয়াল তিন-শ মিটারের মত। নীচে দেখা যায় ক্ষুদে ক্ষুদে রাস্তা, বাড়ি। কিছু দূরে একটা গ্রাম।

স্পাচেক সায়েব বললেন—ঐ গ্রামে ঈভান জন্মেছিল। তখন আমরা ঐখানে থাকতুম। স্কুলে যেতুম ঐ রাস্তা দিয়ে পাহাড়টাকে ঘুরে।

বুঝলুম আমরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি সেইখানেই মালভূমির শেষ। স্পাচেক সায়েব বললেন—আমাদের পায়ের নীচে যে খাড়া পাথরের দেয়াল দেখছেন ওরই মধ্যে আছে যে গুহা সেইখানেই আমরা যাবো। এখনও খুব কম লোকেই জানে এর কথা—দেখছেন তো লোকের যাতায়াত নেই এ দিকটায়। কত ষ্ট্রবেরী দেখতে পাচ্ছেন ঘাসের বনের মধ্যে—ঐ থেকেই বোঝা যায় লোক এদিকে আসে না। গুহার আবিষ্কর্তা হচ্ছে এই অধম।

—বলেন কি? আপনার জন্যে যে জয়-ধ্বনি করতে ইচ্ছে করছে।

—তার দরকার নেই। পথশ্রমে সবাই ক্লান্ত। থলি থেকে খাবার বার করে শুরু করুন খাওয়া। গুহার পথে নামতে গেলে গায়ের জোর লাগবে।

কাজেই আমরা স্যাণ্ডুইচ বার করলুম। স্পাচেক ও ঈভানও বার করলেন তাঁদের স্যাণ্ডুইচ। সবাই মিলে ভাগাভাগি করে বসে গেলুম খেতে। যে পাথরটার উপর আমি বসে ছিলুম তার নীচে ছিল বড় বড় একদল কালো পিঁপড়ের বাসা। আমার হাত থেকে রুটির গুঁড়ো মাটিতে পড়তেই কালো পিঁপড়েরা এসে সেগুলোকে নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিলে। মিতু বড় একটুকরো মাটিতে ফেলে দিতেই কালো পিঁপড়ের দল ছেয়ে ফেলল সেটা। তার

পরেই খাবারের গন্ধ পেয়ে লাল পিঁপড়েও বেরতে আরম্ভ করল একটা দুটো করে। হঠাৎ তারা আক্রমণ করল রুটি সমেত কালো পিঁপড়েগুলোকে। ছোট হলে হবে কি, লাল পিঁপড়ের দাঁতে বোধ করি বিষ বেশী। দেখতে দেখতে কালো পিঁপড়েদের আর বাকি রাখল না। যে-ই বাধা দিতে এল সে-ই লাল পিঁপড়ের কামড়ে মারা পড়ল। অন্তত পঞ্চাশটা কালো পিঁপড়ে এইভাবে মরল। লাল পিঁপড়েরা তাদের কাঁধে ফেলে টেনে নিয়ে চলল গর্তে। আর একদল বিজিত পিঁপড়ে রুটির টুকরোটা নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিলে।

মিতু খুব মনোযোগ দিয়ে পিঁপড়েদের এই অসমান যুদ্ধ দেখছে সেই সময় স্পাচেক সায়েব হাঁক দিলেন—চল এবার সব—গুহায় ঢুকতে হবে।

॥ ২৮ ॥

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিতু যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে বনের পথ ধরল। চক্রাকারে বনের রাস্তা। খানিকটা এগিয়ে তারপর হঠাৎ উপরে উঠে গেছে। সামনেই দেখা গেল বড় বড় পাথরের চাংড়া। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে এক রকম মনসা গাছের ছড়াছড়ি। তাতে অজস্র ফুল ফুটেছে। মনে হয় যেন নন্দন কাননের মধ্যে এসে পড়লুম। সেই ফুলের রাজ্যের মধ্যে যেখানটায় ফাঁক সেইখানে চোখে পড়ল গুহায় ঢোকবার দ্বার।

স্পাচেক সায়েব পকেট থেকে একটা মোমবাতি বার করে ঈভানের হাতে দিলেন, আর দিলেন এক বাক্স দেশলাই। আমাদের সকলকে কোট খুলে ফেলতে বললেন; হাত থেকে হাত-ঘড়িও। গুহার মধ্যে কাদা আছে। হামা গুড়ি দিয়ে নামতে উঠতে হবে কোথাও কোথাও। কাজেই প্যাণ্ট নষ্ট হবে। তা হোক, তার

জন্যে আমরা প্রস্তুত ছিলুম। স্পাচেক সায়েব আমাদের কোটগুলো হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে এগোলেন গুহার প্রথম ঘরের মধ্যে। আমরা তাঁর পিছনে। বেশ বড় ঘরটি। আবছা অন্ধকার—শুধু গুহাদ্বার দিয়ে অল্প একটু আলো আসছে। দেয়ালের নানা জায়গায় গর্ত এবং ফাটল। তার কোনটা দিয়ে কোন দিকে যাওয়া যায় কিছুই জানি না। দু-একটা ফাটলের গর্ত মনে হল সোজা পৃথিবীর গহ্বরের মধ্যে নেমে গেছে—ওর মধ্যে পা পিছলে পড়লে কোথায় চলে যাবো তার ঠিক নেই। শেষে স্পাচেক একটা মাঝারি গোছের গর্ত দেখালেন। ঈভানকে বললেন—এর ভিতর দিয়ে এঁদের দ্বিতীয় ঘরে নিয়ে যাও; তারপর ক্রাপনিকের ঘরটাও এঁদের দেখিয়ে দিও। ক্রাপনিক মানে স্ট্যালাকটাইট স্টালেগমাইট।

লামি বললে—দু-একটা ক্রাপনিক আমি পকেটে করে নিয়ে আসতে পারি কি?

স্পাচেক বললেন—অনায়াসে। এখনও সরকারী তাঁবে এ গুহা আসে নি। একবার এলেই কিন্তু সব ক্রাপনিক জাতীয় সম্পত্তি হয়ে যাবে। তখন আর একটি গুঁড়োও নেবার কারো অধিকার থাকবে না।

ঈভানের পিছনে পিছনে আমরা ঢুকে পড়লুম। প্রথমে খাড়া হয়ে তারপর কোলকুঁজো হয়ে, শেষে একেবারে হামাগুড়ি দিয়ে। একটা সরু গর্তের মধ্যে দিয়ে আমরা অবশেষে একটা বড়সড় ঘরের মধ্যে এসে হাজির হলুম। ঈভানের হাতে প্রজ্বলিত মোমবাতি। তারই স্বল্প আলোয় দেয়ালগুলো কেমন ভূতুড়ে মনে হতে লাগল। এ ঘরের দেয়ালেও চারিদিকে কেবল গর্ত। কোন গর্ত কতদূর গেছে বোঝবার উপায় নেই। কিন্তু মোমবাতি নিয়ে তাদের কাছে এসে দাঁড়ালে মনে হয় অজানা কোনো রহস্যপুরীর পথ বুঝি সেই দিকে। স্পাচেক ঈভানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, বাঁ দিকের একটা গর্ত দিয়ে ঢুকলে ক্রাপনিকের ঘরে এসে পৌঁছন যাবে। কিন্তু

বাঁ দিকে তো অনেকগুলো গর্ত—কোনটাকে বাছবো তার মধ্যে? ঈভান তার মোমবাতি নিয়ে একটা গর্তের মধ্যে অগ্রসর হল। আমরা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলুম। সে কী নিরেট অন্ধকার। একটু পরে গর্তের মধ্যে ক্ষীণ আলোর ইঙ্গিত পাওয়া গেল। ঈভান বেরিয়ে আসছে। গর্ত বেশী দূর যায় নি। একটু গিয়েই বোজা। তারপর আর একটা গর্তের মধ্যে গিয়েই বেরিয়ে এল ঈভান। সেটা গর্তই নয়—সামান্য একটু ফাটল। তৃতীয় গর্তটার মধ্যে খানিকটা গিয়েই ঈভান আমাদের চেঁচিয়ে ডাকল—এসো, রাস্তা পাওয়া গেছে।

আমরা বললুম—অন্ধকারে আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি না। যাবো কি করে? ঈভান বেরিয়ে এল দীপ হাতে। তখন আমরা সারিবন্দী হয়ে গর্তের মধ্যে ঢুকলুম। প্রথমে ঈভান, তারপর মিতু, তার পিছনে আমি, সব শেষে লামি। লামি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। আঁকা বাঁকা গলি তো—সামনের আলো পিছনে এসে পৌঁছয় না। অগত্যা ঈভানের বাতি মিতুর হাতে, মিতুর কাছ থেকে আমার হাতে এবং শেষে লামির হাতে এল। লামি দু-পা এগিয়ে আবার বাতি বাড়িয়ে দিল ঈভানের হাতে। এইভাবে এক-পা দু-পা করে আমরা এগিয়ে চললুম। তারপর খুব সরু হয়ে এল রাস্তাটা। সেটুকু হামাগুড়ি দিয়ে পার হয়ে অবশেষে আমরা হাজির হলুম যেখানে, সেখানে ছাদ থেকে রাশি রাশি স্ট্যালাকটাইট ঝুলছে। লামি দু-একটা বেছে ভরে ফেলল তার পকেটে। আমরা বাতির আলো ফেলে স্ট্যালাকটাইটের সৌন্দর্য উপভোগ করলুম খানিকক্ষণ। তারপর চললুম ফিরে। কিন্তু ফিরতে গিয়ে দেখা গেল দিকভ্রম হয়ে গেছে। ঘরের চারিদিকে ঘোরার ফলে যে-দিক দিয়ে আমরা ঢুকেছিলুম সেটা গুলিয়ে গেল। ঈভান এমন ধাঁধা খেয়ে গেল যে দেয়ালের গায়ের যে-কোনো ফাটলকেই তার মনে হতে লাগল বেরবার রাস্তা।

মিতু ভয় পেয়ে গেল। বললে—তা হলে বরং স্পাচেক সায়েবকে চেঁচিয়ে ডাকা যাক।

ঈভান বললে—তুমি চেঁচালে উনি ভাববেন, আমাদের নিশ্চয় কোনো বিপদ হয়েছে। আমিই বরং ডাকি বাবাকে। এই বলে প্রথমে মিহি স্বরে তারপর চড়া গলায় তার বাবাকে দুবার ডাকল। ডেকে আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলুম। শোনবার চেষ্টা করতে লাগলুম ঘরের কোন দিক থেকে সাড়া আসে। মিনিট কয়েক অপেক্ষা করার পর শুনতে পেলুম দেওয়ালের এক দিক থেকে ঈভানের নাম ধরে তার বাপ ডাকছেন। ফাঁকটা খুঁজে পাওয়া গেল। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলুম। স্পাচেক সায়েব টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারপর আবার হামাগুড়ি দিয়ে সে ঘর পার হয়ে আমরা বেরিয়ে এলুম শেষ ঘরে। দিনের ক্ষীণ আলো আসছিল সেখানে গুহাদ্বার দিয়ে। মনে হয় যেন দিন শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি দিন শেষ কই—খটখটে রোদ। লক্ষ্য করলুম গাছ পাতা ঘাসবন সব ভিজে সপ্‌সপ্‌; সরু সরু নালা দিয়ে লাফাতে লাফাতে জলস্রোত নেমে চলেছে ঢালু পথে। বোঝা গেল আমরা যতক্ষণ গুহায় ছিলুম তার মধ্যে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

স্পাচেক সায়েব বললেন—চলুন, এবার অন্য গুহাটায় যাওয়া যাক।

আমি বললুম—অন্য গুহাটা কোথায়?

—এ পাহাড় থেকে নেমে যাবো নীচে. তারপর উঠবো গিয়ে ঐ যে দেখছেন পাহাড়টা ঐখানে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে গুহা-মুখ বাইরে থেকে দেখা যায় না।

পাহাড় থেকে নামা শুরু হল। চুনামাটির খাড়া পাথরের চাঁই। মাঝে মাঝে আলপাইন মনসার ঝোপ। সাবধানে পা ফেলে ফেলে আমরা নীচে নেমে এলুম। সামনে একটা সর্পিল গিরিবর্ত্ম। তাই ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে জঙ্গলময় এক পর্বতের নীচে এসে আমরা

দাঁড়ালুম। স্পাচেকের মুখস্থ এ সব জায়গা। পায়ে-চলা কোনো রাস্তা নেই—জঙ্গল ভেঙে বুনো লতাপাতা আর বড় বড় ডাল টপকে আমাদের উঠিয়ে নিয়ে চললেন। বেশ খানিকটা উঠে দেখি জঙ্গল একটু পাতলা হয়ে এসেছে। তারপর একটু এগিয়ে যেতেই একটা গুহদ্বার চোখে পড়ল। লোহার শিক দেওয়া দরজা। তালা দিয়ে বন্ধ। স্পাচেক বললেন—এ গুহাটার ভার সরকার ইতিমধ্যে নিয়েছেন, তবে সংস্কারের কাজ এখনও আরম্ভ হয় নি। চলুন ভিতরে ঢোকা যাক।

—সে কি? দরজায় যে তালা!

—আসুন না। বলে স্পাচেক সায়েব একটা গরাদ টেনে ধরলেন। ধরতেই সেটা উঠে এল। আমরা একে-একে সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়লুম। সব শেষে স্পাচেক। তিনি ঢুকে গরাদ বসিয়ে দিলেন। গুহার মধ্যে ঢুকেই দেখতে পেলুম ছাদ থেকে ঝুলছে রাশি রাশি স্ট্যালাকটাইট। মাটি ফুঁড়ে উঠেছে থরে থরে স্টালেগমাইট। গুহাটা বেশ বড়, কিন্তু বেজায় স্যাঁতসেঁতে, বেজায় ভিজে। টস্‌টস্ করে উপর থেকে জল পড়ছে। দীপ জ্বেলে নিয়ে এগিয়ে চললুম আমরা গুহার মধ্য ভাগে। জায়গায় জায়গায় জল জমে রয়েছে। অন্ধকারে তার মধ্যে পা পড়ে গিয়ে জুতো-টুতো ভিজে একাকার হতে লাগল। শেষে এক জায়গায় এসে স্পাচেক সায়েব থেমে বললেন—এইবার তাকান এদিকে।

দেয়ালের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা গহ্বর। দীপ হাতে এগিয়ে গিয়ে দেখা গেল কালো মাটির মধ্যে ফিতের মত কি সব উঁকি দিচ্ছে। ভাল করে লক্ষ্য করে বুঝলুম কঙ্কাল। স্পাচেক সায়েব বললেন—এই হল প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভাল্লুকের কঙ্কাল! এইখানে জন্তুগুলো থাকত।

আর এগোনো গেল না। বেজায় কাদা আর জল। কাজেই ফিরলুম। গুহা থেকে বেরিয়ে এসে স্পাচেক সায়েব বললেন—চলুন

আর দেরি করা নয়। ফেরবার পথ অনেক। শেষে বনের মধ্যে না অন্ধকার হয়ে যায়।

জঙ্গল মাড়িয়ে নেমে এলুম রাস্তায়। স্পাচেক সায়েব বললেন —জানেন, এ গুহাটা যখন আমি আবিষ্কার করি, কি কাণ্ড হয়েছিল ? আর একটু হলে মারাই পড়েছিলুম।

—বলেন কি ?

—হ্যাঁ, শুনুন তাহলে। আমার একটি বন্ধুকে নিয়ে—সে-ও ছিল আমারই মতো ডানপিটে—এই গুহায় প্রবেশ করবার জন্যে একদিন বেরিয়েছিলুম। গুহার মুখ তখন এত বড় ছিল না, গুহাপথও এত চওড়া ছিল না। গুহাপথের প্রায় সমস্তটা ছিল কাদায় ঠাসা। অল্প একটু ফাঁকা, তারপর কাদার পাহাড়, এই রকম। আমাদের হাতে একটি হারিকেন লণ্ঠন আর ছোট হাতলওয়ালা একটি কোদাল। সেই কোদাল দিয়ে এক খাবলা মাটি তুলে আমি বন্ধুর হাতে দিচ্ছি, আর সে সেটা ছুঁড়ে পিছনে ফেলে দিচ্ছে। এই ভাবে তিল তিল গুহা-পথ বাড়িয়ে এগিয়ে চলেছি দুজনে হামাগুড়ি দিয়ে। চার পাঁচ ঘণ্টা কাজ করেছি, অনেকটা এগিয়েছি, এমন সময় হঠাৎ লণ্ঠনের আলোটা নিবু-নিবু হয়ে এল। ভাবলুম, তেল ফুরিয়ে এসেছে বুঝি! কিন্তু ঝাঁকিয়ে দেখলুম লণ্ঠনে যথেষ্ট তেল রয়েছে। হঠাৎ দেখি আমার বন্ধু বসে বসেই ঢলে পড়ছে। অজ্ঞান হয় আর কি! তখনই বুঝলুম, কাদা ফেলতে ফেলতে পিছন দিকের ফাঁকটা আমরা বুজিয়ে ফেলেছি। তাতেই ভিতরের অক্সিজেন ফুরিয়ে এসেছে। বন্ধুকে ধাক্কা দিলুম। নড়ে না। সর্বনাশ, ওকে ঠেলে বাইরে নিয়েই বা যাই কি করে ? গর্তটা এত সরু যে কোনো রকমে ঘাড় গুঁজে বসে থাকা যায়। এমন অবস্থায় কাদার মধ্যে দিয়ে কাউকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। এদিকে আলো প্রায় নিবু নিবু হয়ে এল। আমারও শ্বাস-রোধ হবে আর একটুক্ষণের মধ্যে। আমি তখন আমার বন্ধুর পাঁজরে যত জোরে পারি মারলুম

এক খোঁচা। মারতেই ব্যথায় সে আঁক্ করে উঠল। আবার এক খোঁচা আর সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা। জেগে উঠল বন্ধু। ফুসফুসের কাজ শুরু হল বোধ হয়। দেখি সে বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে। আমি তখন তাকে বেধড়ক পিটিয়ে চলেছি আর ঠেলা দিচ্ছি। বন্ধু ব্যথার চোটে দেখতে দেখতে কাদার বাধা ভেদ করে ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এল। তার পিছনে লণ্ঠন আর কোদাল হাতে আমি। অপমৃত্যুর হাত থেকে এইভাবে বেঁচে গিয়েছিলুম সেবারে। সেই থেকে আর কখনও দুজন লোকে গুহা আবিষ্কারে আসিনি ; বেশী লোক নিয়েই এসেছি। গুহা ভেদের নিয়মই হচ্ছে এক সঙ্গে অনেক লোক নিয়ে ঢোকা।

কথা কইতে কইতে আমরা সেই গিরিপ্রস্রবণ আর গরুর খাটালের কাছে এসে পড়েছিলুম। তখন বেলা পাঁচটা। ভারি সুন্দর অপরাহ্ণ। পাহাড়ের গায়ে পাইনের বন বড় লোভনীয় দেখাচ্ছে। তাদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। স্পাচেক বললেন—ঐ বনের মধ্যে দিয়ে একটা পায়ে-হাঁটা রাস্তা আছে—ঘণ্টা চারেক লাগবে ত্রেঞ্চান্স্কে তেপ্লিৎসেতে পৌঁছতে।

আমরা বললুম—তাই চলুন। বাস ট্রাম আজ আর ভালো লাগছে না।

পাইন বনের রাস্তা ভারি সুন্দর। কিন্তু বনের ওপারে কী আছে তা তো আর স্পাচেক সায়েব আমাদের বলেন নি। বনের যত ঝরনা তারা গত কয়েক দিনের বৃষ্টির ফলে ফেঁপে উঠে নীচেকার সমতল জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিটা প্রায় ভাসিয়ে দিয়েছে। স্পাচেক সায়েব এটা বোধ হয় অনুমান করেন নি। তিনি বিস্ময়ের স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন —ওঃ হা-আ-আ! আবার বললেন—ওঃ হা-আ-আ! ভাবলুম, মন্তর-টন্তর ছাড়ছেন না কি? তারপর দেখলুম তা নয়, সত্যিই বিব্রত বোধ করছেন আমাদের এখানে এনে। সেটাই জানাচ্ছেন উচ্চ স্বরে। কিন্তু তখন আর ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় ছিল না।

আমার হাঁটুর উপর কাপড় গুটিয়ে সেই জলাকীর্ণ বনভূমি পার হয়ে চললুম। অগত্যা চার ঘণ্টার জায়গায় পাঁচ ঘণ্টা সময় নিয়ে সেদিন রাত দশটার সময় আমরা বাড়ি ফিরলুম। ছত্রিশ কিলোমিটার পথ হেঁটে পা সবার ভারি কিন্তু হাঁটা আর নতুন জিনিস দেখার আনন্দে সবাই পূর্ণ। আরো দিন দুই ত্রেঞ্চানস্কে তেপ্‌লিৎসেতে কাটিয়ে আশ-পাশের পাহাড়গুলি পরিক্রমণ করে আমরা একদিন বেরিয়ে পড়লুম নিম্ন তাতরার উদ্দেশে।

॥ ২৯ ॥

স্লোভেকিয়ার যে বিশ্ববিখ্যাত সৌন্দর্য তা এই তাতরা অঞ্চলে। তাতরার দুই ভাগ—উচ্চ তাতরা, নিম্ন তাতরা। উচ্চ তাতরারই খ্যাতি বেশী কিন্তু আমার নিম্ন তাতরাও একই রকম ভালো লাগে। চললুম নিম্ন তাতরার পথে। সঙ্গে নিলুম একখানি বড় স্কেলের ম্যাপ—যাতে হাঁটার সুবিধে হয়।

ট্রেনে করে যেখানে এসে উপস্থিত হলুম বেলা বারোটার সময় সেটা হল নিম্ন তাতরার পাদদেশ থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরের ছোট্ট একটি শহর। এখান থেকে বাসে করে যে রাস্তা গেছে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত, তা দিয়ে যেতে গেলে পথে পড়ে এখানকার প্রখ্যাততম গুহা ডেমানোভা। ভাবলুম গুহাটা দেখেই নিই। গুহা দেখে সন্ধ্যার সময় পাহাড়ের নীচে কোথাও একটা আশ্রয় খুঁজে নেওয়া যাবে রাত্রের মতো। কাল সকালে শুরু করব পর্বতারোহণ।

স্টেশান থেকে বেরিয়ে বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে গিয়ে দেখি অনেকগুলি বাস দাঁড়িয়ে—আধ ঘণ্টা অন্তর ছাড়ছে এক-একটা করে ডেমানোভা গুহার উদ্দেশে। পাশের দোকান থেকে তাড়াতাড়ি কিছু আলু, আপেল আর পাঁউরুটি-মাখন কিনে নিলুম। পাহাড়ে উঠে বেঁটে

পাইনের ঝোপের পাশে বসে খাবার রসদ। এর একটা অংশ আমার রুকস্যাকে ভরে যেই হ্যাঁচকা মেরে রুকস্যাকটাকে কাঁধে তুলেছি—অমনি ফ্যাঁস্ করে ছিঁড়ে গেল। ধার করা পুরোনো রুকস্যাক, কত আর ভার সইবে? এখন উপায়? পাহাড়ে ওঠবার ঠিক আগেই এই কাণ্ড? ভাগ্যিস শহর কাছে—একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে। পাহাড়ে চড়তে চড়তে এই ব্যাপার হলে হয়েছিল আর কি!

একখানা বাস শহরের দিকে যাচ্ছিল। গৃহিণীকে আর লামিকে তাতে তুলে দিয়ে বললুম—তোমরা বাসে করে শহরের বড় বাজারে যাও, গিয়ে বেশ মজবুত দেখে একখানা রুকস্যাক কিনে নিয়ে এস আমার জন্যে। বলে আমি টাকা দিয়ে দিলুম। মিতু বলে দিল, ঐ সঙ্গে কিছু চীজ আর চকোলেটও আনতে।

আমি আমার সেই বিধ্বস্ত রুকস্যাক আর তার মধ্যেকার অজস্র জিনিস সামলে দাঁড়িয়ে রইলুম বাস স্ট্যাণ্ডে। আধ ঘণ্টা পরে গৃহিণী এবং কন্যা ফিরে এলেন—হাতে এক আনকোরা নতুন সবুজ রংয়ের পোলিশ রুকস্যাক। বাসে উঠে পড়তেই বাস ছেড়ে দিল। কোলের উপর রুকস্যাক রেখে পুরোনোটা থেকে নতুনটায় জিনিসগুলো সব গুছিয়ে ফেললুম। নতুন রুকস্যাক পেলে চরণিকদের যেমন মন খুশী হয়ে ওঠে আমারও তেমনি হল।

প্রচুর যাত্রী বাসে। বেশীর ভাগই চলেছে ডেমানোভা গুহা দেখতে। প্রচণ্ড ভিড় হয় আজকাল এইসব জায়গায়—বিশেষত গ্রীষ্ম ঋতুতে। যুদ্ধের আগে একবার আমি ডেমানোভা গুহায় প্রবেশ করেছিলুম। সে কথা আমার 'চরণিক' বইয়ে লিখেছি। তখনও ভিড় হত। কিন্তু আজকাল যা হয় তার সঙ্গে তুলনা হয় না। সাধারণ বাস এবং প্রাইভেট গাড়ি তো আছেই, এ ছাড়া দেশের নানা কারখানা, নানা সমবায়, যৌথ খামার এবং সংগঠন থেকে দলে দলে কর্মী তাদের নিজেদের বড় বড় বাসে চড়ে এখানে

আসে। দেশ দেখার হিড়িক আগের চেয়ে কত গুণ যে বেড়েছে তার ঠিক নেই। গুহার কাছে পৌঁছে দেখলুম আগেকার সে গুহার প্রবেশ পথ আর চেনা যায় না। পাহাড় কেটে মস্ত হল্। নিয়ন বাতি। গুহার গায়ে প্রকাণ্ড আধুনিক হোটেল, রেস্তরাঁ। জঙ্গলের পথে চলতে চলতে এখানে এসে পড়ে হঠাৎ অতি-সভ্যতার ঝিলিক দেখে চোখে ধাঁধা লেগে যায়।

আমরা গিয়ে উঠলুম গুহার দরজায়। প্রায় দেড়-শ লোকের একটি দলের ভার নিয়ে তিনজন গাইড গহ্বরের মধ্যে ঢুকল। গাইডদের মধ্যে একজন ব্রাটিস্লাভার টেকনিকাল কলেজের ছাত্রী —সে এগিয়ে এসে আলাদা করে আমাদের চারজনের ভার নিল। গুহার বাইরে যতই চাকচিক্য বাড়ুক, গুহার ভিতরটা কিন্তু সেই আগেরই মত আছে। লক্ষ বছর ধরে প্রকৃতি তিল তিল করে যে কারুকার্য গড়ছে তার গায়ে হাত দেবে কে? আরো এক লক্ষ বছর এমনিই থাকবে। নতুনের মধ্যে দেখলুম, আগে যতখানি গুহা-পথ বিজলীর আলোয় আলোকিত ছিল এখন আরো দু-এক কিলোমিটার বেশী বিজলির লাইন ফেলে লোকচক্ষুর সামনে টেনে আনা হয়েছে।

গুহা থেকে বেরতেই দেখলুম সন্ধ্যা আসন্ন। আমাদের এখন প্রধান কর্তব্য রাত্রের আস্তানা খোঁজা। ডেমানোভা গুহার হোটেলে একটিও জায়গা নেই। অনেক দিন আগে থেকে বুক করে এসে দখল করে সবাই। শৌখিন জায়গার জনপ্রিয় হোটেলের সব ক্ষেত্রেই এই অবস্থা। অগত্যা আমরা টেকনিকাল কলেজের ছাত্রী গাইডকে ধরলুম। তার সেদিনের মত কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফেরবার জন্যে ব্যাগ থেকে আয়না বার করে চুল আঁচড়াচ্ছিল। আমরা বললুম—আমাদের থাকবার একটা ব্যবস্থা করে তারপর বাড়ি যেয়ো।

মেয়েটি তখনই ব্যাগ গুটিয়ে টেলিফোন করতে ছুটল। আমাদের বললে—রেস্তরাঁয় খাবার দিচ্ছে, আপনারা খেয়ে নিন, আমি ব্যবস্থা করছি।

খাওয়া যখন প্রায় শেষ করে এনেছি, মেয়েটি ঘরে ঢুকে বললে—পেয়ে গেছি খুব ভাগ্যক্রমে। আজকাল এ-দিকে যা যাত্রীর ভিড়! চাহিদার তুলনায় জায়গা অনেক কম। যেখানে টেলিফোন করি সেখানেই বলে সব ভর্তি। যাই হোক খাওয়া সেরেই চলে যান তাড়াতাড়ি। বাসে করে পনের মিনিটের পথ। 'খপক্' পাহাড়ের একেবারে নীচেই 'ত্রি ডম্‌চেকি' নামে এক পার্বত্য কুটির। একটা কুটির নয়—নাম শুনেই বুঝতে পারছেন, তিনটি কুটির—তারই একটাতে এখনও জায়গা আছে। বলে দিয়েছি আপনারা যাচ্ছেন।

বাস আমাদের যেখানে নামিয়ে দিল সেখান থেকেই খপক্ পাহাড়ের চড়াই শুরু। বাস-কন্‌ডাকটার একটা রাস্তা দেখিয়ে বললে—এইটে ধরে উঠে যান—মিনিট পনেরোর রাস্তা ত্রি ডম্‌চেকি।

পাহাড়ের উল্টো দিকে সূর্যাস্ত হয়েছে অনেকক্ষণ। বিরাট ছায়া ফেলে অন্ধকার নেমে আসছে। ছায়াময় জগত। রাস্তায় কোনো লোক নেই—শুধু আমরা চারজন। রুকস্যাক পিঠে কোলকুঁজো হয়ে উঠছি খাড়া পথ বেয়ে। বেশ লাগছে। একটু উঠে একটা মোড়ে আসতেই পাহাড়ের চূড়ো দেখা গেল দু-একটা। ওদেরই জয় করবার জন্যে কাল আমাদের বেরতে হবে। আর একটু হাঁটতেই পাইন বনের ফাঁক দিয়ে হলদে আলো চোখে পড়ল। ত্রি ডম্‌চেকি কুটিরের জানলা দিয়ে আলো আসছে।

কুটির-কর্তা আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। যখন শুনলেন আমরা খেয়ে এসেছি, তখন আর খাবার ঘরে না নিয়ে গিয়ে সোজা নিয়ে গেলেন আমাদের শোবার ঘরে। হঠাৎ পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে চাঁদ উঠল। জানলার মধ্যে দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ল আমাদের ঘরের মধ্যে। আমরা বলাবলি করলুম—চাঁদ যখন উঠেছে, কাল তবে দিনটা সুন্দর হবে—হাঁটা যাবে ভালো। বলে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম সবাই। ভোর বেলা যখন ঘুম ভাঙল,

দেখি মেঘে আকাশ থমথম করছে। খাবার ঘরে ব্রেকফাস্ট খেতে গিয়ে শুনলুম রেডিওয় বলছে, আজ বেশ বৃষ্টি হবে।

কুটির-কর্তা বসে রেডিও শুনছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম—সত্যি বলে মনে হয় না কি? বৃষ্টি হবে আজ?

—সব কিছু দেখে শুনে হবে বলেই তো মনে হচ্ছে।

—আমাদের দেশে জানেন, ঠিক উল্টো। যে-দিন খবরের কাগজে লেখে আবহাওয়া ভালো যাবে, আমরা ছাতা নিয়ে বেরুই। ঝড় বৃষ্টির কথা লিখলে কিচ্ছু না নিয়ে বেরুই।

কুটির কর্তা খুব খানিকটা হাসলেন, তারপর বললে—আজ আপনাদের প্ল্যান কি? কোথায় বেড়াবেন?

আমি বললুম—যে রকম বৃষ্টির ভয় দেখাচ্ছে সকলে, উপরে নেড়া পাহাড়ে উঠে ভিজতে চাই না। তার চেয়ে বরং কাছাকাছি কোথাও থেকে ঘুরে আসবো আজ। কাল যদি রোদ-টোদ ওঠে তো বেরিয়ে পড়া যাবে নিম্ন তাতরা পরিক্রমণে।

ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে দেখি মস্ত একটা ঝুলন্ত রেলের স্টেশান। পাহাড়ের নীচে থেকে লোহার থামের উপর দিয়ে ফেলা লোহার দড়ি বেয়ে ঝুলন্ত চৌকি একটার পর একটা উঠছে পাহাড়ের চূড়ো পর্যন্ত। খপক্ পাহাড়ের চূড়ো। খপকের চূড়ো নিম্ন তাতরার অন্যতম উচ্চ শীর্ষ। প্রায় ছ'হাজার ফিট উঁচু।

ঘুরতে যখন বেরিয়েছি, খপকের চূড়োতে গিয়ে ওঠা যাক! বৃষ্টি আসে আবার লিফ্‌টে করে নেমে আসবো, এই ভেবে আমরা টিকিট কিনে লিফ্‌টে গিয়ে উঠলুম। এক-একটা চেয়ারে দুজন করে বসবার জায়গা। চেয়ারের দু-হাতলের মাঝে আড়াআড়িভাবে একটা রড ফেলে দেওয়া, যাতে চেয়ারের যাত্রী উল্টে পড়ে না যান। শূন্যের মধ্যে দুলতে দুলতে আমরা সেই খোলা চেয়ারে বসে উড়ে চললুম। পায়ের নীচে তাকিয়ে পিঠের শিরদাঁড়া সিরসির করে উঠল। তার ফস্কে চেয়ারটা যদি পড়ে? নাঃ ওদিকে আর তাকানো নয়।

চেয়ারের হাতলটা মুঠিয়ে ধরে তাকিয়ে রইলুম আকাশের দিকে। একটার পর একটা খাম্বা পেরিয়ে উঁচু থেকে ক্রমে আরো উঁচুতে উঠতে লাগল আমাদের চেয়ার। ছ-হাজার ফিট উপরে উঠে এসে দেখি বিষম শীত। হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে। আকাশের এক কোণে এক খণ্ড কালো মেঘ। ঐ মেঘটির উপর নির্ভর করছে আজকের দিনের ভাগ্য। যত যাত্রী উঠছেন সবারই নজর ঐ মেঘের টুকরোটির উপর। ওটা যদি আকারে বেড়ে উঠে আকাশ ছেয়ে ফেলে তাহলেই হয়ে গেল আজকের বেড়ানো! পাহাড়ের চূড়োয় চমৎকার একটি গোল কাঁচে ঢাকা বুফে। স্থির করলুম, বুফের মধ্যে গিয়ে বসে ঐ মেঘটার দিকে লক্ষ্য রাখা যাক। মেঘ যদি কেটে যায় তো একটা লম্বা পাড়ি দেওয়া যাবে।

বাইরে অত ঠাণ্ডা কিন্তু বুফের মধ্যেটা গরম। ঢুকে কিছু চা কফি অর্ডার দিলুম আর পকেট থেকে বার করলুম আমাদের স্যাণ্ডুইচের স্তূপ। অভিজ্ঞ চরণিকের মতো ব্রেকফাস্ট সারা হলেই কতকগুলো রুটি কেটে মাখন মাখিয়ে তার মধ্যে যেদিন যা পাওয়া যেত ভরে আমরা পকেটস্থ করে ফেলতুম। সেদিনও তাই করেছিলুম। ঘণ্টা খানেক বুফেতে বসে থাকবার পরও আকাশের কোণের কালো মেঘের পরিমাণ বাড়লও না কমলও না—যেমন ছিল তেমনি রইল। অন্য দিকের মেঘগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে রোদ বেরিয়ে পড়তে লাগল। এই সব দেখে উৎসাহিত হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম কাঁচে ঢাকা বুফে থেকে।

খপকের চূড়ো থেকে নানা দিকে পায়ে হাঁটা রাস্তা গেছে। এই সব অতি-সুন্দর পার্বত্য রাস্তা দিয়ে সমস্ত নিম্ন-তাতরা পায়ে হেঁটে পরিভ্রমণ করা যায়। খুঁটির গায়ে কাঠের ফলকে দেখানো আছে এই সব পথের পরিচয়। তিন কিলোমিটারের একটা পথ একটি পর্বত-শৃঙ্গে গিয়ে উঠেছে—তার নাম ডেরেশ। এটাই আমরা পছন্দ করলুম। সেখান থেকে আরো তিন চার কিলোমিটার গেলে

পোলানা নামে আর একটি শৃঙ্গ। যদি আকাশের অবস্থা ভালো থাকে তাহলে সেখানেও যাওয়া যেতে পারবে।

ঠাণ্ডা বাতাসের জন্যে গায়ে রেনকোটটা চড়িয়ে বেরিয়ে পড়লুম। নেড়া পাহাড়। শুকনো সবুজ শেওলা ঢাকা বড় বড় পাথরের চাংড়া—তার মাঝ দিয়ে নরম মস্এ ঢাকা জমি। তারই উপর দিয়ে আমাদের সুঁড়ি পথ। যতদূর চোখ চলে শুধু আকাশ আর পর্বত-রেখা। নিম্ন-তাতরা পাহাড়ের শিরদাঁড়া এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অনেকটাই চোখে পড়ে। সেই শিরদাঁড়ার উপর দিয়ে আমরা হাঁটতে শুরু করলুম। মাঝে মাঝে এক তাল কুয়াসা পাহাড়ের উপর হামাগুড়ি দিয়ে বসে রয়েছে—তাদের পিছনে কি, দেখবার যো নেই। এই পাহাড়ে-কুয়াসা বড় ভয়ানক জিনিস—যে কোনো সময় ডিমের ফেনার মত একটু থেকে অনেকটা বেড়ে উঠে সারা পাহাড় ছেয়ে ফেলতে পারে—তাতে হাঁটার সমস্ত আনন্দ নষ্ট হয়ে যায়। আজকের বাতাসের যে রকম ভাব তাতে সেই সম্ভাবনা সম্পূর্ণ রয়েছে। কিন্তু মন থেকে দুশ্চিন্তা মুছে ফেলে আমরা এগিয়ে চললুম এবং অচিরে উপস্থিত হলুম ডেরেশ নামক শৃঙ্গে। চূড়োয় উঠে দেখি কুয়াসা কেটে যাচ্ছে, নীল আকাশ বেরিয়ে পড়ছে, শুধু একমাত্র অলক্ষণ দূরের আকাশের সেই কালো মেঘটুকু। নড়চেও না, চড়চেও না—যেন কার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে সমস্তক্ষণ। আমরা এগিয়ে চললুম পরের চূড়ো পোলানার দিকে। শিরদাঁড়া বেয়ে আরো তিন চার কিলোমিটার পথ। হিসেব করে দেখলুম পোলানা থেকে সন্ধ্যের আগেই খপকের চূড়োয় ফিরে আসতে পারব। তারপর লিফ্‌টে করে নেমে বাড়ি ফিরতে আধ ঘণ্টা।

চমৎকার নরম ঢালু রাস্তা। প্রায় দু কিলোমিটার পথ ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে চলেছে। পথের দু পাশে প্রস্তরময় গড়ানে জমি নীচের গভীর উপত্যকা পর্যন্ত। সেখানে গভীর পাইন বন। নামতে নামতে আমরা দুই পাহাড়ের সঙ্গম স্থলে এসে হাজির হলুম।

এখান থেকে পাহাড়ের শিরদাঁড়া বেয়ে রাস্তা ক্রমাগত উপর দিকে উঠেছে পোলানার চূড়ো পর্যন্ত। আমাদের ডান দিকে এক বিরাট উপত্যকা। সেই উপত্যকার শেষ অংশে পাইন বনের আড়ালে তিনটি ছোট ছোট বিন্দুর মতো দেখা যায় আমাদের ত্রি ডমচেকি কুটির। এখান থেকে নেমে যাবার কোনো রাস্তা নেই বটে কিন্তু বৃক্ষহীন পর্বত গাত্র দিয়ে পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে বেয়ে নীচে নেমে যাওয়া বিশেষ শক্ত হবে না। কুটিরগুলি মনে হল আন্দাজ দশ বারো কিলোমিটার দূরে। আমরা স্থির করলুম লিফ্‌ট-এর কাছে ফিরে না গিয়ে এই দিক দিয়েই কুটিরে ফিরব। চোখে পড়ল আকাশের কোণের সেই কালো অংশটা যেন কিছুটা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। এইভাবে যদি এবার বাড়তে থাকে তাহলে বাড়ি পৌঁছনো তাড়াতাড়ি দরকার। কাজেই পোলানার শৃঙ্গে ওঠার পরিকল্পনা ত্যাগ করে আমরা পাহাড়ের খাঁজ দিয়ে নামতে শুরু করে দিলুম।

প্রথমটা বেজায় ঢালু। তারপর অধিরোহণের হার আস্তে আস্তে কমে এল। ঠিক যেখান থেকে কমেছে সেখানে ক্ষুদে একখানি গিরি-প্রস্রবণ। পাহাড়ের খাঁজ থেকে এমনই মৃদুভাবে বার হচ্ছে যে মাটিটি পর্যন্ত ভাল করে ভিজোতে পারছে না। মনে হল একটু পরেই দেখব প্রস্রবণ শুকিয়ে গেছে। কিন্তু ও হরি, যত এগোই ততই মাটি ভিজে। শেষে ছোট্ট একটি স্রোত দেখা দিল—কেতলি থেকে চা ঢালার মত। যত আমরা এগিয়ে চলতে থাকলুম, চায়ের কেতলি থেকে ফুলঝারি, তারপর জলের কল, শেষে মোটা হোজ-পাইপের মুখ থেকে যেন গল্‌গল্‌ করে জল বেরতে থাকল। ছোট-খাট একটি ঝরনা—তার উৎস কিন্তু ঐ একটু উপরে রুক্ষ ধূলো-বালির মধ্যে কয়েক ফোঁটা জলের চিহ্নে। তারপর যত এগোলুম ততই বেড়ে উঠল জলের তোড়। আগে লাফিয়ে পার হওয়া যাচ্ছিল এখন আর জলের মধ্যে না নেমে পার হওয়া যায় না। শেষে বড় বড় উপল শ্রেণীর মধ্যে দিয়ে বাহিত খরস্রোতা পাহাড়ে নদীর রূপ নিল সেই শীর্ণকায়া

ঝরনা। নদীর এক পারে গোল গোল চাঁই চাঁই পাথর, অন্য পারে ঢালু জমিতে ফার্নের বন। সেই ফার্নের বনের মধ্যে দিয়ে একটি পায়ে-চলা রাস্তা—তাই ধরে আমরা এগোতে থাকলুম। মাথার উপরে তাকিয়ে দেখলুম আকাশ অন্ধকার হয়ে আসছে। সারাদিনের অপেক্ষমান কালো মেঘের টুকরোটি এতক্ষণে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করতে শুরু করেছে। ভিজে ভিজে হাওয়া উঠেছে একটা। বৃষ্টি এল বলে। নাবাল জমিতে এসে পড়েছি বলে এখন আন্দাজ করা শক্ত এখান থেকে বাড়ি কতদূর। বৃষ্টি যদি এসেই যায় তাহলে কোথায় দাঁড়িয়ে মাথাটাকে একটু বাঁচাবো তাই দেখতে দেখতে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আমরা এগিয়ে চললুম।

মাথার উপর বড় বড় পাইন, এলডার, বার্চ বৃক্ষ, পায়ের তলায় ঘন ফার্নের বন, পাশ দিয়ে কলস্রোতা নদী—যতদূর এগিয়ে চলি শুধু এই দৃশ্য, এর কোনো বদল নেই। তারপর হঠাৎ হাওয়া থেমে গেল। আকাশ ছেয়ে গেল নিকষ কালো মেঘে। প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা এসে পড়ল নদীর জলে। নদীর ধারে এক রকম জংলী লতা হয়—চওড়া গোল গোল তার পাতা। সেই পাতাগুলো চড়-বড় করে উঠল। একটা ভালো দেখে গাছ-তলা খোঁজবার জন্যে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছি, সেই সময় চোখে পড়ল—ঘন জঙ্গলের মাথা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে একটা কুটিরের ছাদ। বাস, তবে তো লোকালয়ের কাছে এসে গিয়েছি, ভেবে আমরা ছুট দিলুম। কুটিরের কাছে পৌঁছে দেখলুম একটা পরিত্যক্ত বনের কুটির। ছোট্ট একখানি কাঠের ঘর—দরজার কোনো চিহ্ন নেই, জানলা দুটো ভাঙা, ছাদটাও মনে হয় নড়-বড়ে। যাই হোক এতেই আমাদের হবে। বৃষ্টির মধ্যে একটা আশ্রয় পাওয়া গেল। প্রচণ্ড বেগে এসে পড়ল বৃষ্টি। ঘরের মধ্যে কয়েকটা কাঠের চওড়া তাক। তারই উপর চড়ে আমরা বসে পড়লুম। চিমনিটা ভাঙা ছিল বলে তার মধ্যে দিয়ে বৃষ্টির জল এসে ঘরের মধ্যে পডতে লাগল।

এক ঘণ্টা ধরে এক-নাগাড়ে বৃষ্টি। চাবুকের মতো জলের ফোঁটা। বাইরে থাকলে এতক্ষণ আমাদের রেনকোট, জামা, গেঞ্জি ভেদ করে গায়ের চামড়া পর্যন্ত ভিজে সপ্‌সপে হয়ে যেত। এক ঘণ্টা পরে বৃষ্টি থামল। তখন আমরা বেরলুম। সে কী দৃশ্য! নদী ফুলে উঠে এ-পার ভাসিয়ে দিয়েছে। যতদূর দেখা যায় শুধু জল আর জল—তার উপর ফার্নের মাথাগুলি শুধু উঁকি দিচ্ছে। কোথায় যে পায়ে-চলা রাস্তা তার কোন চিহ্ন নেই। অগত্যা ম্যাপ বার করলুম। দেখলুম এই নদীটা গিয়ে পড়েছে এক হ্রদে যার তীরে এ অঞ্চলের শৌখিন হোটেল 'মিকুলাশ্‌কা'। এর ঠিক নীচে এক কিলোমিটার দূরে আমাদের ত্রি ডম্‌চেকি। কাজেই আমরা নদীর সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঝোপ-ঝাড় টপকে এগিয়ে চললুম। কিছু দূরে এসেই সেই সুন্দর হ্রদটি পাওয়া গেল। হ্রদের এক পাশ ধরে একটু যেতেই দেখতে পেলুম নীচে আমাদের কুটির তিনখানি পুরোনো বন্ধুর মত হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

॥ ৩০ ॥

আগের দিন অত বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার ফলেই বোধ করি পরদিন ভোর থেকে নিম্ন তাতরা রোদে ঝলমল করে উঠল। হাঁটবার এমন দিন আর পাবো না। রুকস্যাক পিঠে তুলে ত্রি ডম্‌চেকির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম খোলা দুনিয়ায়। আমাদের উদ্দেশ্য—আজ নিম্ন তাতরার সর্বোচ্চ চূড়ো 'দুম্বিয়ার'এ গিয়ে উঠব। সেই চূড়োর ঠিক নীচেই একটি যাত্রী কুটির আছে, সেখানেই রাত কাটাবো। কি রকম যাত্রীর ভিড় হবে, জায়গা পাবো কি পাবো না, কিছুই জানি না। তবু বেরিয়ে পড়লুম। প্রকাণ্ড ভারি ভারি রুকস্যাকগুলি কোলে করে চেয়ার-লিফ্‌টএ বসে ঝুলতে ঝুলতে গিয়ে

উঠলুম খপকের চূড়োয়। আজ আর কুয়াসা নেই, গুঁড়ি মারা কালো মেঘও নেই। যত নীল হতে পারে আকাশ তত নীল। শর্ট্‌স্ পরে হাঁটছি, তাতেও হাঁটুতে বিশেষ শীত করছে না। নিম্নতাতরার শিরদাঁড়া আজ চোখের সামনে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত। পাহাড়ের গা ঢালু হয়ে ডাইনে বাঁয়ে দু-দিকেই নেমে গিয়েছে। বনের আড়ালে মিলিয়ে আছে দু-দিকের নিম্নভূমি। তারই মাঝে মাঝে হয়তো কোনো অজানা গ্রামের গির্জের চূড়ো উঁকি দিচ্ছে। প্রথমে অনেকখানি পাথুরে পথ পড়ল। পাথরের চাংড়াগুলো এক-একটা হাতির মত। মসৃণ পথে ওঠা আর নামা করতে করতে ক্লান্তি এসে যায়। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পাহাড়ের খাঁজের মধ্যে পা গুটিয়ে বসে চারিদিকের অপূর্ব দৃশ্যের দিকে চোখ মেলে দিলেই মুহূর্তে কেটে যায় অবসাদ। এর পরেই পড়ল ঢেউখেলানো পাহাড়ী মাঠ—ফুলে ফুলে ভরা। ফুলবনের মধ্যে দিয়ে সরু পায়ে চলা রাস্তা।

মধ্যদিবসে কোথায় বসে লাঞ্চ খাবো এই এক সমস্যা। নিখুঁত অতুলনীয় পরিবেশ। ঘাসবনে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু ঘাসবন যে ফুলে ভরা—ফুল না মাড়িয়ে বসি কোথায়? মাইলের পর মাইল যে কেবল চুনি-পান্না-হীরের টুকরোর মত বুনো ফুল। অনেক খুঁজে শেষে একটু পাথুরে দ্বীপ পেলুম। সেইখানে বসে জমাটি স্পিরিটের টুকরো জ্বালিয়ে সামান্য চরণিকের রান্না শুরু করে দিলুম আমরা। আজকের আকাশ বাতাস এত পরিষ্কার যে বহু দূর দৃষ্টি চলে। দিগন্তের কোলে উচ্চ-তাতরা পর্বতশ্রেণী আজ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দুম্বিয়ারের চূড়ো এখান থেকে আকাশের গায়ে আঁকা নজরে পড়ে। খেয়ে দেয়ে খানিক জিরিয়ে রুকস্যাক পিঠে আবার আমরা এগিয়ে চললুম। খানিকটা গিয়েই যেখানে পৌঁছলুম সেখান থেকে এক সুঁড়ি পথ খাড়া ভাবে উঠেছে চূড়োয়, আর একটা চূড়োকে সমতল ভাবে বেষ্টন করে ক্রমে নেমে গেছে উপত্যকায়।

হঠাৎ পিছন থেকে শুনি—ও মশায়, শুনুন।

ফিরে দেখি এক ভদ্রলোক, মহিলা, একটি ছেলে ও মেয়ে। সবারই পিঠে রুকস্যাক।

থমকে দাঁড়াতে ভদ্রলোক বললেন—দেখুন, আমাদের এই মেয়েটির হুম্বিয়ারের চূড়োয় ওঠবার খুব শখ। একে একলা ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। এ যদি আপনাদের সঙ্গে যায়, কিছু অসুবিধে হবে?

—অসুবিধে আবার কি? আসুক না আমাদের সঙ্গে। আপনারা চূড়োয় উঠবেন না?

—না, আমরা একেবারে থকে গেছি। আমরা সোজা এই পথে যাচ্ছি হুম্বিয়ার কুটিরে। ঐখানেই আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। আশা করি চূড়োয় আপনারা বেশী দেরি করবেন না। আমাদের আবার আজই উপত্যকায় ফিরে যাওয়া চাই।

—এসো মেয়েটি, তোমার নাম কি?

বছর ষোলো বয়েস মেয়েটির। নাম বললে—হানা।

ছোট ভাই হন্‌সা বললে—আমিও যাবো।

আমরা বললুম—আপত্তি কি, চলে এসো।

তখন সবাই মিলে হুম্বিয়ার আরোহণ শুরু করলুম। উঃ কী চড়াই! খানিকটা করে উঠি আর জিরোতে হয়। এই ভাবে এক ঘণ্টার উপর। শেষে আমরা চূড়োয় এসে পৌঁছলুম। বহু বছর আগে একবার আমি এই চূড়োয় উঠেছিলুম। সেবার কুয়াসা ছিল বলে বিশেষ কিছুই দেখতে পাই নি। কিন্তু আজ? আজ পৃথিবীর এই শীর্ষ থেকে দেখলুম সমস্ত ধরিত্রী হাস্যোজ্জ্বল। আকাশ থেকে যেন আলোর ঝরনা নেমে আসছে পৃথিবীর প্রতিটি গাছ, প্রতিটি পাথর, প্রতিটি ঘাসের উপর। একটু দূরে অনেক নীচে স্পষ্ট দেখতে পেলুম 'মিটো' গ্রাম। সেবারে ঐ গ্রাম থেকেই হেঁটে উঠেছিলুম এই পাহাড়ের চূড়োয়। হুম্বিয়ার কুটিরটিও দেখা গেল চূড়োর ঠিক নীচেই —আধ ঘণ্টার নাবাল পথ। ঐখানে হানা আর হনসার বাপ-মা অপেক্ষা করছেন।

হানাকে জিজ্ঞেস করলুম—তোমরা আজ যাবে কোথা ?

—চের্টোভিৎসা গ্রামে।

—সেখানে তোমরা থাকো ?

—না, বেড়াতে এসেছি। আমাদের বাবা ব্রাটিস্লাভার যে কারখানায় কাজ করেন তাদের একটি বিশ্রাম-কুটির চের্টো-ভিৎসাতে আছে।

—গ্রামটি কেমন ?

—ভারি সুন্দর। পাহাড়ে ঘেরা গ্রামের পরিবেশ। আমাদের সবারই এত ভাল লাগছে যে ব্রাটিস্লাভায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না।

—ওখানে আর যাত্রী-কুটির আছে ?

—আছে আরো দুটো। রাস্তা থেকে উপরে। আমরা আছি রাস্তা থেকে নীচে। আপনারা আসবেন নাকি ?

—আজ তো আমরা দুস্বিয়ার কুটিরে রাত কাটাচ্ছি। কাল পাহাড় থেকে নামব। চের্টোভিৎসার দিকে গেলে মন্দ হয় না।

—আমরা তাহলে বলে রেখে দেব যাত্রী কুটিরে। জানেন তো আজকাল আগে থেকে না বলা থাকলে জায়গা পাওয়া যায় না।

লামি আর মিতুর সঙ্গে এদের দিব্যি ভাব হয়ে গিয়েছিল। ওরা চারজনে প্রায় উড়তে উড়তে পাহাড়ের ঢালু দিয়ে নেমে চলল দুস্বিয়ার কুটিরের দিকে। ওদের অনেক পরে আমরা গিয়ে যখন পৌঁছলুম দেখি কুটিরের দরজায় হানা-হন্সার বাবা আর মা আমাদের জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের এখনও অনেক পথ—যাবার জন্যে তৈরি।

হানার বাবা বললেন—খুব খুশী হলুম আপনারা চের্টোভিৎসাতে আসছেন শুনে। আমরা জায়গা বুক করে রেখে দেব। আসবেন ঠিক।

হানা আর হন্সা বলল—লামি আর মিতু কাল এসো ঠিক কিন্তু।

ডুম্বিয়ার কুটিরে প্রবেশ করবার আগে থেকেই মনে হচ্ছিল কুটির যেন খালি-খালি। ভিতরে ঢুকে দেখলুম—সত্যিই তাই।

অথচ এই কুটিরে বহুকাল আগে যখন একবার এসেছিলুম, তিল ধারণের স্থান ছিল না। দেরি করে যে সব যাত্রী পৌঁছত তাদের জন্যে হল-ঘরে খড়ের বিছানা পেতে শোবার ব্যবস্থা করা হত। শুনলুম আজকাল যাত্রীরা সেই সব আবাস পছন্দ করে বেশী যেখানে মোটার বাইকে করে পৌঁছন যায়। অজস্র লোক মোটার বাইকে চড়ে—এত কখনো ছিল না। মোটার বাইক একটা নেশায় দাঁড়িয়েছে, যার ফলে বিশুদ্ধ হাঁটায় ঢিলে পড়েছে। ডুম্বিয়ার কুটিরের চারিপাশে সেই আগেকার দিনেরই মতো শন্‌শনে হাওয়া। ডুম্বিয়ার পাহাড়ের এইটি বিশেষত্ব। এই কারণেও অনেকে এ কুটির পছন্দ করেন না। যাই হোক, আমরা হাঁটতে ভালবাসি, শন্‌শনে হাওয়াও আমাদের খারাপ লাগে না, তাই আমাদের সুবিধা হল। ভালই জায়গা পেয়ে গেলুম। আমাদের সঙ্গে রইলেন আর একজন চরণিক, তিনি প্রতি বছর এই অঞ্চলে রুকস্যাক নিয়ে হাঁটতে আসেন। আর রইলেন তিনজন স্বয়ংসেবী রক্ষী। এ দেশে একটি স্বয়ংসেবী রক্ষীদল আছে, তাদের কাজই হল পাহাড় অঞ্চলে কেউ যদি দুর্ঘটনায় পড়ে, হাত-পা ভাঙে অথবা হারিয়ে যায়, তাহলে তাদের বাঁচানো। অতি দক্ষ এরা এই কাজে। বিশেষ ভাবে শিক্ষিত হন প্রাণ বাঁচানোর কাজে এদের দলের সভ্য-সভ্যারা। ডুম্বিয়ার কুটিরের অংশবিশেষকে এই রক্ষীদলের একটি ঘাঁটিতে পরিণত করা হয়েছে।

॥ ৩১ ॥

ভোর বেলা ঝরনার ঠাণ্ডা জলে হাত মুখ গা ধুয়ে, জল দিয়ে গা ডলাই মালাই করতেই সিরসিরে ভাবটা কেটে গেল। রুকস্যাক পিঠে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। আজ নিম্নতাতরা থেকে

নেমে যাবো। এই পাহাড়ের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে হেঁটে যেতে তিনদিন লাগে। আমরা মাঝামাঝি জায়গা থেকে আরম্ভ করেছি বলে প্রান্তদেশে পেঁাছতে আমাদের দেড়দিন লাগবে। আজও শিরদাঁড়া বেয়ে পথ। পথে পড়ে তিনটে পাহাড়ের চূড়ো। একবার নীচু তারপরেই উঁচু, পর পর এমনি তিনবার। পথের দুধারে বেঁটে পাইনের ঝোপ। প্রত্যেকটা ঝোপই ছবির মত। ঝোপের ধারে বসে পড়ে মনে হয় সারাদিন এমনি করেই কাটিয়ে দিই। মাঝে মাঝে ফুলের বন। নিম্ন-তাতরার এই অংশটাই সব চেয়ে সুন্দর বলে খ্যাতি আছে। আজকের পথ লম্বা নয় বলে পাহাড়ের উপর থেকে নামবার বিশেষ তাড়া নেই। বসে বসে সময় কাটাই তাই অনেকক্ষণ। শেষে সূর্য যখন ঢলে পড়তে চললেন তখন আমরা নাবাল পথ ধরলুম। নীচের পাহাড়ে পাইনের বন আর ঝরনা। ঝরনার ধারে বসে চা ফুটিয়ে খেয়ে আরো খানিকটা সময় কাটল। শেষে বন পার হয়ে নেমে এলুম বড় রাস্তার উপরে। চের্টোভিৎসে গ্রাম। আবাস কোথায় জিজ্ঞেস করতে গ্রামের লোকেরা দেখিয়ে দিলে। গিয়ে শুনলুম, একটিও জায়গা নেই। আমাদের জন্যে আগের দিন কেউ ঘর বুক্ করে গেছেন কি না জিজ্ঞেস করতে বলল--তা-ও কেউ করেন নি।

অন্য আবাসটি এটার চেয়ে ছোট। সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে একই ফল হল। কোনো ঘর নেই। কেউ বুক্ করেন নি।

ভারি বিরক্তি লাগল। কালকের ভদ্রলোকের ওরকম করে বলবার কি দরকার ছিল? যদি কোনো রকম সাহায্য না-ই করবেন তাহলে কেন বললেন—আসবেন আপনারা। যাই হোক, এখন রাত্রিবাসের জন্যে হয় এই গ্রামের কারো বাড়িতে চেষ্টা করতে হবে, না হলে টেলিফোন করে দেখা কাছাকাছি কোনো হস্টেলে বা হোটেলে জায়গা পাওয়া যায় কি না। আমরা ঠিক করলুম, তার আগে

একবার সেই ভদ্রলোকের আবাসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি। দেখি কি বলেন!

ব্রাটিস্লাভার কারখানার আবাস কোথায় সবাই জানে। রাস্তার নীচে পাহাড়ের গভীর খাঁজের মধ্যে বড়-সড় হলদে রংয়ের একটি দোতলা বাড়ি। দেখলেই বোঝা যায় নতুন তৈরি হয়েছে—ঝক্‌ঝক্ করছে। অনেকখানি নামতে হল। নীচে একটি ছোট্ট পুকুর—ঝরনার জল এসে তাতে জমা হচ্ছে। হলদে বাড়ির প্রতিচ্ছবি পড়েছে পুকুরের জলে। অর্ধেক পথ নেমেছি, দেখি এক দঙ্গল ছেলে-মেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে ছুটতে ছুটতে উঠে আসছে। তাদের পুরোভাগে হানা আর হন্‌সা।

চেক ভাষায় স্বাগত জানাতে জানাতে তারা গলগল করে যে অনেকগুলো কথা বলে গেল তার মধ্যে থেকে আসল যে খবরটা সেটা পেয়ে গেলুম। সেটা হচ্ছে, আমাদের জন্যে পুকুরের ধারে জানলা দেওয়া একখানি ঘর এই আবাসে রাখা হয়েছে।

নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা আবাসে প্রবেশ করলুম। হানার বাবা বললেন—হানা আর হন্‌সার বিশেষ অনুরোধে এইখানেই আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করেছি। উপরের কুটিরে বলে এসেছিলুম আপনারা এলে এখানে পাঠিয়ে দিতে। বলে নি?

আমরা বললুম—ওরা না বলতেও চলে এলুম, দেখছেন তো? কিন্তু এটা তো শুধু আপনাদেরই কারখানার শ্রমিকদের থাকবার জন্যে, তাই নয় কি?

—শ্রমিকদের আর তাদের পরিবারবর্গের। আর আপনারা হলেন বন্ধু-স্থানীয় পরিবারের চেয়েও আপন!

—শুনে খুশী হলুম। মনে রাখব এই হৃদ্যতার কথা।

হানা আর হন্‌সা এসে খবর দিলে খাবার ঘরে খাবার তৈরী!

খাবার ঘরের জানলা দিয়ে দেখলুম, জায়গাটা চারিদিকে পাহাড়-ঘেরা একটা বিরাট গর্ত বিশেষ। যেদিক দিয়ে আমরা নেমে এলুম

সেই দিকে একটি ঝরনা—তার পরিষ্কার জল পুকুরটিতে এসে জমা হচ্ছে। জায়গাটায় জলাভাব নেই। গর্তটা সমস্তটাই সবুজ ঘাসে ঢাকা। পাহাড়ের উপরাংশে চারিপাশেই ঘন বন। নিস্তব্ধ নিথর চারিদিক—ঝড় বাতাস এখানে এসে পৌঁছতে পারে না। অতি শান্ত পরিবেশ। দোতলা বাড়িটিতে খান পঁচিশ ঘর, তার দশ-বারোটিতে যাত্রীরা এসেছেন—বাকি গুলি আপাতত খালি। এই দশ বারোটি ঘরে যাঁরা এসেছেন তাঁরা সবাই ছেলেপিলে নিয়ে এসেছেন —তাতেই এখানে এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে।

খাওয়া সেরে এসে হানা আর হন্‌সা বললে—আমরা ভেড়া-ওয়ালাদের ঘরে চাজ তৈরি করা দেখতে যাচ্ছি। সামি মিতু আসবে?

এ অঞ্চলে ভেড়ার দুধের চীজ তৈরী হয় জানতুম। বিশেষ প্রক্রিয়ায় যারা এই চীজ তৈরি করে তাদের বলে 'বাচা'। প্রাহার রাস্তায় মহার্ঘ্য বস্তু রূপে এই চীজ মাঝে মাঝে আবির্ভূত হয়। তখন আর পড়তে পায় না। বললুম—কোথায় ভেড়াওয়ালার ঘর?

আঙুল দিয়ে পাহাড়ের গায়ের একটা অংশ দেখিয়ে দিল।

সন্ধ্যার খাওয়া হয়ে গেলেও তখনও ঝাপসা আলো ছিল খানিকটা। তাতেই দেখলুম, সবুজ ঘাসবনের মধ্যে কাঠের বেড়া দেওয়া ভেড়াওয়ালাদের কুটিরের মত কি একটা দেখা যাচ্ছে।

সামি আর মিতুর সঙ্গে আমিও চললুম। সঙ্গে এক পাল ছেলেমেয়ে। কিছু উঠেই একটা বেড়ার কাছে এলুম, তার মধ্যে খান চল্লিশ নধর ভেড়া। দুজন রাখাল আর তাদের সঙ্গে একটি রাখাল-বালক। এক একটা করে ভেড়া ধরছে আর তার দুধ দুয়ে নিচ্ছে। বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে আমরা দেখলুম। অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে সব দুধ দোওয়া হয়ে গেল। রাখাল তখন ছেলেমেয়েদের নিমন্ত্রণ জানালো—এসো আমাদের ঘরে।

এর জন্যেই বোধ হয় শিশুর দল অপেক্ষা করছিল। একটা খুশির কলকল ধ্বনি উঠল। তারপর সবাই চললো রাখালদের পিছু

পিছু। একটু উপরে উঠে রাখালদের ছোট্ট কুটিরটি। চমৎকার লোমওয়ালা এক কুকুর দরজায় বসে পাহারা দিচ্ছে। রাখালরা ঘরে ঢুকে প্রথমে কেরোসিনের বাতি জ্বালালো, তারপর আমরা ভিতরে ঢুকলুম। ছোট্ট ঘরটির মধ্যে দু-জোড়া দোতলা বিছানা। মাঝখানে একটুখানি ফাঁক। তিনটি বিছানায় তিনজনে শোয় আর চারেরটায় তাল তাল সাদা রংয়ের ভেড়ার দুধের ছানা একটার পাশে আর একটা সযত্নে সাজানো। একেকটা তাল মানুষের মাথার দ্বিগুণ। ছানার তাল নিয়ে এরা শুয়ে থাকে। গ্রাম এদের অনেক দূরে। মিষ্টি ঘাসের আকর্ষণে এখানে বাসা বেঁধেছে। সারা গ্রীষ্ম এইখানেই কাটায়, আর সবুজ ঘাসের উপর ভেড়াগুলোকে চরায়। সন্ধেবেলায় দুধ দোয় আর ছানা তৈরি করে। এদের কাছ থেকে ছানা কিনে নেয় আর এক দল বাচা। তারা এর থেকে তৈরি করে চীজ। শীত পড়লেই এখানকার পাট তুলে দিয়ে ভেড়ার পাল নিয়ে এরা গ্রামে ফিরে যায়।

দু'হাতে জাপটে ধরে একটা গোল্লা তুলে নিয়ে প্রকাণ্ড একটা ছুরি দিয়ে চাকা চাকা করে কেটে ছেলেমেয়েদের হাতে দিতে লাগল রাখাল। এক পেট ডিনার খেয়ে আসবার পরেও ছেলেমেয়েরা, সেই সঙ্গে লামি আর মিতু, দেখলুম বেশ আরও এক পেট ভেড়ার দুধের ছানা খেয়ে নিল।

চের্টোভিৎসা গ্রামে রাতের অন্ধকার নেমে এল।

॥ ৩২ ॥

পরদিন খুব ভোরেই আমরা উঠলুম। ঘুমোতে যাবার আগে ম্যাপ দেখে ঠিক করে রেখেছিলুম, সারাদিন হেঁটে ডবশিনা গুহার কাছে পৌঁছতে হবে। ডবশিনা শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে—এটি একটি বরফের গুহা। গুহার মধ্যে সারা বছরই শূন্যের নীচে পাঁচ

থেকে দশ ডিগ্রি শৈত্য। তার ফলে গুহার মধ্যকার দেয়াল আর ছাদ দিয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে পড়া সমস্ত জল জমে বরফ হয়ে থাকে। সেই বরফের নানা বিচিত্র আকৃতি। দেশবিদেশ থেকে ভ্রমণকারীরা দেখতে আসেন।

এক রাতের মধ্যেই অনেক বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। সবাই সকাল সকাল উঠেছিলেন। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। অনেকে বনের সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন আমাদের সঙ্গে। হানা, হন্‌সা আর তাদের বাপ-মা আরও খানিকটা এগিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁরা বললেন—বনের মধ্যে 'বাচা'দের একটা বড় আস্তানা আছে, সেখানে তারা চীজ তৈরি করে। তারই একটা গোলা আপনাদের রুকস্যাকে ভরে দেব।

ঘণ্টা দেড়েক চলবার পর পাওয়া গেল বাচাদের কুটির। ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলুম ছোট ছোট খরমুজের আকৃতির চীজ প্রচুর পরিমাণে মাচার উপর সাজানো। ছানা থেকে কেমন করে যেন তার মধ্যে ধোঁয়ার গন্ধ ঢুকিয়ে দিয়ে এই গোল গোল চীজ এরা তৈরি করে। যেমন তার গন্ধ, তেমনি স্বাদ। আমরা একটা কিনে রুকস্যাকে ভরলুম। হানার বাবা আরেকটা নিয়ে লামির রুকস্যাকে ভরে দিলেন, ছাড়লেন না। তার পর তাঁরা বিদায় নিলেন। আমরা নিজেদের পথে চললুম। দীর্ঘ উঁচু নীচু বনের পথ—একবার ফাঁকায় আসি, আবার বনের মধ্যে ঢুকে যেতে হয়। পথ নামতে নামতে প্রায় সমভূমির কাছে এসে পড়ল। একটি স্বচ্ছ-সলিলা ছোট নদী পাওয়া গেল। দূরে দেখা গেল গ্রাম। নদীর ধারে রুকস্যাক নামিয়ে নদীর জল ফুটিয়ে সুপ রান্না করে নিলুম।

বেন্নুশ গ্রামে গিয়ে যখন পৌঁছলুম তখন বিকেল হয়ে গেছে। এখান থেকে ট্রেনে করে সামান্য পথ ডবশিনা গুহা অবধি। সেখানে পৌঁছে দেখলুম বিষম যাত্রীর ভিড়। একটি বড় হোটেল আর একটি ছোট হোটেল কিন্তু কোনোটিতেই তিল ধারণের জায়গা নেই।

হোটেলওয়ালাকে বললুম—তবে কি করা যায় বলুন। আমরা এখানেই রাত কাটাতে চাই।

তিনি বললেন—এক কাজ করুন। ঐ সাঁকো দিয়ে নদীটা পার হয়ে ওপারে যান। ঐ যে দু-পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা দেখছেন ঐ ধরে কিছু দূর গেলেই একটা নতুন কলোনি পাবেন। নতুন নতুন বাড়ি এবং কুটির তৈরি হয়েছে সেখানে অনেক। আমার বিশ্বাস সেখানে জায়গা পাবেন। স্থানটিও সুন্দর।

ঘন বনের নীচে নতুন কলোনিটি ছবির মত। প্রথম বাড়িতে ধাক্কা দিতে বাড়ির কর্তা বললেন—এই একটু আগে দু-জন অতিথিকে নিয়েছি। দ্বিতীয় বাড়িতে ধাক্কা দিতে বাড়ির গিন্নী বেরিয়ে এসে বললেন—নামান আপনাদের রুকস্যাক।

হোটেলের চেয়ে এক-শ গুণ ভালো হল। আশপাশও কী সুন্দর। এখান থেকে দশ কিলোমিটার দূরে নদীতে প্রকাণ্ড এক বাঁধ দিয়েছে বিজলী শক্তি উৎপাদন করবে বলে। নদীর ধারে যে গ্রাম ছিল তাকে ভাসিয়ে দিতে হয়েছে। সেই গ্রামের বাসিন্দাদের এইখানে জমি দেওয়া হয়েছে, টাকা ধার দেওয়া হয়েছে নতুন বাড়ি করার জন্যে। তারই ফলে কলোনি। এখানকার বেশীর ভাগ গৃহস্থই নিকটস্থ লোহার খনিতে কাজ করেন। খনির বাস্‌এ করে যাওয়া আসা করেন রোজ।

শ্রীমতী হর্কা বললেন—আমার স্বামীর খনি থেকে ফেরবার সময় প্রায় হয়ে এল। তাঁর রাত্রির রান্না চড়াবো এবার। তা, আপনাদের খাওয়া দাওয়া হয়েছে কি ?

আমরা বললুম—খাই নি। এখান থেকে হোটেলে গিয়ে খেতে ইচ্ছেও করছে না। আপনার এখানে কিছু পাওয়া যাবে না কি ?

—আমরা চাষী মজুর মানুষ। ক্ষেত থেকে আলু তুলব। ঘরে বেকন্ আছে, ভাজব। আর গরুর দুধ দুয়ে আনব যত দরকার। বাস্ এ ছাড়া আর কিছু নেই।

আমরা বললুম—এর থেকে ভাল খাদ্য আর কিছু হতেই পারে না। নিন, আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে আমাদেরও আলু চড়িয়ে দিন। আমরা হাত-মুখ ধুয়ে আসছি।

বাড়িতে একটা চাপা-কল ছিল। কিন্তু বনের ধারে গাছ-তলায় দেখলুম একটা ঝরনা। সেখানেই গেলুম আমরা তোয়ালে কাঁধে। ঝরনাতলা থেকে ফিরে এসে দেখি বাড়ির কর্তা হাজির। বাড়ির গায়েই আলুর ক্ষেত। সেখান থেকে টাটকা আলু তুলে গরম জলে ফোটানো হচ্ছে। প্রকাণ্ড একজগ দুধ। কাঠের বারকোশে এক চাংড়া বেকন্ নিয়ে কাটতে বসেছেন হর্কা-গিন্নী। এই হল এদের সাদাসিদে খাবার। এই খেয়েই এরা তৃপ্ত। স্বাস্থ্য দেখলে হিংসে হয়। সুখী সংসার। স্বামী খনিতে খাটেন, স্ত্রী খেতখামার, গরুর সেবা, হাঁস পালা, দুধ দোওয়া, মাখন তোলা, কাপড় কাচা আর সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে আছেন। আর অতিথি এলে অতিথি সৎকার। ঐতেও সামান্য কিছু আয় বাড়ে সংসারের। আমাদের যত্নের ত্রুটি হল না।

পরদিন সকালে উঠে আর একবার ঝরনার ঠাণ্ডা জলে হাতমুখ ধুয়ে হর্কাদের টেবিলে বসে গরম কফি খেয়ে তৈরি হলুম আমরা যাত্রার জন্যে। বরফের গুহার কাছে গেলুম। গৃহিণীর আর আমার এ গুহা আগেই দেখা ছিল ; লামি আর মিতু কখনো বরফের গুহা দেখেনি—ওরাই ঢুকলো। আমি গুহার বাইরে একটা ঢাকা দেওয়া প্রকাণ্ড বারান্দার নীচে বসে রইলুম। গৃহিণী কিছু বাজার করতে গেলেন।

রুকস্যাক থেকে টেনে একটা সচিত্র পত্রিকা বার করতে যাচ্ছি হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠল—পান্ গাংগুলি না ?

আমি অবাক হয়ে পিছন ফিরে দেখলুম একজন সম্পূর্ণ অচেনা লোক। অপ্রস্তুত হয়ে বললুম—আমিই।

ভদ্রলোক বললেন—আমার নাম রাৎসেক। বহু বছর আগে আপনাকে এখানে দেখেছিলুম। ওঃ সে কত কাল হয়ে

গেল। আশ্চর্য, আপনার চেহারা বিশেষ বদলায় নি—বেশ চেনা যায়।

আমি অবাক হয়ে বললুম—অনেক অনেক বছর আগে এখানে একবার গুহা দেখতে এসেছিলুম বটে। তখন আমি ছেলেমানুষ—কলেজের ছাত্র। তখন থেকে আমায় চিনে রেখেছেন? নামও মনে রেখেছেন?

—হ্যাঁ, আপনি আমার দোকানে তরকারি, ফল আর পাঁউরুটি কিনতে এসেছিলেন। ঠিক আজকের দিনেরই মত পিঠে রুকস্যাক ছিল, পরনে হাফপ্যান্ট। আমার মেয়ে আপনার অটোগ্রাফ চাওয়ায় আপনি তার খাতায় সই করে দিয়েছিলেন।

—আশ্চর্য মনে আছে তো? তাহলে আপনার এখানে দোকান ছিল?

ঘাড় নীচু করে রাৎসেক বললেন—তা, ছিল একটা।

—এখন আপনি কি করেন?

—দোকান দেখি এখনও, তবে দোকান তো আর আমার নয়—পৌরসংস্থার।

—বুঝলুম। দেশের সর্বত্র যেমন ব্যবস্থা। নিজস্ব দোকান বলে তো আর আজকাল কিছু নেই? না আছে?

—একদম নেই।

—থাকলে কেমন হত বলুন তো?

—বলি তাহলে। বড় বড় দোকান, যেখানে মেলা মাইনে করা চাকর খাটত, তাদের জাতীয়করণ করা হল তার একটা মানে আছে। কিন্তু আমার মতো ছোট দোকান যাতে আমি আর আমার স্ত্রী খাটতুম, সামান্যই রোজগার করতুম, সেগুলি পৌরীকরণ না করলে কি চলত না?

—কেন, আপনার রোজগার কিছু কম পড়েছে?

—মোটেই না। মাইনে পাই, তা ছাড়া বিক্রির উপর কমিশান আছে। এ ছাড়া স্ত্রী-ও চাকরি করেন। সংসারের আয় আগের

চেয়ে বেশী। ছেলেপিলের পিছনে বিশেষ খরচ নেই। তাহলেও—

—তাহলে কি?

—নিজের দোকান যখন হাত-ছাড়া হয়ে গেল, মনে হল বসত-বাড়ি থেকে যেন ঘাড় ধরে বার করে দিলে। তারপর সেই দোকানে মন বসাতে অনেক সময় লেগেছে দাদা।

—বলেন কি, এত টান?

—নিজের হাতে যদি দোকান গড়তেন তো বুঝতেন। আপনি তখন ছাত্র ছিলেন বলছিলেন, এখন কি করা হয়?

জবাব দিতে যাবো এমন সময় ছেলেমেয়ে গৃহিণী সবাই এক সঙ্গে এসে হাজির হলেন। রাৎসেকের সঙ্গে সবার আলাপ করিয়ে দিতেই গৃহিণী ব্যস্ত হয়ে বললেন—এখনি একটা বাস ছাড়চে কিন্তু। পরেরটায় গেলে ভীষণ দেরী হবে।

আমরা বাস ধরতে ছুটলুম।

॥ ৩৩ ॥

সেদিন সারাদিনই প্রায় বাসে কাটল—একটা বাসের পর আর একটা। গন্তব্য আমাদের দক্ষিণ স্লোভেকিয়ার এক মালভূমি—হাঙ্গারির সীমার কাছে। শুনেছিলুম এই সিলিৎসা মালভূমি হেঁটে বেড়াবার পক্ষে খুবই উপযুক্ত জায়গা। ম্যাপে দেখা যায় মালভূমির স্থানে স্থানে অগম্য সব গুহা। আর একটি পাইপ লাইন গেছে এই মালভূমির পৃষ্ঠ দিয়ে সোভিয়েট দেশ থেকে হাঙ্গারি পর্যন্ত।

শেষ খেপের বাসে বেজায় ভিড়। সবাই বসবার জায়গা পেয়েছে, শুধু আমিই পাই নি। ড্রাইভারের পাশে রড ধরে দাঁড়িয়ে আছি, একজন উঠে জায়গা ছেড়ে দিল। বছর বাইশের একটি ছেলে। বারণ শুনল না কিছুতেই। হাত ধরে টেনে বসিয়ে তবে ছাড়ল। বললে—বিদেশী দাঁড়িয়ে যাবেন, এ হয় না।

ছেলেটি আলাপী। এই সব অঞ্চলে যে বাস চলে তারই ড্রাইভার। বাড়ি ফিরছে। যখন শুনলে আমাদের সিলিৎসা মালভূমিতে হাঁটবার পরিকল্পনা, বললে—তাহলে সিলিৎসা গ্রামে চলে আসবেন, ঐখান থেকেই হাঁটা শুরু করার সুবিধে। লামি গুহার কথা বলতে বলল—গ্রামে এসে আমার খোঁজ করবেন, আমি সব গুহা চিনি, নিয়ে যাবো। 'গেজা' আমার নাম—গেজা ভোডা বললেই লোকে বাড়ি চিনিয়ে দেবে।

আমাদের বাস এসে দাঁড়াল রশ্‌নভা শহরে। এইখানেই বাস-যাত্রা শেষ। এইখানেই আমাদের রাত কাটাবার আস্তানা খুঁজতে হবে। গেজা বিদায় নিয়ে অন্য বাসে করে চলে গেল তার গ্রামে। শুনেছিলুম এখানে এক যাত্রী-আবাস আছে—চললুম তারই খোঁজে। কিন্তু পৌঁছে শুনলুম সমস্ত জায়গা ভর্তি হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। শহরে হোটেল ছিল দু-একটা। কিন্তু নিতান্ত দায়ে না পড়লে হোটেলে থাকতে আমরা নারাজ—তার চেয়ে যাত্রী-আবাস বা যাত্রী-কুটির ভালো—অনেক বেশী ঘরোয়া। কাছাকাছি পাহাড় অঞ্চলে কি রকম জায়গা আছে খোঁজ করতে গিয়ে শুনলুম দশ বারো কিলোমিটার দূরে 'গোম্বাসেক' নামে একটি সুন্দর ক্রাপনিকের গুহা—সেখানে আছে যাত্রী-কুটির। তবে জায়গা পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে কেউ কিছু বলতে পারলেন না।

কুছ পরোয়া নেহি, বলে আমরা এক বাসে চড়ে বেরিয়ে পড়লুম। অন্ধকার হয়ে আসছিল—রাত্রির আস্তানা খুঁজতে আর দেরি করলে বিপদে পড়ব—অতএব গোম্বাসেকেই আমাদের জায়গা চাই। বাস থেকে নেমে মিনিট কুড়ি হেঁটে ঠিক সন্ধ্যের মুখে গোম্বাসেক কুটিরে এসে পৌঁছলুম। জায়গাটি অতীব সুন্দর, কিন্তু পৌঁছেই শুনলুম, প্রকাণ্ড একদল কারখানার শ্রমিক আসছে রাতভর নাচ গান করতে—তারা সমস্ত ঘর বুক করে রেখেছে। সুতরাং জায়গা নেই।

আমরা বললুম যারা সারা রাত নাচবে গাইবে তাদের আবার

ঘুমোবার জন্যে বিছানা লাগে নাকি? সব ঘরই তো খালি পড়ে থাকবে।

কুটিরকর্তা বললেন—যত ঘর আছে তার অন্তত চারগুণ লোক আসছে। তাদের এক এক অংশ দু-তিন ঘণ্টা বিছানায় গড়িয়ে নিলেও তো সব বিছানায় কুলোবে না।

আমরা বললুম—শেষ বাস চলে গেছে। এখান থেকে বেরবার আজ আর উপায় নেই। তা ছাড়া চারিদিকেই তো দেখছি জঙ্গল। যাই কোথা?

—যাবেন আবার কোথায়? বসুন। তার উপর তো দেখছি বিদেশী। হাত মুখ ধোন, মুখে কিছু দিন, তার পর দল এসে পড়লে দেখি কি করতে পারি।

আমরা খেতে খেতে দু লরি বোঝাই কারখানার দল এসে গেল, সঙ্গে তাদের বাজনদার। সেদিন ছিল শনিবার। কারখানার ছুটি হতেই সবাই চলে এসেছে শনিবারের রাত্রি কাটাতে, ফুর্তি করতে। শুরু হয়ে গেল হইচই। কুটির কর্তার আর টিকি দেখা যায় না। শেষে বসে বসে যখন প্রায় ঘুম এসে গেছে সেই সময় কর্তা এসে বললেন—চলুন আপনাদের বিছানা তৈরি। আমার দিদি যে ঘরে থাকেন সেই ঘরটা ছেড়ে দিচ্ছি। দিদি এতক্ষণেও যখন ফেরেন নি, আজ আর ফিরবেন না।

দিদির ঘরে ঢুকে দেখলুম দেয়ালের গাঁয়ে সারি সারি তাক। তাকের উপর কাঁচের বয়েম থরে থরে সাজানো। তার মধ্যে চিনির রসে ডোবানো আপেল, নেসপাতি, চেরি, প্লাম, রাস্পবেরি, গুজবেরি প্রভৃতি। বুঝলুম দিদিটি বেশ গোছানো। কিন্তু ঐ নিয়ে ভাববার বা লোভ করবার আমাদের সময় ছিল না। কাপড় ছেড়ে বিছানার মধ্যে সেই যে শুয়ে পড়লুম, রাত তিনটে পর্যন্ত ঢপ্-ঢপা-ঢপ্ ড্রামের শব্দ আর টুং-টাং সিম্বালের শব্দ আসা সত্ত্বেও অঘোরে ঘুমলুম। ভোরের আগে চোখ খুললুম না।

গোম্বাসেক গুহা দেখলুম পরদিন। এটি ছোট গুহা, কিন্তু এমন রংয়ের বাহার বুঝি কোথাও নেই। খয়েরি আর হলদে সরু সরু পাইপের মতো ক্রাপনিক কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে মাটি পর্যন্ত।

বৃষ্টি, অঝোরে বৃষ্টি। গুহা দেখে যে বেরিয়ে পড়ব তার উপায় নেই। অগত্যা বৃষ্টি থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। দুপুরের খাওয়ার পর বৃষ্টি থামলে আমরা বেরলুম। আজ হেঁটে সিলিৎসা গ্রামে পৌঁছতে হবে। জায়গাটা অজ গাড়াগাঁ। হোটেল নেই, যাত্রী-আবাস নেই, তা ছাড়া গ্রামের বাসিন্দারা কেউ চেক্ নয়, সব হাঙ্গেরিয়ান—আমাদের কথা কিছুই বুঝবে না। তবু দেখা যাক ঐখানেই আজ রাত্রির আবাস পাওয়া যায় কি না। আমাদের ভরসা বাসে আলাপ হওয়া সেই ড্রাইভার—গেজা ভোডা যার নাম। সিলিৎসায় যার বাড়ি!

ভিজে বনের মধ্যে দিয়ে এক প্রকাণ্ড পাহাড় টপকে হাজির হলুম আমরা এক বিস্তৃত মালভূমির প্রান্তে। এই হল সিলিৎসার মালভূমি। একটু এগিয়েই সিলিৎসা গ্রাম পাওয়া গেল। গ্রামের এক প্রান্তে গেজার বাড়ি। দোতলা বাড়ি—খোলা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে হয়। সিঁড়ির উপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল গেজার দুই সুন্দরী বোন। আমাদের দেখে অবাক। গেজাকে চিনি শুনে মহা উৎসাহে ছুটল একজন দাদাকে তাসের আড্ডা থেকে ডেকে আনতে। আর একজন ঘরের মধ্যে আমাদের বসিয়ে পাঁউরুটি মাখন আর চাক-ভাঙা মধু এগিয়ে দিল।

গেজা ভোডা এসে পৌঁছতে আমরা বললুম—গেজা ভাই, আজ রাত্রে এই গ্রামে থাকার আমাদের একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ইস্কুল বাড়ি নিশ্চয় আছে, সেখানে পড়ে থাকতে পারি। অথবা কারুর মাচায় বিচালির উপর শুয়ে থাকার ব্যবস্থা যদি করে দাও, তা-ও আমাদের অভ্যেস আছে। চমৎকার লাগে আমাদের সেনোয় শুতে।

সেনো মানে বিচালি।

গেজা বললে, মাচায় শুতে আপনাদের কষ্ট যদি না হয় তাহলে আমাদেরই তো পুরু টাটকা সেনো বিছানো মাচা আছে। কটা কম্বল দিয়ে দেব—হয়ে গেল।

বাস্, রাত্রিবাসের সমস্যা মিটে গেল।

তারপর আমরা বাস-ড্রাইভার গেজার সঙ্গে গুহা দেখতে চললুম। বোন-দুটিও চলল আমাদের সঙ্গে। এক গেজাই চেক্ জানে ভালো, আর সব হাঙ্গেরীয় ভাষা। গ্রামের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে কেবলই হাঙ্গেরীয় কথা কানে আসতে লাগল। এক বর্ণও বুঝলুম না।

গভীর বনের মধ্যে লুক্কায়িত গুহা। পথ জানা না থাকলে গ্রামের লোকের পক্ষেও খুঁজে বার করা কঠিন। তা ছাড়া বেমক্কা এখানে ঘুরতে আসাতেও বিপদ আছে। হঠাৎ না-জেনে কোথায় পা পড়ে যাবো আর মাটি ধ্বসে গুহার মধ্যে হবে সমাধি। গুহার মুখে নিয়ে এসে গেজা বললে—দেখুন একবার নীচের দিকে তাকিয়ে। পাথর আঁকড়ে ধরে আমরা তাকালুম—যেন পাতালপুরী। গেজা বলল—যুদ্ধের ঠিক পরেই একজন রুশ সৈনিক এর মধ্যে পড়ে মারা যায়। সে গুহামুখের ঐ দিকটায় ঘুরছিল। ওদিক থেকে গর্তটা একেবারেই দেখা যায় না—মনে হয় সামনে সমতল ভূমি।

পাথর টপকে নামলুম গুহার মধ্যে—একটিমাত্র দিক দিয়েই নামা যায়। নীচে নেমে দেখলুম প্রচণ্ড শীত—গুহার দেয়ালে এবং মেঝেতে চাংড়া চাংড়া বরফ। এটিও বরফের গুহা। সাহসী পর্যটকরা এর মধ্যে ঢুকে দু কিলোমিটার অবধি ভেদ করেছেন ইতিমধ্যেই। বেশ চওড়া পথ আছে ভিতর দিয়ে। কিন্তু যা শীত!

আমি বললুম—আমার শীত করছে, আমি আর যাব না।

লামির আর মিতুর শীত নেই। তারা টর্চ হাতে গেজার সঙ্গে গুহার অন্ধকারে প্রবেশ করল। আমরা বাইরে রইলুম। গেজার

বোনরা ও শীতের ভয়ে রয়ে গেল। তারা ভাঙা ভাঙা যা চেক জানে তাই দিয়ে কথাবার্তা চালালো। বুঝলুম একজন স্কুলের পড়া শেষ করে এক আপিসে ঢুকেছে কাজে, আর ছোটটির স্কুলের পড়ার শেষ বছর।

—স্কুলের পড়া শেষ হলে কি করবে তুমি? দিদির মতো চাকরি করবে নাকি?

—আর্ট কলেজে ভর্তি হব। ঐদিকেই আমার ঝোঁক।

—তার পর?

—তার পর কুটির-শিল্পের কারখানার ডিজাইনার হব।

লামিরা গুহার মধ্যে থেকে ফিরে এসে বললে—বিজলীর লাইন পাতা সিঁড়িপাতা ঝক্‌ঝকে ডব্‌শিনা গুহার চেয়ে এই নামহীন গোত্রহীন বরফের গুহা অনেক বেশী মজার।

গেজাদের বাড়ি ফিরে এসে দেখি গেজার মা রাতের খাবার সাজিয়ে বসে আছেন। গেজার বাবাও এলেন একটু পরে। দুজনের একজনও চেক্‌ভাষার এক বর্ণও জানেন না।

খাবার টেবিলে গেজার সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ কি এক আলোচনা চলছিল বাপ-মার। বার বার আমাদের দিকে তাকানোর ফলে বুঝলুম আমরাই হচ্ছি বিষয়। অবশেষে গেজা জিজ্ঞেস করলেন—

—আজ্ঞে আপনি কি করেন? আপনার পেশাটা কি?

আমার আবার অনেক রকম পেশা। বিদেশে এই প্রশ্ন উঠলে যখন যা পারি জবাব দিই। এ ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু না ভেবেই বললুম—পড়াই।

—পড়ান? মানে কোথায় পড়ান? প্রোফেসার না কি?

—হ্যাঁ, প্রোফেসার।

বুড়ো বাপ মার মুখ হাঁ হয়ে গেল। আবার চললো কি সব আলোচনা পরামর্শ।

কিছুই বুঝতে পারলুম না। প্রোফেসার হলে আলোচনা বাড়ে

কেন, এ রহস্যের সমাধান হল যখন খাওয়ার শেষে গেজা ঘোষণা করলে যে আজ আমাদের বিচালির বিছানার বদলে গেজাদের স্প্রিংয়ের বিছানায় শুতে হবে। আমরা ঘোরতর আপত্তি তুললুম, কারণ উপযুক্ত মূল্য নিলেও কথা ছিল, কিন্তু এদের যা ব্যাপার দেখছি, বোঝা যায় এর জন্যে ওরা এক পয়সাও নেবে না আমাদের কাছ থেকে। কিন্তু কে শোনে কার কথা! প্রোফেসার এবং প্রোফেসারের পরিবারকে সিলিৎসা গ্রামের অতিথি হিসেবে বিচালির বিছানায় কিছুতেই শুতে দেওয়া যায় না।

অগত্যা স্প্রিংয়ের বিছানাতেই শুতে হল এবং এই হঠাৎ-চেনা প্রায়-অজানা বাস-ড্রাইভারের আতিথ্য আমাদের মনে চিরদিনের জন্যে গাঁথা হয়ে রইল।

॥ ৩৪ ॥

পরদিন সকালে উঠে গেজাকে আর পেলুম না। ভোরেই বেরিয়ে গেছে বাস চালাতে। বোনদের বলে দিয়ে গেছে আমাদের পথ দেখিয়ে এগিয়ে দিতে। বোনেরা ব্রেকফাস্ট খাওয়ালো। রুকস্যাক পিঠে তুলে দিল আমাদের। তারপর সঙ্গে এলো রাস্তা দেখিয়ে দিতে। এখান থেকে সমস্ত মালভূমি পার হয়ে গেলে মাল-ভূমির নীচে 'ডমিৎসা' নামে এক গুহার কাছে পৌঁছান যায়। এই হল আমাদের গন্তব্য পথ।

মালভূমির উপর দিয়ে গেছে এক বিখ্যাত পাইপ-লাইন—দু হাজার কিলোমিটার লম্বা। সোভিয়েটের উক্রাইন দেশে এর আরম্ভ, স্লোভে-কিয়ার উপর দিয়ে গিয়ে হাঙ্গারিতে শেষ। হাঙ্গারির প্রয়োজন পেট্রোলের। দেশে তেলের খনি নেই। রিফাইনারিও নেই। উক্রাইনে আছে পেট্রোলের খনি। স্লোভেকিয়ায় আছে রিফাইনারি। তিন দেশ মিলে পরামর্শ করল—পাইপ ফেল। উক্রাইন থেকে পাম্প্

করে কাঁচা তেল পাঠাতে লাগল ব্রাটিস্লাভায়। সেখানে তেল-শুদ্ধি হয়ে পেট্রোলরূপে তা পৌঁছতে লাগল হাঙ্গারিতে। অন্য যে কোন উপায়ে হাঙ্গারিতে পেট্রোল চালান দিলে পাঠানরই যা খরচ পড়ে যেত এ হল তার এক ভগ্নাংশ। কাঁচা তেল বেচে সোভিয়েট করল কিছু আয়; সেই তেল রিফাইন করে চেকোস্লোভেকিয়া করল আরো কিছু আয়; সেই তেল কিনে হাঙ্গারির হল কিছু সাশ্রয়। কেউ কাউকে ঠকাল না, কেউ কারুর গলা কাটল না, সমাজতন্ত্রী দেশগুলো এইভাবে আজকাল বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করার দিকে খুব এগিয়ে যাচ্ছে। এই পাইপ লাইন নিয়ে এদের প্রচুর গর্ব।

গেজার বোনেরা আমাদের এই পাইপ লাইনের কাছে এনে ফেলল। বন কেটে মাটি খুঁড়ে বসানো হয়েছে এই দীর্ঘ পাইপ। পাথর দিয়ে চাপা দেওয়া। পাশ দিয়ে পায়ে চলা রাস্তা। বোনেরা বলল—এই পাইপ ধরে চলে যান যতদূর পারেন। যেখানে মালভূমি শেষ হয়েছে সেইখানেই ডমিৎসা। বলে তারা বিদায় নিল।

চারিদিকটা দেখলে মনে হয় যেন একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপের পিঠ। যেদিক দিয়েই হোক, চলতে আরম্ভ করলে পৌঁছান যাবে গিয়ে কচ্ছপের পায়ের কাছে। পাথর! পাথর! পাথর! আর তার মাঝে জুনিপারের বন! জুনিপারের কাঁটাওয়ালা পাতার মধ্যে থেকে তার গাঢ় নীল ফল তুলে মুখে ফেলে চিবতে চিবতে আমরা চললুম। কোথাও কোনোদিকে মানুষের চিহ্ন নেই, মাঝে মাঝে শুধু দু একটা গরু বা ছাগল চোখে পড়ে। কি খাবার জন্যে তারা এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে বুঝতে পারি না। জায়গায় জায়গায় সোনালী জিভিস্না ফুলের ঝোপ। মরুর ছবির সঙ্গে এই সোনালী ফুলগুলি মানায় ভালো। তুলে নিলুম কিছু। এদের শুকিয়ে নিয়ে এক রকম চা বানানো যায়।

পথে জল নেই বলে খেতে বসতে পারা যায় নি কোথাও। কচ্ছপের পিঠটা যেখানে শেষ হচ্ছে সেখান থেকে নীচে তাকিয়ে দেখলুম একটি

ছোট্ট মনোহর নদী নুড়ি ঠেলে লাফাতে লাফাতে চলেছে। নেমে গিয়ে নদীর ধারে বসলুম। গা হাত পা ধুয়ে নিলুম সবাই; তারপর জল তুলে এক পাত্র সূপ চড়িয়ে দিলুম স্পিরিটের উনুনে।

নদীর ধারে একদল দাড়িওয়ালা ছাগল জটলা করছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে হঠাৎ কোথায় তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। আশ্চর্য লাগল ব্যাপারটা। এই ছিল, গেল কোথায়? মিতু আর আমি উঠলুম তদন্ত করতে। নদীর স্রোত উজিয়ে কিছুটা গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড একটা গুহা প্রায় এক মানুষ উঁচু। গুহার মধ্যে থেকে ঝর্ণার রূপে বেরিয়ে আসছে নদীটা, আর তার ভিতরে আশ্রয় নিয়েছে ছাগলের বাহিনী। অন্ধকার গুহার মধ্যে থেকে তাদের দাড়িগুলি বেশ দেখা যাচ্ছে। ঠিক যেন সিংগির মামা ভোম্বলদাস।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ডমিৎসা গ্রামে এসে পৌঁছলুম। এইখানেই হাঙ্গারির সীমানা। ডমিৎসা নামে ক্রাপনিকের যে বিখ্যাত গুহা এখানে, তার অর্ধেকটা চেকোস্লোভেকিয়ায়, বাকী অর্ধেকটা হাঙ্গারিতে। মাটির নীচে দিয়ে যে গহ্বর গিয়েছে তা ধরে খানিকটা গেলেই একটা বেড়া পাওয়া যায়, তার গায়ে লেখা—ওপারে হাঙ্গারি। পাতালপুরীর সীমান্ত-রেখা।

সারাদিনের হাঁটন শেষ হল। এই তো মাত্র ক'দিন ধরে হাঁটছি অথচ মনে হচ্ছে যেন কত কাল হয়ে গেল। পায়ে হাঁটার ঐ মজা। পথ ঘর হয়ে যায়। সেই যে মানবসভ্যতার ওপারে যখন পথই মানুষের সত্যিকারের ঘর ছিল, তখনকার দিনে টেনে নিয়ে যায়। মনে হয় সেইদিন থেকেই আমাদের হাঁটা শুরু হয়েছে, এখনও চলেছে।

হাঁটার সুখ চেকোস্লোভাকিয়ায়। নিত্য নতুন ছবি, নতুন পরিবেশ, নতুন অভিজ্ঞতা। আর সবটাই চেখে চেখে খাওয়ার মতো। চেক্‌রা খুশী হয় আমাদের হাঁটতে দেখলে। প্রাণ-মন খুলে ধরে—অপরিচয়ের বাধা নিমেষে কেটে যায়। মোটারে করে ঘুরলে কি আর তা হয়? মোটার-যাত্রীদের খাতির করে চেক্‌রা, খানিকটা ভয়ও করে হয়তো,

কিন্তু তাই বলে কি তাদের কাছে চট করে আপন হয়ে যেতে পারে ? তা পারে না —দূরত্ব থেকেই যায়।

হেঁটে এবার তাই বড় আনন্দ পেলুম। এর আগে যেবার চেকোস্লোভেকিয়ায় হেঁটেছিলুম তার চেয়েও বেশী আনন্দ। এর আগেরবার রুকস্যাক নিয়ে পাহাড়ে এবং গ্রামাঞ্চলে হেঁটে চেক মানুষদের নিকটতম হয়ে চেকোস্লোভেকিয়ার অন্তরে প্রবেশ করেছিলুম বলে আমার ধারণা। সে এক বিশিষ্ট অন্তর্দেশ। সমাজের মধ্যে তখন শ্রেণী বিভাগ ছিল। আমি হেঁটে গিয়ে যে অন্তর্দ্বারের মধ্যে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলুম তা ছিল উচ্চশ্রেণীর, মধ্যশ্রেণীর। গুরুত্বপূর্ণ হলেও সংখ্যালঘিষ্ঠ। এবারে প্রবেশ করলুম অন্তরতম হয়ে সারা দেশের মধ্যে। এ যেন সমুদ্রে অবগাহন। সারা সমুদ্রকে নিজের করে নেওয়া।

॥ ৩৫ ॥

কিন্তু হাঁটার দিন আমাদের শেষ হয়ে এল। ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। স্লোভাকিয়া থেকে ফিরতে হবে প্রাহায়। প্রাহা থেকে কলকাতা। আর হাতে ক'টা দিনই বা আছে ? এ ক'টা দিন স্লোভাকিয়ার পূর্ব অংশ গিয়ে আমাদের হাঁটন পর্ব শেষ করতে চাই। তাই ডমিৎসার কাছাকাছি এক জায়গায় রাত কাটিয়ে পরদিনই গেলুম ছুটে সেই দিকে।

অদ্ভুত অপূর্ব পর্বতশ্রেণী। উচ্চ তাতরার এই হচ্ছে পূর্বতম অংশ। নাম 'বিলানস্কি তাতরা'। এর সৌন্দর্যের তুলনা নেই। যেমন বন্য তেমনি নিখুঁত। প্রস্তর শোভায়, হ্রদ শোভায়, ফুলের শোভায়, ঝর্ণার ঝরঝরে, রোদের আমেজে প্রতিটি পদক্ষেপ পরিপূর্ণ। জীবনের এত বড় উপভোগ সহসা মেলে না। বিলানস্কি তাতরার কোলে সর্বাঙ্গীনভাবে নিজেদের নিক্ষেপ করলুম। মেতে রইলুম ঐ নিয়েই।

সারাদিন বুনো মানুষের মত পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরতুম, সন্ধ্যায় নেমে আসতুম এক সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় এক চাষীর বাড়িতে। ঐখানেই আমাদের আস্তানা হয়েছিল। সেই কুটিরে একদল বুদ্ধিজীবী কেমন করে জানি না, একত্র হয়েছিলেন। ব্রনো থেকে এসেছিলেন এক বটানিস্ট, প্রাহা থেকে এক ডাক্তার, পিল্‌সেন থেকে ভাষাতাত্ত্বিক, অলমৌৎস্ থেকে লেখক, কশিৎ্স থেকে মাস্টারমশায়। সবাই এসেছেন এই অপূর্ব স্থানটিতে অন্তরঙ্গভাবে হাঁটতে। সরস হাঁটার লোভ নানা জায়গা থেকে টেনে এনেছে সবাইকে এ জায়গায়। কি কারণে জানি না, এ জায়গাটির খোঁজ এখনও মেহনতি মনুষ্যদল পায় নি। পেলে বড় বড় আবাস গড়ে এমন ভিড় লাগিয়ে দিত যে, চেহারাই বদলে দিত জায়গাটার।

ব্রনোর বটানিস্ট বিলান্স্কি তাতরায় উঠে গাছ ও ফুলের নানান নমুনা সংগ্রহ করছেন কয়েক হপ্তা ধরে। তার কিছু কিছু আমাদের দেখালেন। তারপর বললেন—আপনারা ভারতবর্ষে ফিরে যাচ্ছেন, কিছু সাইবিরিয়ার পেঁয়াজ নিয়ে যান। লাগাবেন আপনাদের মাটিতে। দেখবেন এর আশ্চর্য গুণ—একটু খেলে বেশীর ভাগ অসুখই সেরে যায়। সাইবিরিয়ায় আমি যখন গিয়েছিলুম সেখান থেকে এনেছি।

ভদ্রলোকের দারুণ উৎসাহ। তখনই পুঁটলি থেকে পেঁয়াজ বার করে দিলেন। আমাদের দেশে কী ভয়ানক ভয়ানক অসুখে মানুষ মারা যায় তার কথা আর তাঁকে বললুম না, পাছে কিছু মনে করেন। উনি হয়তো সাইবিরিয়া আর চেকোস্লোভেকিয়ায় যে সব অসুখের চল তাদের কথাই ভাবছিলেন। সে আর আমাদের কাছে কি?

পেঁয়াজগুলিকে সযত্নে রুকস্যাকে ভরে ফেললুম—দেশে গিয়ে লাগাবো। নতুন রকমের পেঁয়াজ খাওয়া হবে অন্তত। পরে গাছ করে খেয়ে দেখেছি, পেঁয়াজও যেমন তার পাতাও তেমনি—সবই খাওয়া যায়, কিছুই ফেলা যায় না, এমনই সরেশ বস্তু।

গ্রামটি আর চাষীর বাড়ীর এই বুদ্ধিজীবীদের আড্ডা এমন জমে গেল যে রয়ে গেলুম সেখানে। একদিন উদ্ভিদজীবীর সঙ্গে, একদিন লেখকের সঙ্গে, একদিন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ঘুরলুম—টো টো করে। অসীম ধৈর্য নিয়ে পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ। শৃঙ্গ থেকে তলদেশী হ্রদ। হ্রদ থেকে বেঁটে পাইনবীথি-ঘেরা পাহাড়ে রাস্তা দিয়ে অধিত্যকায় অবরোহণ। এই। তারপর বিদায়ের দিন এসে গেল। বটানিস্টের মতো আর সকলেও কিছু কিছু স্মৃতিচিহ্ন আমাদের দিলেন দেশে নিয়ে যাবার জন্য। যে চাষীর বাড়ীতে ছিলুম তিনিও দিলেন বউয়ের হাতের ঐ অঞ্চলের নক্শা-করা ছোট ন্যাপকিন। বিদায়ের সময়টাকে যত ভুলতে চেষ্টা করছিলুম এগুলো পেয়ে সেটা ততই মনে পড়ে গেল।

হেমন্তের ছোঁয়া সবে যেন বাতাসে একটু লেগেছে। এইবার এক পশলা বৃষ্টি পেলেই বনের ধারে সুস্বাদু সুগন্ধী ব্যাঙের ছাতা গজাবে, আর যারা আসল চরণিক তারা কাঁধে ঝুলি ঝুলিয়ে পকেটে পেনসিল-কাটা ছুরি নিয়ে বেরিয়ে পড়বে ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে। ব্যাঙের ছাতা কুড়োনো এদের দেশের জাতীয় স্পোর্ট। সেই স্পোর্ট শুরু হবার যখন আয়োজন হচ্ছে সেই সময় আমরা বিদায় নিলুম—কী দুঃখের কথা!

বটানিস্ট, ডাক্তার, মাস্টারমশায়, ভাষাতাত্ত্বিক, লেখক এবং আশ্রয়দাতা চাষী এবং তাঁর পরিবার সবাই আমাদের বাস অবধি তুলে দিতে এলেন। আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে হাত ঝাঁকিয়ে প্রত্যেকে বললেন—পুনর্দর্শনায় চ। আমরাও বললুম—পুনর্দর্শনায় চ।

প্রাহায় ফিরে এসে দেখলুম ছুটি এবং গ্রীষ্ম ফুরিয়ে আসছে বলে লোকেরা যেটুকু ছুটি যেটুকু গ্রীষ্ম বাকী আছে তা প্রানভরে উপভোগ করবার চেষ্টা করেছে। নদীর ধারে রঙিন কস্টু্যম-পরা মানুষের যেমন ভিড় নদীর জলে শখের নৌকারও তেমনি। নৌকোর ভাড়া তিন মুদ্রা

—চারজন করে লোক ধরে। কিন্তু বেশীর ভাগ নৌকোতেই দুজন করে মানুষ—একজন তরুণ, একজন তরুণী। একজন ধীরে ধীরে বাইছে অন্য জন অলসভাবে তাই দেখছে। সারা বাতাসে আলস্যের সুর। হাল ছেড়ে দিয়ে অনেকে চুপটি করে বসে থাকে সঙ্গীর পাশে। জলের ধীর স্রোতে এগিয়ে চলে নৌকো আর দুজনে মিলে কী স্বপ্ন যে দেখে তারাই জানে। আর আছে একদল বুড়ো। এরা হল মেছো। নৌকো থেকে ছিপ ফেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে। ঘুমোতেও দেখেছি অনেককে। মাছ উঠতে কখনও দেখি নি।

আমাদের আর কোনো কাজ ছিল না, ছিল শুধু মালপত্র গোছানো। গোছাতে যখন ভালো লাগত না নৌকো ভাড়া করে নদীতে নামতুম। জলে তখন এত নৌকো যে ধাক্কা লেগে যেত প্রায়ই এটার সঙ্গে ওটার। কিন্তু উল্টোত না। তৈরি ছিল এমন যাতে খুব জোরে দাঁড় বাওয়া যেত না। আর কিছুতেই উল্টোয় না। বাড়ি ফিরে গিয়ে আবার মাল গোছাতে হত। মাল গোছাতে ভাল লাগত না একটুও। আবার না গুছিয়েও উপায় নেই, কারণ ঘর খালি করে দিয়ে চলে যেতেই হবে।

উপহার জমেছিল এত যে, তা আর গুনতি করে ওঠা যায় না। কি করি এ সব নিয়ে? বাপ্‌রে, এত উপহার দিতে পারে এদেশের লোকেরা। বাক্স-বন্দী করতে লাগলুম তাদের। সেই সঙ্গে বই। কিছু কিছু পাঠিয়ে দিলুম পার্সেল করে দেশে, আর কিছু বন্ধুদের কাছে রেখে আসতে লাগলুম। বললুম—সঙ্গে তো নিয়ে যেতে পারছি না—পাঠাবার কি ব্যবস্থা হয় পরে জানাবো। আর, নইলে রইল—পুনর্দর্শনায়।

প্রাহার পথ দিয়ে চলতে আরম্ভ করলে আজকাল মনে হতে থাকে, এ পথ যেন কতদিনের চেনা—পুরোনো বন্ধুর মতো।

আমাদের বাড়ির গলিটি পাথরে বাঁধানো। ভারি জুতো পরে গেলে খট্‌খট্‌ করে আওয়াজ হয়। নিজের পায়েরই ঠোক বা

পথিকের পায়েরই হোক সে আওয়াজ বড় আপন লাগে আজকাল। রাস্তার গাছগুলো আর বাড়িগুলোর সঙ্গেও চেনা-শোনা হয়ে গেছে। আমাদের বাড়ি ছাড়িয়ে দক্ষিণ-পূর্ব মুখো খানিকটা গেলেই প্রকাণ্ড লেট্না পার্ক। সেই পার্কের প্রান্তদেশ খাড়াভাবে নেমে গেছে ভ্ল্টাভা নদী পর্যন্ত। পার্কের প্রান্তে দাঁড়ালে নদীর বিরাট এক বিস্তৃতি চোখে পড়ে। সাঁকোর পর সাঁকো। তার উপর দিয়ে ট্রাম যাচ্ছে, গাড়ি যাচ্ছে, মানুষ হাঁটছে। নদীর তীরে গাছের ছায়ায় ছায়ায় বেঞ্চি পাতা, ছোটদের খেলার জমি। সেখানে ছুটোছুটি করে শিশুরা, বালি নিয়ে খেলা করে। তটের দু-পাশে ছবির মত যে শহর গড়ে উঠেছে আজ কত-শ বছর ধরে, তাকে দেখে মনে হয় তার সঙ্গে যেন কত কালের আলাপ। হেমন্তের আরম্ভ কি গ্রীষ্মের শেষ ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু রোদের রং অপূর্ব মোহময়। বাতাসের স্পর্শ যৌবনরসে ভরা। পার্কের আঁকাবাঁকা পথের বেঞ্চিগুলিতে তরুণ বসে আছে তরুণীর সঙ্গে। এদের কাউকে চিনি না, অথচ মনে হয় এরা কোন এক শহরের ছেলেমেয়ে, যাদের সবাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়।

বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই এখনও ছুটি কাটাচ্ছেন শহরের বাইরে। কিন্তু দুশান আর মিলশ প্রাহায় ছিলেন। ওঁরা বললেন এয়ারোড্রোমে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। এয়ারোড্রোমের আগে এলেন আমাদের বাড়িতেই। প্রাহার প্রথম দিন দুশান গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন; যাবার দিনও এলেন গাড়ি নিয়ে। বিজ্ঞান আকাদেমিও একখানা গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই দুই গাড়িতে করে সকলে মিলে আমরা চললুম এয়ারোড্রোমে। ভোরের আবছা মুছে গিয়ে তখন সবে সকাল হচ্ছে।

কার্লার বাড়ি ছাড়ালুম। প্রাহায় যেদিন প্রথম পৌঁছেছিলুম সেদিন কার্লা বথটা নিয়ে এসেছিল। এখন ছুটিতে প্রাহার বাইরে

—নইলে আসতো দেখা করতে। হয়তো আর এক দফা বুখ্‌টা নিয়ে। চওড়া অক্টোবর-বিপ্লব চত্বর ছাড়ালুম। ভারতীর রাষ্ট্রদূতের বাড়ি ছাড়লুম। তারপর ছাড়ালুম শার্‌কা। কিংবদন্তী আছে, বহুযুগ আগে চেক-ভূমিতে একসময় সশস্ত্র প্রমীলাবৃন্দের সঙ্গে পুরুষদের যুদ্ধ হয়েছিল। প্রাহার কাছে দুর্গ বানিয়ে নারীরা তার মধ্যে থেকে লড়েছিলেন। সেই সময় শার্‌কা নামে এক সুন্দরী একদল পুরুষ সৈন্যকে এইখানে ভুলিয়ে এনে হত্যা করে। সেই থেকে পাহাড় আর বনে ঘেরা এই জায়গায় নাম হয়েছে শার্‌কা। শার্‌কার পর সোজা রাস্তা এয়ারোড্রোম পর্যন্ত।

গাড়ি থেকে নামলুম। মালপত্র ওজন হল। হয়ে চলে গেল আমাদের এক্‌তিয়ারের বাইরে। দুশান আর মিলশ বসলেন আমাদের সঙ্গে কমলালেবুর সরবত খেতে।

—কি দুশান, ভারতে আসছো কবে? কি মিলশ, কলকাতায় আসবে কবে?

—এই এলুম বলে। পাসপোর্টটা হয়ে যাক আগে।

—ঐ তোমাদের এক কথা—পাসপোর্ট হয়ে যাক। করিয়ে নাও তাড়াতাড়ি।

দুশান এর আগে দুবার ভারতে এসেছেন। মিলশের হবে প্রথম। দুজনেই বাংলা ভাষার ভক্ত।

মাইক-এ বলল—এবার কায়রো—বোম্বাই—রেঙ্গুন—জাকার্তার যাত্রীরা বিমানে উঠুন।

আমরা উঠে দাঁড়ালুম। দুশান ও মিলশ কমলালেবুর রসে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

মিতু বললে—মিলশবাবু, আমাদের দেশে আসুন, গাছ থেকে পেড়ে কমলার রস খাওয়াবো আমাদের বাগানে।

গেট পর্যন্ত ওঁরা এলেন, এসে বললেন—পুনর্দর্শনায় চ।

আমরা বললুম—নাস্‌খ্‌লেডানো অর্থাৎ পুনর্দর্শনায় চ।

সমাপ্ত